Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা সুলতানা সুমা

রোলঃ 23090121060

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা সুলতানা সুমা

রোলঃ 23090121060

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা সুলতানা সুমা, আইডিঃ 23090121060 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহমিনা সুলতানা সুমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

তাহমিনা সুলতানা সুমা

আইডিঃ 23090121060

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 9

প্রযুক্তি 10

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 11

আধুনিক প্রযুক্তি 14

আধুনিক প্রযুক্তি থেকে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ 14

প্রযুক্তি ও ইসলাম 15

ইসলামি বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সময়রেখা 19

প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক পরিবর্তন 21

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 22

প্রযুক্তি এর সুবিধা 26

প্রযুক্তির অসুবিধা 28

প্রযুক্তির অপব্যবহার: বিপর্যয়ে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা 29

প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা 34

প্রযুক্তির ফাঁদ 36

ইন্টারনেট-পর্নোগ্রাফি 36

বুয়েট টিচারের তাওবা 39

মোবাইল ফোন¬- সেলফোন না হেল ফোন? 39

গান ও বাদ্যযন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ 43

সাহাবী ও তাবেয়ীদের ব্যাখ্যা 44

হাদীসের ভাষ্য 45

হাদীসের আলোয় সাহাবীদের জীবন 46

চার ইমামের ভাষ্য 47

দফ-এর পরিচয় 48

বাদ্যসহ কাওয়ালি 49
জীবন : হুশ আসুক আমাদের 50
Call Spoofing কী? 51
সিম কার্ড ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে পাপাচার 53
মোবাইল ফোন : প্রয়োজনীয় মাসায়িল 55
স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার 68
প্রযুক্তি : সেলফি 70
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 73
প্রোফাইলে শিশুদের ছবি দেয়া 78
সোশ্যাল মিডিয়া, নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয় 79
মুসলিম বানানোর উদ্দেশ্যে প্রেম করা 83
মানবপাচারের শিকল: হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অনুসন্ধান 85
শরীয়তের দৃষ্টিতে ফেসবুক ব্যবহার 89
স্মার্ট টিভি ও ইন্টারনেট সিকিউরিটি: আপনার তথ্য কতটা নিরাপদ 90
অনলাইন মার্কেটিং এর নামে বাজার-ভ্রমণ 91
লজ্জা হ্রাস পাওয়া 91
নবীদের পবিত্র জীবনীর বিকৃত উপস্থাপনঃ প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এখন ঈমানী দায়িত্ব! 93
সংবাদ-মাধ্যমের রূপরেখা : ইসলামী কাঠামো 96
ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে বিকাশ ও মোবাইল ব্যাংকিং 103
মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হয়? 103
ভিডিও গেমস 109
কী থাকে এসব ভিডিও গেমসে? 111
গেমিং রোগ 113

শারীরিক ক্ষতি 115
মানসিক ও আচরণগত সমস্যা 118
ইসলামী দৃষ্টিকোণ 119
আভিভাবকদের প্রতি 122
চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার তরুণ প্রজন্ম : সুরক্ষায় করণীয় 124
ইন্টারনেট থেকে পিডিএফ বই ডাউনলোড করে পড়া জায়েয হবে কি? 129
আলোকচিত্র\ফটোগ্রাফি 129
অনলাইন ক্লাস: প্রযুক্তির অপব্যবহারে ফাঁদে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা 131
নজরদারি 133
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী? 137
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অনুমোদিত ব্যবহার 137
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিষিদ্ধ প্রয়োগ 138
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের জন্য ইসলামিক নির্দেশিকা 138
ইউজেনিক্স 139
টেষ্ট টিউবের মাধ্যমে প্রজনন এবং এতদসংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধান 140
ইসলামে কি মানুষের ক্লোনিং জায়েয? 150
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) 154
ফতোয়া প্রদানে এআই 155
হ্যাকিং কি? 163
অনুমতিমূলক এবং বিকৃত ওয়েবসাইট হ্যাক করা বা ধ্বংস করা - হালাল নাকি হারাম? 168
পারমাণবিক যুদ্ধ 171
অনলাইনে দাওয়াত ও অপ্রশান্ত অন্তর 174
ফেসবুকে দ্বীন প্রচার 175

আমরা সকলেই আসক্ত বা addicted 178
এই আসক্তিটা কেন এবং ইসলাম কী চায়? 179
কোন গুনাহগুলো আমাদের জীবনের জন্য সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ? 182
মানুষের গুনাহ হবেই 183
মানুষ মানেই ভুল করবে 183
কোন গুনাহটিতে আপনি আসক্ত তা find out করুন 184
আল্লাহকে sorry বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন 184
চোখের পানির মূল্য অনেক! 185
মুসলিমরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে কেন? 185
Is technology demotivated in islam? 187
উপসংহার ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা 188
রেফারেন্স 191

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم.

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

বহু বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও গবেষণা কালের পরিক্রমায় মানুষের মাঝে উদয় হয়। উদ্ভাসিত হয় স্বতন্ত্র ও আলোকিতরূপে। মানুষের হৃদয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

আধুনিক জীবনের এক প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ প্রযুক্তি। শিক্ষা- দীক্ষা, যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই তা অভাবনীয় গতি এনে দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বস্তি ও স্বাভাবিকতা এবং খুলে দিয়েছে মেধা ও সময়ের ভয়াবহ অপচয়ের দুয়ার। প্রযুক্তি এখন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের জীবন ও ভবিষ্যতের জন্য, অনেক পরিবারের স্থিতি ও স্বস্তির জন্য।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই সফলকাম।"(সূরা আলে ইমরান – আয়াত ১০৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, সে যেন তা হাতে পরিবর্তন করে। যদি না পারে, তাহলে মুখে নিষেধ করুক; যদি তাও না পারে, তাহলে অন্তরে ঘৃণা করুক — আর সেটিই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।"সহিহ মুসলিম (হাদীস নং ৪৯) I

নবী করিম ﷺ বলেছেন —

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

"আমার উম্মতের লোকেরা যখন অন্যায়কে দেখে তবুও তা প্রতিরোধ না করে, তখন তাদের সবাইকে আল্লাহর শাস্তি গ্রাস করবে।"(বুখারী, তাফসিরুল কুরআন অধ্যায়)

আমাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বীনমুখীরা যদি পশ্চিমা জীবনধারার নানা ক্ষত ও বিকৃতি সম্পর্কে—যা দুঃখজনকভাবে আমাদের মুসলিম-সমাজে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে— আলোচনা শুরু করে তাহলে তা হয়তো সমাজের দ্বিধা ও জড়তা কাটাতে সহায়ক হতে পারে। এরই

প্রেক্ষিতে 'প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ' নিয়ে আলোচনা শুরু করছি ইন শা আল্লাহ।

প্রযুক্তি

প্রযুক্তি হলো পণ্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল, দক্ষতা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সমষ্টি। এটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্র বা কৌশল তৈরি করে, যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। প্রযুক্তি বলতে বোঝায় আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত বিভিন্ন উপায়I প্রযুক্তি হলো এমন একটি উপায় যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে যন্ত্র ও পদ্ধতি তৈরি করে, যেমন - স্টিম টারবাইন বা কম্পিউটার।

টেকনোলজি (Technology) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ "Techne" (যা শিল্প ও নৈপুণ্যের সাথে সম্পর্কিত) ও "logos" (যা অধ্যয়নের সাথে যুক্ত) শব্দটি থেকে। এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণেই তৈরী হয়েছে "টেকনোলজিয়া" শব্দটির, যার অর্থ হল পদ্ধতিগত চিকিৎসা। বিগত দুই শতাব্দীতে প্রযুক্তি শব্দটির ব্যবহার চরমভাবে বদলেছে।

প্রযুক্তি হল এক ধরণের উপায়- যার সাহায্যে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে থাকি। প্রযুক্তি, সরাসরি মেশিন (যেমন- কম্পিউটার), কৌশল ও প্রক্রিয়ার (যেমন- আমরা যেভাবে কম্পিউটার চিপ বানাই) বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আমরা বর্তমানে মনে করতেই পারি যে, সমস্ত প্রযুক্তিগুলো কেবলমাত্রই ইলেকট্রনিক- তবে, এখনও পর্যন্ত এটাই হল সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি।

কিন্তু, আদিম সভ্যতার প্রেক্ষাপটে, আদিম মানুষদের ব্যবহৃত পাথর বা লোহার হাতুড়ি এমনকি চাকাও ছিল প্রাথমিক মানব প্রযুক্তির দুটো জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে প্রযুক্তি বা টেকনোলজি কেবলমাত্র শিল্প অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পরিবর্তে, এটি যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, অস্ত্র, যোগাযোগ ও পরিবহন যন্ত্রগুলোকেও নিজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে। সেইসাথে নিজেদের দক্ষতাগুলোকে বৃদ্ধি করে মানুষ, প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার ও প্রসার ঘটিয়েছে।

আসলে, প্রযুক্তিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, মানব জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে, যা তাদের জীবনযাত্রাকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর ও বাস্তবসম্মত করে তোলে।



উদাহরণ

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন যন্ত্র, যেমন - কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, স্মার্ট ওয়াচ, বায়োটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিং, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম (ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি), ড্রোন প্রযুক্তি এবং অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও আমাদের জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এরা পরস্পরের সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। অতীতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্দেশ্যে ছিল না। তারা বিদ্যুৎ ও আলোর মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। অপরদিকে জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। তারা পাথরের হাতিয়ার, আগুন, পোশাক, ধাতব যন্ত্রপাতি এবং চাকার মত সরল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

প্রযুক্তি হল আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। যেমন - বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবার ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনে কাজে

লাগানো হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের নানান ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন - শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, যাতায়াত ইত্যাদি।

আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের সময়কালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি, শিল্প-কারখানা, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন কল-কারখানা রেল গাড়ি এবং জাহাজ চালাতে ব্যবহার করা হতো।

বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময়ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকেন। যেমন - দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জিনিস অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যার মধ্যে নিম্নোক্ত ধাপগুলো রয়েছে। এই ধাপগুলোর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। এর ফলে বিজ্ঞানকে বলা হয় যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ জ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ধাপ সমূহ	বিবরণ
পর্যবেক্ষণ	আমাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা কিংবা নিজের পছন্দের কোনো বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করি।
প্রশ্নকরন	যখন আমরা কোনো কিছু দেখি, শুনি বা পড়ি আমাদের মনে এ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আসতে পারে। এ সকল প্রশ্ন থেকে এমন একটি প্রশ্ন বেছে নেই যার উত্তর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।
অনুমান	পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করি এবং খাতায় লিখি। এটিই অনুমান।
পরীক্ষণ	অনুমানটি সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করি। পরীক্ষাটি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করি। পরীক্ষাটি সম্পাদন করি।তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করি।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করি এবং ফলাফলের সারসংক্ষেপ করি। ফলাফলটি অনুমানের সাথে মিলেছে কিনা যাচাই করি।
বিনিময়	প্রাপ্ত ফলাফল ও গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যদের সাথে বিনিময় করি।

আধুনিক প্রযুক্তি

প্রযুক্তি বরাবরই উন্নতির পথে এগিয়ে চলে আর এটা সবসময়েই প্রগতিশীল। এক্ষেত্রে, আধুনিক প্রযুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এইভাবে যে, আধুনিক প্রযুক্তি হল পুরোনো প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির সংযোজন। এ মূলত, মডার্ন টেকনোলজি সর্বতোভাবেই গতিময় ও সমাজে মানব সভ্যতার দক্ষতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা তারসমেত টেলিফোনের কথা কল্পনাও করতে পারিনা। আমাদের এখনকার লেটেস্ট বা সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি হল মোবাইল ফোন। যেটা আমরা সারা পৃথিবী নিজেদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারি ও যেকোনো স্থানে বা সময়ে বসে বিনা বাধার যার সাথে খুশি যোগাযোগ করতে পারি। তাই, স্মার্টফোন হল এই জমানায় আধুনিক প্রযুক্তির সবথেকে নিখুঁত উদাহরণ। অর্থাৎ, আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের মুখোমুখি যোগাযোগকে নিশ্চিত করে।

এর সাহায্যে আমরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম, এমনকি আমরা যে ধরণের পরিষেবা পেতে চাইছি, সেগুলো আমরা আরও সহজে অ্যাক্সেস কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তাছাড়াও, এই আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু ব্যবহার করি, তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবেই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত। তাই, আমরা চাইলেও কোনোভাবেই এই আধুনিক প্রযুক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে – দ্রুততর ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী 5G নেটওয়ার্ক, সেল্ফ-ড্রাইভিং কারস, রোবটিক সার্জারি, মাইক্রো নীডলস, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও আরও অন্যান্য।

আধুনিক প্রযুক্তি থেকে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

এক. 'প্রকৃতির উপর বিজয়' এর আবেগের কারণে প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এর ফলে ভয়ঙ্কর পরিবেশগত সংকট দেখা দিয়েছে। আজ পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, বায়ু, পানি সবকিছুই দূষিত হয়ে গেছে। মানবজাতির অস্তিত্বের উপর বিপদাশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই. বস্তুবাদী সভ্যতা লোভ এবং অপচয়ের মেজাজ তৈরি করেছে। এ কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিসীম লুটপাট হয়েছে। ধনী ব্যক্তি এবং ধনী দেশগুলো বাকি বিশ্বের পরোয়া না করে, প্রযুক্তির

মাধ্যমে তাদের আরাম এবং বিলাসিতার উপকরণ তৈরি করেছে। এর ফলস্বরূপ, আজ বায়ু, পানি, শক্তির মতো মৌলিক প্রয়োজনগুলোর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

তিন. আধুনিক প্রযুক্তি যখন আধুনিক জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব এবং সম্প্রসারণবাদী সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যগুলোর সাথে মিশে যায়, তখন মানব ইতিহাসের সবচে' ভয়ঙ্কর অস্ত্রের জন্ম হয়। আজ পুরো বিশ্ব এই সকল অস্ত্রের কারণে কয়েকটি বড়ো শক্তির হাতে বন্দি হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, যেকোনো সময় কয়েকজন হিংস্র জাতীয়তাবাদী বর্বর, তাদের ভয়ঙ্কর অস্ত্রের মাধ্যমে, পলক ফেলতে না ফেলতেই পুরো বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ফেলতে পারবে।

চার. একটি অনৈসলামিক আখলাকি-নৈতিক ধারণার ছায়াতলে এই আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। এর ফলাফল হল, আজকে যে বিনোদন-প্রযুক্তি অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার প্রচার করে, তা আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। প্রজনন প্রযুক্তি, ক্লোনিং, বিভিন্ন ধরণের জেনেটিক প্রযুক্তি যৌন নৈতিকতার ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিবার-ব্যবস্থা মারাত্মক সংকটের মুখে পড়েছে।

পাঁচ. সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সংকট হল-যাকে আপনি 'অগ্রাধিকারের সংকট' বলতে পারেন-পুঁজিবাদী পশ্চিমা সভ্যতার দাসত্বে এই প্রযুক্তির অগ্রাধিকার হচ্ছে শুধুমাত্র বড়ো বড়ো ব্যবসা এবং পুঁজিবাদীদের স্বার্থ। এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে অন্ধভাবে উন্নতির জন্য বিশ্বের সেরা মস্তিষ্কগুলোকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কেননা এটি হচ্ছে লাভজনক শিল্প। গত কয়েক বছরে বিশ্বের সেরা দক্ষতাগুলো ইনফরমেশন টেকনোলোজি বা তথ্য প্রযুক্তিতে ব্যয় হয়েছে। কারণ এটির সাথে বড়ো বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত। এমনকি মেডিকেল এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণাতেও সেই রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়, যাকে ধনী মানুষ এবং ধনী দেশগুলোর রোগ বলে মনে করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যার উপর খুব কমই মনোযোগ দেওয়া হয়।

প্রযুক্তি ও ইসলাম

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এনেছে বহুমাত্রিক পরিবর্তন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। চির আধুনিক। একসময় যেসব বিষয় মানুষের কাছে ছিল কেবল কল্পনা, এখন তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। একসময় মানুষের কাছে যা মনে হতো নিছক রূপকথা, এখন তার অনেকগুলোই মানুষের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এভাবে মহান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর বান্দাদের বিভিন্ন নিদর্শনের সাক্ষী করে তাঁর বড়ত্বের জানান দেন, যা থেকে কেবল জ্ঞানীরাই শিক্ষা গ্রহণ করে।

কোরআন-হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর সাহায্যে সংঘটিত হওয়া নবী-রাসুলদের মুজিজাগুলোও ঠিক এ রকম। মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময় তাঁর মনোনীত বান্দাদের সাহায্য করতে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করেছেন, যা সে যুগের মানুষের কাছে অকল্পনীয় ছিল। যারা ঈমানদার ছিল, এসব ঘটনা তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর যারা ছিল বেঈমান, তারা মহান আল্লাহর এসব কুদরতের নিদর্শনকে জাদুটোনা কিংবা অন্য কোনো তকমা দিয়ে হেয় করার চেষ্টা করেছিল।

আর যেসব তথাকথিত জ্ঞানী পরবর্তী সময়ে এসেছে, তারা তো এসব ঘটনাকে নিছক রূপকথা বৈ কিছুই মনে করত না। অথচ মহান আল্লাহ পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ দান করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে এখন একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে মহান আল্লাহর বাণীগুলো কতটা নিখুঁত ছিল! কোরআন কত সত্য কিতাব, যা দেড় হাজার বছর আগে পৃথিবীর শুরু থেকে ঘটে যাওয়া আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনগুলো সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে গেছেন। অথচ আমরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কোরআনের সেই বাণীগুলোর মর্মই বুঝতে পারিনি। তারই একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ বর্তমান রোবটিক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ও সুপারসনিক ফ্লাইট প্রযুক্তি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ''আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যা সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়েছিলাম। আর কতিপয় জিন তার রবের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়, তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের আজাব আস্বাদন করাব। তারা তৈরি করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউসের মতো বড় পাত্র ও স্থির হাঁড়ি। হে দাউদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।'' (সুরা : সাবা, আয়াত : ১২-১৩)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে মহান আল্লাহ সুলাইমান (আ.) কে দেওয়া কয়েকটি মুজিজার কথা উল্লেখ করেছেন। যার প্রতিটিই একসময়ের মানুষের কাছে রূপকথার মতো মনে হলেও বর্তমান প্রযুক্তির যুগে মহান আল্লাহ এটা মানুষের জন্য সম্ভব করে দিয়েছেন। যা কোনো ধরনের দৃশ্যমান মেশিন বা প্রযুক্তি ছাড়া তাঁর নবীর জন্য আরো বহুগুণ উন্নত পদ্ধতিতে সম্ভব করেছিলেন। উল্লিখিত এই আয়াতে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কয়েকটি উন্নত প্রযুক্তির ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো—

সুপারসনিক ফ্লাইট

এই আয়াতের প্রথমাংশে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যা সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত।' অর্থাৎ সুলাইমান (আ.) খুব দ্রুতগতিতে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করতে পারতেন। বিমান আবিষ্কারের মাধ্যমে সুলাইমান (আ.)-এর এই মুজিজার মাহাত্ম্য মানুষের অনেক আগেই বুঝে এলেও তার নতুন প্রযুক্তি সুপারসনিক ফ্লাইট এখন তা আরো সহজে বুঝতে সাহায্য করছে।

গণমাধ্যমের তথ্যমতে, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বিশ্বের দ্রুততম বিমান তৈরি করেছে। সুপারসনিক বিমানের নাম এক্স-৫৯। এ বিমানে আট ঘণ্টার যাত্রায় সময় লাগবে মাত্র দেড় ঘণ্টা। খুব তাড়াতাড়িই নতুন প্রজন্মের এই বিমান বাজারে আসছে বলেই জানিয়েছে নাসা। সাধারণ বিমান বা ফাইটার জেটের গতি তো দূর, সুপারফাস্ট সুপারসনিক বিমান কনকর্ড টারবোজেটের গতিকেও হার মানাবে এটি। এ বিমানে করে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনে যাওয়া যাবে নিমেষেই। এই তথ্য আমাদের কিছুটা হলেও অনুমান করতে সাহায্য করে যে সুলাইমান (আ.) কিভাবে সকালে এক মাসের পথ আর সন্ধ্যায় এক মাসের পথ পাড়ি দিতেন।

লিকুইড থ্রিডি মেটাল প্রিন্টিং

আয়াতে উল্লেখ আছে যে মহান আল্লাহ সুলাইমান (আ.)-এর জন্য গলিত তামার ঝরনা প্রবাহিত করেছিলেন, যা দিয়ে তিনি বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরি করতেন। বর্তমান যুগেও তামার ব্যবহার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক তার থেকে শুরু করে প্রযুক্তির বহু খাতে ব্যাপকভাবে রয়েছে। তবে বর্তমান যুগে এতে থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি যোগ করে একে আরো গতিশীল করার চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে এমআইটির গবেষকরা একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যেখানে গলিত অ্যালুমিনিয়ামকে সূক্ষ্ম কাচের গুঁড়ার মধ্যে প্রবাহিত করে দ্রুত কঠিন বস্তু তৈরি করা যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে বড় আকারের বস্তু, যেমন— টেবিলের পা বা চেয়ারের ফ্রেম, মাত্র কয়েক মিনিটে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে বড় আকারের ধাতব বস্তু দ্রুত তৈরি করে শিল্প খাতে নতুন বিপ্লব ঘটাবে এই প্রযুক্তি।

এআই রোবট

আয়াতে উল্লেখ আছে যে 'আর কতিপয় জিন তার রবের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ করত।' বর্তমান যুগেও মহান আল্লাহ মানুষের মাথায় এমন বুদ্ধি দিয়েছেন যে মানুষ তাদের অনেক কঠিন কাজ এআই রোবটের মাধ্যমে খুব দ্রুত ও সহজে করিয়ে নিচ্ছে। এআইয়ের

কাজকর্ম দেখলে মনে হয় যে তাকে হুকুম করলে সে অনেকটা জিনের মতোই কাজ করছে। গত বছর সিএনএনে ইলন মাস্কের একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান চাকরিগুলোকে 'ঐচ্ছিক' করে তুলবে, কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোবটগুলো বেশির ভাগ পরিষেবা প্রদান করবেI

অ্যাডভান্স থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি

আয়াতে উল্লেখ আছে যে 'তারা তৈরি করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউসের মতো বড় পাত্র ও স্থির হাঁড়ি।' বর্তমানে এআই, মেশিন লার্নিং ও অ্যাডভান্স থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তির সাহায্যে এ রকম কাজগুলো খুব দ্রুত ও সহজে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বিশ্বের কয়েকটি দেশে থ্রিডি প্রিন্টেড মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মিত হয়েছে, যা কয়েক হাজার বছর আগে সুলাইমান (আ.)-এর জিনদের দ্বারা তৈরি স্থাপনার কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, কারখানাগুলোতে অটোমেটিক মেশিনে এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। একসঙ্গে অনেক মানুষের রান্না করার জন্য এখন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কুকার আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে একসঙ্গে বহু মানুষের জন্য রান্না করা যায়।

বর্তমান যুগের এই প্রযুক্তিগুলোকে কোরআনের আয়নায় দেখলে মহান আল্লাহর সেই বাণীটি হৃদয়ে উঁকি দেয়,

'অতএব, তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?' (সুরা : আর রহমান, আয়াত : ১৩)

উল্লেখ্য, কোরআনের কোনো তথ্য বিজ্ঞানের আলোকে না বোঝা গেলে বুঝতে হবে, বিজ্ঞান এখনো সে বিষয়ে সঠিক জায়গা পর্যন্ত আসতে পারেনি, তবে কোরআন চির উন্নত ও চির আধুনিক। মুমিন তাঁর রবের সব বাণী কোনো যুক্তি ছাড়াই মেনে নেবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর পবিত্র কোরআন বোঝা ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইসলামি বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সময়রেখা

ইসলামের ইতিহাসে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে মুসলিম বিশ্ব ব্যাপক বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন করেছিলI তবে এই স্বর্ণযুগের সময়কাল নিয়ে বিকল্প ধারণাও রয়েছে। কিছু পণ্ডিত তিমুরীয় রেনেসাঁ-কে স্বর্ণযুগের অংশ ধরে এর সময়কাল ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। আবার কেউ কেউ ১৫শ-১৬শ শতক পর্যন্ত সময়কাল, যখন ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান হয়েছিল, সেসময় পর্যন্ত ইসলামি স্বর্ণযুগের অংশ বলে মনে করেন।
ইব্রাহিম আল ফাজারি ইব্রাহিম ইবনে হাবিব ইবনে সুলায়মান ইবনে সামুরা ইবনে জানদাব আল ফাজারি আট শতকে খলিফা আল মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫) কোর্টের গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন লেখা লিখেছেন। তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম আল ফাজারি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মুসলিম দার্শনিক ও গণিতবিদ।
ইব্রাহিম আল ফাজারির পুত্র জানদাব আল ফাজারিকে কেউ কেউ বলেন আরবের আবার কেউ বলেন পারস্যের। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বই আরবী ও পারস্যের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ইসলামিক বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে সর্বপ্রথম 'অ্যাস্ট্রোল্যাব' তৈরির জন্য কৃতিত্ব প্রদান করা হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, যা ব্রহ্মগুপ্ত লিখেছেন তা জানদাব আল ফাজারি, তাঁর পিতা ও ইয়াকুব ইবনে তারিক আরবীতে অনুবাদ করেন যার নাম দেওয়া হয় 'সিন্দহিন্দ'।
আল খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বই "হিসাব আল জাবর ওয়া আল মুকাবালা" (আল জাবর) তে বীজগণিতের সমীকরণ সমাধানের উপায় ও ক্যালকুলাস নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।
আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩) মদ ও গোলাপজল এর পাতন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে সুগন্ধী আবিষ্কারের ১০৭ টি প্রণালি বর্ণনা করেন। তিনি যে বইতে তা বর্ণনা করেন সেটির নাম "কিতাব কিমিয়া আল ওতর ওয়া আল তাস ইদাত।"
কিতাব সির আল- আসরার (গোপনীয়তার গোপন বই) বইতে আল রাজি পেট্রোলিয়াম ও এর পাতন সম্বন্ধে লিখে গেছেন। বাগদাদের হাসপাতাল নির্মাণের জন্য যখন উপযুক্ত স্থান খোঁজা হচ্ছিল তখন তিনি শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাজা মাংস ঝুলিয়ে রাখেন। যে স্থানে মাংস পচতে বেশি সময় নেয় সে স্থানে তিনি হাসপাতাল নির্মাণের জায়গা হিসেবে বেছে নেন। তিনিই বলেছিলেন রোগীদের কখনো তাদের শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য না বলতে যেন রোগীরা ভয় বা দুশ্চিন্তায় না পড়ে যায় কারন এতে রোগীর সুস্থ হতে আরো

বেশি সময় নিবে। এছাড়াও তিনি অ্যালকালাই, কস্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড), সাবান ও গ্লিসারিন নিয়ে লিখেছেন। ৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কিতাব আল আসরার বইতে তিনি এসব দ্রব্যাদির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিয়ে লিখে গেছেন।

আরব গণিতবিদ থাবিত ইবনে কুরা (লাতিনরূপঃ থেবিত) বনু মুসা ভাইদের অধীনে বাগদাদের জ্ঞানঘরে (হাউজ অফ ওয়াইজডম/বায়ত আল হিকমা) পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি একটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন যার ফলে বিশেষ ধরনের অ্যামিকাবল সংখ্যা বের করা যায়। পরবর্তীতে আল বাগদাদী উপপাদ্যটির বিকল্প পদ্ধতি বের করেন।

বাগদাদে বায়ত আল হিকমা বা জ্ঞানঘর (হাউজ অফ ওয়াইজডম) প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে গ্রিক ও ভারতীয় গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন কাজ ও লেখার আরবি অনুবাদ করা হয়I

আব্বাস ইবনে ফিরনাস নভঃ থিয়েটার ও কৃত্তিম স্ফটিক নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সাতশ বছর পরের এক লেখা থেকে জানতে পারা যায় ইবনে ফিরনাস পরীক্ষামূলক উঁচু উইংবিশিষ্ট বিমানযাত্রায় আহত হন।

দশ শতকে আরবে তিন পদ্ধতিতে গণনা ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। এগুলো ছিল আংগুল দিয়ে গণনা পদ্ধতি (সাংখ্যিক), সেক্সিজেসিম্যাল পদ্ধতি যা মূলত ব্যবিলনীয় পদ্ধতি থেকে উদ্ভুত এবং এটি ছিল মূলত আরবি অক্ষরে যা আরব গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদরা ব্যবহার করতেন। এর পাশাপাশি ছিল হিন্দি-আরবি সংখ্যা ব্যবস্থা। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংখ্যাচিহ্ন ছিল। উক্ত সংখ্যা পদ্ধতিতে হিসাব করার জন্য বোর্ড ব্যবহার করা হতো কারন গণনা আগানোর সময় কিছু নতুন ফলাফল ও বিগত ফলাফল মুছে ফেলা প্রয়োজনীয়। বোর্ড ব্যবহারের এই পদ্ধতির ব্যাপারে ধারণা দেন হিদার্টো।

আবুল হাসান আলি আল মাসুদী এলকাইলি পানির সাথে ভিট্রিওলের বিক্রিয়া নিয়ে লেখেন। উক্ত বিক্রিয়াটিতে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। আবুল হাসান আল উকলিদিসি ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি হালনাগাদ করেন যেন তাতে কলম ও কালির ব্যবহার করে হিসাব করা যায়। আবুল ওয়াফা আল বুজ্জানি। তিনি আংগুল দিয়ে হিসাব নিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক লেখেন এবং তিনি ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতির ব্যাপারেও পারদর্শী ছিলেন। ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতির ব্যাপারে তিনি লিখেছিলেন ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে সংখ্যা পদ্ধতিটির প্রয়োগ এখনো হয়নি এবং পাশ্চাত্য খেলাফতে এটি পরিচিত নয়। ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে তিনি বর্গমূল আবিষ্কার করেন।

আল বাগদাদি থাবিত ইবনে কুরার আবিষ্কার করা এমিকেবল সংখ্যা উপপাদ্য নিয়ে গবেষণা করেন ও এর বিকল্প পদ্ধতি বের করেন। তখনকার সময়ে ইসলামিক দেশগুলোতে যে তিনটি সংখ্যা বা গণনা পদ্ধতি ছিল তিনি সেগুলো নিয়েও লিখেছিলেন।

প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান অনেক। তাঁরা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, এবং রসায়নসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আল-খোয়ারিজমির বীজগণিত, ইবনে আল-হাইসামের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, আল-রাজি ও ইবনে সিনার চিকিৎসা জ্ঞান এবং ত্রিকোণমিতি ও মানচিত্রের উন্নয়ন এ সবই তাদের অবদানের উদাহরণ।

প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক পরিবর্তন

প্রযুক্তি ক্রমশ জটিল এবং ক্রমবর্ধমানভাবে আন্তঃসংযুক্ত হয়ে উঠছে। গাড়ি, বিমান, চিকিৎসা ডিভাইস, আর্থিক লেনদেন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা - সবকিছুই আগের তুলনায় অনেক বেশি কম্পিউটার সফটওয়্যারের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে এগুলো বোঝা কঠিন এবং কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উপর সরকারী এবং কর্পোরেট নজরদারি মূলত ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে, এবং তাই আগের তুলনায় মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ কম এবং আমাদের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় পক্ষপাতের সংযোজন এবং সংহিতাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ আরও বেশি, যা আমরা সনাক্ত বা চিনতেও সক্ষম নই। জৈব-প্রকৌশলের অগ্রগতি মানব-প্রাকৃতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করছে। উপরন্তু, এই বৃহৎ এবং ছোট ডিভাইস এবং সিস্টেমগুলির ব্যবস্থাপনা ক্রমবর্ধমানভাবে ক্লাউডের মাধ্যমে করা হচ্ছে, যাতে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ খুব দূরবর্তী এবং সরাসরি মানব বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে সরে যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টারনেট অফ থিংসের মতো প্রযুক্তিগুলিকে কীভাবে "ব্যাখ্যাযোগ্য" করা যায় তার গবেষণা তার নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কারণ কিছু ভুল হলে তারা কীভাবে কাজ করে বা কী ত্রুটি থাকে তা বোঝা কঠিন ।

এই ক্রমবর্ধমান জটিলতা বিজ্ঞানীদের জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কীভাবে বিশ্বজুড়ে জীবনকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় উপায়ে পরিবর্তন করছে এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও নকশাকে উপকারী দিকে রূপ দেওয়ার জন্য কোন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আইনি সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন তা অনুসন্ধান করা আগের চেয়ে আরও কঠিন করে তুলেছে - এবং আগের চেয়েও বেশি অপরিহার্য করে তুলেছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দ্রুত গতি এবং এর অব্যাহত অগ্রগতি অনিবার্য এই অনুভূতির আলোকে এটি একটি অসম্ভব কাজ বলে মনে হতে পারে, তবে বিশ্বের অনেক দেশ কম্পিউটার প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে এবং এখনও বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রবাহ এবং সীমান্তের ওপারে প্রযুক্তি বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি আমূল পুনর্বিবেচনা করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এই সময়টা কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্যই নয়, প্রযুক্তি নীতির জন্যও উত্তেজনাপূর্ণ - আমাদের প্রযুক্তিগুলি আগের চেয়ে আরও উন্নত এবং জটিল হতে পারে, তবে কীভাবে সেগুলিকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানো যায়, সুরক্ষিত করা যায় এবং এমনকি সীমাবদ্ধ করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাও তাই। সরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি দ্বারা মূলত নির্ধারিত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কাঠামো এবং সেই কাঠামোগুলি সামাজিক সংগঠন এবং সংস্থার উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত উৎস, অত্যন্ত বিতরণযোগ্য এবং বিকেন্দ্রীভূত উন্মুক্ত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং বদ্ধ, কঠোর এবং আরও শ্রেণিবদ্ধ মডেল অনুসারে কাঠামোবদ্ধ। প্রযুক্তির শাসন সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতা যেমন নতুন এবং আকর্ষণীয় উপায়ে বিকশিত হচ্ছে, তেমনি উদীয়মান প্রযুক্তির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক মাত্রা সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাও। প্রযুক্তি আমাদের সমাজকে কীভাবে পরিবর্তন করছে, আমরা সেই পরিবর্তনগুলি কেমন দেখতে চাই এবং সেই পরিবর্তনগুলিকে প্রভাবিত করার এবং পরিচালনা করার জন্য আমাদের কী কী সরঞ্জাম রয়েছে তার সম্পূর্ণ পরিসরের মানচিত্র তৈরি করার চ্যালেঞ্জ এবং গুরুত্ব উভয়ই আমরা উপলব্ধি করছি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করে, যতক্ষণ না তা আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী হয়I কুরআন বলে:

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।“ (সূরা আলাক ৯৬:৪-৫)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, জ্ঞান অর্জন ও প্রযুক্তির ব্যবহার ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে এর ব্যবহারে কিছু সীমাবদ্ধতা ও নৈতিক দিক বিবেচনা করতে হবে।

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐসব বুদ্ধিমানের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র (আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)।

আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলূক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই

একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' (বাক্বারাহ ২/২৯)। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, মানুষ জগতের যা কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তাআলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাওহীদের নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা!

এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের মাঝে এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাযার হাযার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সাথে কথা বলা যায় অনায়াসে। পৃথিবীর এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এই সব উন্নয়ন সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত। যার শুকরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর (ইবরাহীম ১৪/৭)।

শুকরিয়ার সর্বনিম্ন স্তর হল, আল্লাহর নেয়ামতকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

এমন কোন প্রযুক্তি পণ্য বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নেই, যেটা ইসলামের খেদমতে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে ধর্তব্য যে, প্রতিটি জিনিসকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়, আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ কিন্তু জিনিসের বা প্রযুক্তির নয়। বরং এখানে ব্যবহারকারী মূলতঃ দায়ী। যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে মন্দ ছবিও দেখ যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহলে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম। তাহলে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবী-রাসূলই তাদের যামানায় তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজস্ব ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক

ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহলে তা হবে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর।

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কার কার এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা অনুধাবন কর। (গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)।

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক আছে তা যদি বাদও দেই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি 'যাতে তোমরা অনুধাবন কর' এটুকু লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব যে, কিভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড় হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত হয়, তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদূন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ -

'তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী' (রূম ৩০/৮)।

মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পিছনে এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে জবাব দিতেই

হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে ৪৯ বার ‘আকল’ ও ১৮ বার ‘ফিকর’ উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ-

‘বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন’ (আনকাবূত ২৯/২০)।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হল পড়া। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হল ‘পড়’। এমনকি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান ‘আলাক্ব’-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনই নিরুৎসাহিত করে না। বরং এর সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদীনায় নবী করীম (সা)-এর জীবনে এরকম অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয় তা ছিল আরবদের কাছে অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এমনিভাবে অন্য যুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবী (সা)-এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিল সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যে কোন পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের খেদমতে ব্যবহার করা সম্ভব। তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয় যে, আমরা প্রযুক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহলে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে।

প্রযুক্তি এর সুবিধা

বর্তমান যুগে, প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিয়েছে। আগের মতো বই, খবরের কাগজ, রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমেই আমরা শুধু তথ্য জানতাম, কিন্তু প্রযুক্তি-এর মাধ্যমে আমরা এখন দ্রুত, সহজ ও কার্যকরভাবে তথ্য বিনিময় করতে পারি। স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া—এসব প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে, প্রযুক্তি -এর ব্যবহারে সুবিধার পাশাপাশি কিছু সমস্যা ও অসুবিধাও রয়েছে।

✪তথ্য দ্রুত বিনিময়

প্রযুক্তি এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান। ইমেইল, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপস এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এখন আর তথ্য পৌঁছাতে সপ্তাহ-ধরে অপেক্ষা করতে হয় না। কেবলমাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একজন লোক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকা অন্য লোকের কাছে তথ্য পৌঁছাতে পারে। এটি ব্যবসা, শিক্ষা, গবেষণা, এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

✪শিক্ষার উন্নতি

প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছে। এখন শিক্ষার্থীরা সহজেই অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পারে, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি থেকে বই ডাউনলোড করতে পারে, এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক অ্যাপ ব্যবহার করে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে পারে। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, শিক্ষকরা তাদের পাঠদান আরও আকর্ষণীয় করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। ভিডিও লেকচার, গ্রাফিকাল কনটেন্ট এবং অ্যানিমেশনগুলো শিক্ষার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং কার্যকরী করে তুলেছে। এইভাবে, প্রযুক্তি শিক্ষার গুণগত মানকে বাড়িয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহকে জাগিয়ে রেখেছে।

✪অফিস ও ব্যবসায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি

প্রযুক্তি -এর ব্যবহারের ফলে অফিস ও ব্যবসা পরিচালনায় অনেক সুবিধা এসেছে। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, ই-মেইল যোগাযোগ এবং ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের গতি এবং দক্ষতা অনেক বেড়েছে। আজকাল, অধিকাংশ ব্যবসা কম্পিউটারের মাধ্যমে চলে, যেখানে ব্যবসার যাবতীয় তথ্য সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষিত থাকে। একদিকে যেমন ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজ হয়েছে, তেমনি দূরবর্তী কাজ (Remote Work) ও ভার্চুয়াল মিটিং-এর মাধ্যমে কর্মীরা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে কাজ করতে পারছেন।

✪সামাজিক যোগাযোগের সুবিধা

প্রযুক্তি -এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে আমরা দ্রুত একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক মাধ্যম আমাদের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে সাহায্য করছে। আমরা চাইলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসে মানুষের সাথে পরিচিত হতে পারি, মতবিনিময় করতে পারি, এবং সম্পর্ক তৈরি করতে পারি।

✪স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি অনেক উন্নতি করেছে। টেলিমেডিসিন বা দূরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ এখন ঘর থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তখন, যখন একজন রোগী একটি দূরবর্তী অঞ্চলে থাকে বা ভ্রমণের কারণে শারীরিকভাবে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যও এখন ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকে, এবং ডাক্তারেরা সেগুলোর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করতে সাহায্য পায়। এছাড়া, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য ICT সফটওয়্যার এবং টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

✪নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ICT-এর সাহায্যে নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবা প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। আজকাল অনেক তরুণ উদ্যোক্তা অনলাইনে ব্যবসা শুরু করেছেন এবং তাদের নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন। ICT এর মাধ্যমে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারেন, এবং এই মাধ্যমটি অনেকের জন্য আয়ের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

✪ভবিষ্যতের উদ্ভাবন

প্রযুক্তি এমন একটি শক্তি যা আমাদের ভবিষ্যতের উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির দিকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ দিতে সাহায্য করছে। যেমন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লকচেইন, ডেটা সায়েন্স, এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IoT)—এই সব নতুন প্রযুক্তি ICT-এর মাধ্যমে আরো শক্তিশালী এবং কার্যকর হয়ে উঠছে। এগুলো আগামী দিনে আমাদের জীবনযাত্রা এবং কাজের পদ্ধতিতে বিপ্লব আনবে, বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয়করণ, স্মার্ট সিটিজ, এবং সাসটেইনেবল টেকনোলজি ক্ষেত্রে।

প্রযুক্তির অসুবিধা

✪প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব

প্রযুক্তি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এটি ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন। অনেক লোক ICT-এর সুফল নিতে পারে না, কারণ তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ নেই। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বা উন্নয়নশীল দেশে যারা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানেন না, তাদের জন্য প্রযুক্তি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এই প্রযুক্তি ব্যবহারে অসমতা তৈরি হতে পারে।

✪গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি

প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি বড় সমস্যা হলো ডেটা সুরক্ষা। ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংকিং তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনলাইনে আদান-প্রদান হতে পারে এবং তা সাইবার অপরাধীদের হাতে চলে যেতে পারে। হ্যাকাররা সিস্টেমে ঢুকে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য বিপজ্জনক। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একাধিক ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করায় লোকেরা নিজেদের গোপনীয়তা হারাতে পারে।

✪সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

প্রযুক্তি-এর মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগের সুযোগ বাড়লেও, অনেক সময় এটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম এবং অনলাইনে সময় কাটানো, তাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে। একে অপরের সাথে সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে ভার্চুয়াল যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে, শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে।

✪ডিজিটাল বিভেদ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ভিন্ন ভিন্ন। উন্নত দেশে যেখানে ইন্টারনেট এবং প্রযুক্তির প্রবৃদ্ধি ব্যাপক, সেখানে উন্নয়নশীল বা দরিদ্র দেশে এখনও এই সুবিধাগুলি পুরোপুরি পৌঁছায়নি। এর ফলে, এমন দেশগুলির মানুষ প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে, এবং এই ডিজিটাল বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে।

✪শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অনেকেই শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হন, বিশেষ করে দীর্ঘসময় কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করলে চোখের সমস্যা, ঘাড় ও পিঠে ব্যথা, মাথাব্যথা, এবং ঘুমের সমস্যা হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মানসিক চাপ, উদ্বেগ

এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তরুণদের মধ্যে সামাজিক মিডিয়া এবং অনলাইনের অস্থির পরিবেশ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করতে পারে।

✪ভ্রান্ত তথ্য এবং মিথ্যা সংবাদ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো তথ্য খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তা সব সময় সঠিক হয় না। সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যা খবর, অপপ্রচার এবং গুজব ছড়ানো এখন একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষের মনোভাব ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে, COVID-19 মহামারির মতো সময়ে মিথ্যা সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে, যা জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

প্রযুক্তি বর্তমানে আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের শিক্ষা, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, সামাজিক জীবন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন করে রূপ দিয়েছে। তবে, প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথেই কিছু সমস্যা ও ঝুঁকি রয়েছে, যা আমাদের সচেতনভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। সাইবার সুরক্ষা, ডিজিটাল বিভেদ এবং ভার্চুয়াল ও বাস্তব জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ব্যবহারে প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ এবং কার্যকরী করতে পারে, তবে এর অপব্যবহার থেকে সচেতন থাকা উচিত।

প্রযুক্তির অপব্যবহার: বিপর্যয়ে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিষ্কার আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে। এর ব্যবহার প্রতিনিয়ত আমাদের জীবন স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলছে। মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হচ্ছে।কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু দুষ্টপ্রকৃতির মানুষের কারণেই প্রযুক্তির অপব্যবহার হচ্ছে। এ কারণে প্রযুক্তির ফলভোগী ব্যক্তিরা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

শুন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগের প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের কৌশলকেই আভিধানিক অর্থে ডিজিটাল প্রযুক্তি বলে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।এমনকি বাংলাদেশেও। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সব কাজ (যোগাযোগের) সহজেই করা যায়-শুরুতে এমনটিই বলা ও ভাবা হয়েছিল। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমকে (কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক, বিভিন্ন অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার, বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অ্যাপস, ইত্যাদি) আমরা দ্রুত যোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে গণ্য করতে পারি। মোট কথা, তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক কাজ করা যায়। এজন্যই ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির প্রতি মানুষের এত মনযোগ বা আকর্ষণ।

দেশে অব্যাহত ভাবে চলছে নির্বিচারে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার। বিশেষত মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও হিন্দি চ্যানেলের অপব্যবহার। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অন্যান্য মাধ্যমের ভয়ানক আগ্রাসন তো আছেই! দেশের বিরাট এক জনগোষ্ঠী ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির আসক্তির মধ্যে রয়েছে। ফলে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন (এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ মাত্রায় নেতিবাচক পরিবর্তন এসেছে)। আর এর মূল ভুক্তভোগী হচ্ছে শিশু, কিশোর, যুবকসহ প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ।

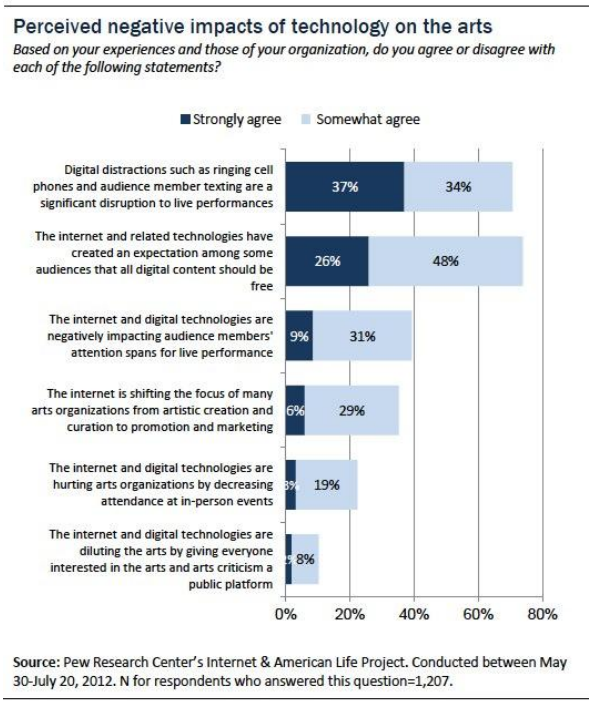
অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভাবে এখন বাজার হচ্ছে ধর্ম (রূপক অর্থে), বাজার স্বর্গ (রূপক অর্থে) বাজারই পরমন্তপঃ হে। সেই বাজারের নিয়ন্ত্রকেরা স্বল্প সময়ে মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতায় আমাদের মত নিম্ন-মধ্যম আয়ের (হতে চলা) দেশকে 'টার্গেট মার্কেট' ধরে তাদের প্রযুক্তির পণ্য-সেবা সমূহের আগ্রাসী বিপণন কার্যাক্রম চালাচ্ছে আমাদের এখানে।

এখন কেনই বা আজ আমদের দেশের মানুষেরা কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে (সবাই না তবে অনেকেই) মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন অ্যাপস ও প্রোগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পরেছে তার কার্যকর কারণগুলোর দিকে নজর দিব আমরা।

সাধারণভাবে অবসর সময় কাটানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রোগ্রামমুখী হয়। অনেকে আবার জীবনের অস্তিত্ববাদী সংকটের কারণেও প্রোগ্রামমুখী হয়। আমাদের সমাজের মানুষের ভয়ানক ডিজিটাল প্রোগ্রাম আসক্তির অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হলো-হৃদয় মাঝে অতিমাত্রায় অমানবিকতার উপস্থিতি, অসামজিকতা, মানসিক বৈকল্য, বেকারত্ব, কু-সামাজিকীকরণ, এটাকে ফ্যাশন হিসেবে নেওয়া, সুষ্ঠু বিনোদনের অভাব, শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া, সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব, মাঠ-পার্কের অভাব হেতু খেলাধুলার প্রতি অনীহা, সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের প্রয়োজনীয় তদারকির অভাব, যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি, জীবনে প্রকৃত ধর্ম চর্চার অভাব ও উক্ত শিক্ষা বাস্তবায়নের অভাব, নিঃসঙ্গতা, বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন, আদব শিক্ষার অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিচারহীনতা ইত্যাদি। মোট কথা সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশের জন্য আদর্শমান কৃষ্টি-কালচারের অনুপস্থিতি (সর্বপর্যায়ে)। ফলতঃ বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার, পর্নগ্রাফি, ডিজিটাল প্রযুক্তির নানান রকমের খারাপ প্রোগ্রাম মানুষের মনোজগতকে গ্রাস করার প্রয়াস পাচ্ছে। সঙ্গগত কারণেই এগুলোর প্রচার ও প্রসারে সেন্সর করা উচিত।

মানুষ বড় বিচিত্র জীব। আরো বিচিত্র তাঁর চিন্তা জগৎ ও মানুষের আচরণ। আমাদেরকে বুঝতে হবে, কম্পিউটার-ফেসবুক-ইন্টারনেট চালাতে পারলেই মানুষ মহাপুরুষ হয়ে যায় না। অন্যদিকে মানুষের আত্মার চাহিদা ও সমাজ বাস্তবতা আমরা একদম ভুলে গেছি। একথাও মনে রাখতে হবে, উন্নতির চরম শিখরে পৌছালেও সেখানে মূল্যবোধ, মানবিকতা না থাকলে তা (সে সভ্যতা) অস্তিত্বহীন হয়ে পরবে অভিবাবকদের সম্পদের পিছনে না ছুটে সন্তানকে

সময় দিতে হবে। কারণ, অতি প্রিয়জনের মমতার স্পর্শ অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে বেচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সঙ্গী ও সুযোগের অভাব রয়েছে।



সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে বাবা-মাদের। বাবা-মায়েদের বুঝতে হবে ভিনদেশী কালচার-ভাষা শেখার জন্য নিজস্ব সংস্কৃতিকে-ভাষাকে ভুলিয়ে দেবার দরকার নেই। এটা বাচ্চাদের নয়, বাবা-মা আর কিছু শিক্ষকদের দোষ। প্রয়োজনে ভিনদেশী আকাশ-সংস্কৃতির (খারাপ) অবাধ প্রবাহ এখনই বন্ধ করতে হবে। তবে তাদের ভালো গুণ (প্রোগ্রাম) গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুকের অপব্যবহারও রোধ করতে হবে-যা অপরাধ প্রবণতার জন্য অনেকাংশেই দায়ী। মোট কথা আমরা আধুনিক হচ্ছি, উন্নত হচ্ছি ঠিকই-কিন্তু একই সঙ্গে পুরানো ঐতিহ্য , ভালোবাসা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধগুলো হারিয়ে ফেলছি। একই সঙ্গে উন্নয়ন, আধুনিকতা, পুরানো ঐতিহ্য হাত ধরাধরি করে থাকবে, যেখানে সবাই থাকবে সুরক্ষিত-তবেই সমাজ হবে শান্তিময়। আমাদের মাথাকে (মস্তিষ্কে) সৎ ভাবনায় পরিপূর্ণ করলে মানুষ চিন্তা চেতনায় সৎ, যোগ্য ও নির্ভীক হবে-লোপ পাবে বিকৃত রুচি, বিকলাঙ্গবাধীদের সংখ্যা যারা কিনা সহিংস হয়।

মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিশুদেরসহ সবাইকে নৈতিকতায় শিক্ষা দিতে হবে সবার আগে। প্রথম বা আদি প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকেই তাদেরকে আদব শিক্ষা দিতে হবে। বর্তমানে এসবের বালাই নেই প্রায় পরিবারে। শিশুদের জন্য অবারিত সুষ্ঠু বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে তারা ভিনদেশি কালচারের দিকে অতিমাত্রায় ধাবিত না হয়।

আমাদের দেশে পাশ্চাতের আগডুম-বাগডুম (অহেতুক অনেক সিলেবাস) শেখানো হয়, শেখানো হয় না নৈতিকতা-মানবিকতা, আদব কায়দা-যা বড়ই পরিতাপের বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের 'গোড়াতেই গলদ'। শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষায় অমূল পরিবর্তন এনে, চরিত্র গঠনোপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে সর্বত্র। তাহলেই সৎ মানুষ গড়ে উঠবে সমাজে।যারা হবে অসহিষ্ণু-সংস্কৃতিমনা-দেশপ্রেমিক। যারা কিনা লিপ্ত থাকবে না কোনরূপ সহিংসতায়। সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে বুদ্ধি আর বিবেচনায় ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে সবাইকে।এ কথা ঠিক যে, আমাদের বিনোদন মাধ্যমগুলো আগেকার দিনের মত আর ভালো মানের হৃদয়গ্রাহী প্রোগ্রামসমূহ উপহার দিতে পারছে না (তবে সবাই না)। আমরা খুব সংস্কৃতিমনা, ইতিহাস সচেতন সমাজমনস্ক-দর্শনপ্রীত, রাজনৈতিক সচেতন জাতি নই; খুব মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, সামাজিক কৃষ্টি-ঐতিহ্য অবহেলায় নষ্ট করে ফেলি। এর সুযোগে আমাদের সামাজিক শত্রুরা প্রকরান্তরে দেশের শত্রুরা তো আর বসে নেই! আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যমে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঠিকই চালাচ্ছে। সংস্কৃতিক প্রবাহ তো আর বাধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। শুধু নীতিমালা আর ক্ষমতার জোরে বিশ্বায়নের অবাদ সাংস্কৃতিক আটকে রাখা কঠিন। একমাত্র দেশপ্রেম ও মানসম্পন্ন-যুগোপযোগী প্রোগ্রাম দিয়েই তা মোকাবেলা করতে হবে। সাংস্কৃতিক প্রবাহকে ইতিবাচক ধারায় সঞ্চারিত করে দিতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

দেশের প্রকৃত সংস্কৃতি ধারণ করার জন্য সভ্যতা-ইতিহাস-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়বলীর চর্চা বাড়াতে হবে।

জীবন জাগানোর আনন্দের অন্বেষণে অন্যকে সাহায্য করতে হবে। মানুষের সুকুমার হৃদয় বৃত্তিকে জাগিয়ে, সুষ্ঠু বিনোদন-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জারকরসে মানুষকে তৃপ্ত করে, ভরিয়ে দিয়ে মানুষের পরিশুদ্ধ চিন্তা ও ভাবনা প্রকাশে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের হৃদয় বৃত্তিতে বড় ও মহৎ হতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে জীবন এক ভঙ্গুর ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে। কী এক বেদনাদায়ক অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি অথবা সমগ্র মানবজাতি এমনকি দেশবাসী! যার ফলফল চারিদিকে শুধু যদ্ধ আর যুদ্ধ। একমাত্র সেবা, ত্যাগে, সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানবধর্মের প্রতি সু-বিচার করে এই অবস্থা হতে উত্তরণ পাওয়া যেতে পারে। মানুষকে সু-বিবেচনা প্রসূত বোধোদয়ের পরিচয় দিতে হবে, স্বার্থপর, সহিংস হলে হবে না। আরো প্রয়োজন নিঃঅহংবাদী নীতির প্রচার ও প্রসার। একটি সুন্দর মনই পারে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারে আজকাল পরকীয়া, পড়ালেখায় অমনোযোগীতা, অসহিষ্ণুতাসহ , অসমপ্রেমের জোয়ারে ভেসেছে সমাজ। যা সকল প্রকার সহিংসতার অন্যতম

কারণ। সর্বত্র এখন চলছে পরকীয়া প্রেম সহিংসতা, তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ডিজিটাল দুর্নীতিই মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। আর সমাজে এ ধারার অপ্রতিরোধ্য উত্থানের ফলে-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে সর্বত্র বাজছে ভাঙ্গনের সুর। যা প্রকারান্তরে সহিংসতা, ভংগুর পরিবারে রূপ নিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সমাজে কদর বাড়ছে পাপারাজিদের, বিকলাঙ্গবাদীদের। শিথিল হচ্ছে সামাজিক বন্ধন। মানুষের মাঝে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে সভ্যতাই আজ হুমকির মুখে পড়েছে। তবে এর প্রধান শিকার হচ্ছে প্রায় পুরো মানব সমাজ। দিন দিন যেন সবাই আরও নতুন উদ্যোমে ধরা দিচ্ছে-পরকীয়া, সাইবার অপরাধের মায়াজালে। এখন শহুরে-গ্রাম্য বধূর পরকীয়া প্রেম, বিয়ে ও সাইবার অপরাধের ঘটনায় আইনি লড়াই হচ্ছে সর্বত্র। এক জনের বধূ বা স্বামী দীর্ঘদিন ঘর সংসার করার পর স্বামী বা স্ত্রীকে ছেড়ে প্রেমিক বা অবৈধ প্রেয়সীকে বিয়ের ঘটনায় বাংলার প্রায় এলাকাতেই আজ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে অরাজকতায় রূপ নিচ্ছে। এই চাঞ্চল্য, অরাজকতা আজ দেখা দিয়েছে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে। এ ধারায় আর ভাটা পড়বে বলে মনে হয় না। সবদিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, সমাজ পরিবার এখন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক অপরাধ , পরকীয়া, অসম প্রেমের দিকে ঝুঁকছে বেশ জোরে শোরেই। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদেরকে সচেতন হয়ে সঙ্গী বা সঙ্গীনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রসারতা বাড়াতে হবে। যাতে করে সঠিক লোক নির্বাচনে কোন ভুল না হয়। আর এ সবের সঠিক ব্যবহারের উপর নজর দিতে হবে, সচেতনতামূলক প্রচারণা বাড়াতে হবে।

লেখাপড়া করার কোনো বিকল্প নেই। অথচ লেখা ড়ার সোনালি সময় হেলায় পার করে দিচ্ছে সন্তানরা। টিভি নয়, কম্পিউটার নয়, ইন্টারনেট নয়, ফেসবুক নয়, মোবাইল নয়, ব্যস্ততার ভ্যানিটি নয়; বরং আপনার সন্তানটিকে পড়ার অভ্যাস গড়তে সাহায্য করুন। রাজনীতিবীদসহ বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করছি-দেশ গড়তে হলে আগে ভালো মানের স্কুল গড়ে তুলুন (ভাল মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে)। আমি বলি, যে দুঃখ-দৈন্যের বাংলাদেশে আজ আমরা বাস করছি, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা (নৈতিকতা সম্পন্ন), সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক ন্যায় বিচার আমাদের সেই দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাতে পারে। কারণ অজ্ঞতা থাকা আর অন্ধকারেরর মাঝে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব, এখনই সময়-জেগে উঠার- “ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে”।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা

নতুন প্রজন্মের শিশুদের যেখানে জ্ঞানে-গুণে উন্নততর চর্চা করা উচিত, সেখানে শিশুরা জন্মের উষালগ্ন থেকেই জড়িয়ে পড়ছে আধুনিক প্রযুক্তির বেড়াজালে। আমরা শৈশব দেখেছি ভোরের পাখির কলতান কিংবা সোনালি আভা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া সূর্যের রশ্মিতে; কিন্তু আজকের প্রজন্মের শিশুদের দিন শুরু হচ্ছে অন্ধকার জানলা-দরজা বদ্ধ কামরার মোবাইলের স্ক্রিনে। ফলস্বরূপ একদিকে তারা খুঁজে পাচ্ছে না প্রকৃতির মলিনতা অন্যদিকে বঞ্চিত হচ্ছে পরিবার-পরিজনের ভালোবাসার মধুর মিলন থেকে। এদের জীবন-যৌবন সবকিছুই একটা ছোট ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে। যেমন একটা খাঁচায় বদ্ধ পাখি ডানা ঝাঁপটানোর পরেও একই অবস্থানেই থেকে যায় ঠিক তেমনি আবদ্ধ এই বর্তমান প্রজন্মের নবজাতক।

একসময় ছিল বিকালের আলো গড়াতে না গড়াতেই খেলার মাঠগুলোতে ছোটাছুটিতে মেতে থাকত শিশু-কিশোররা। ফুটবল, ক্রিকেট, গোল্লাছুট, কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, মার্বেলসহ নাম না জানা কত-শত বিনোদনে পূর্ণতা পেত গোধূলির সময়টা। স্কুল-কলেজে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সহপাঠীদের সঙ্গে আড্ডা, দৌড়াদৌড়ি, দুষ্টুমিই ছিল শিশুকিশোরদের নিত্যদিনের আনন্দ। সকাল-সন্ধ্যায় গল্পের বইয়ে ডুব দেওয়া, বড়দের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাওয়া, প্রবীণদের কাছ থেকে গল্প শোনা ছিল তাদের কাছে এক ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা। সময়ের পরিক্রমায় আজকে যেন সবই হারিয়ে যেতে বসেছে। এসবের জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ট্যাব আর ল্যাপটপের মতো আধুনিক সব প্রযুক্তি। যেখানে কথিত আছে যে প্রযুক্তি আমাদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনার কথা, সেখানে এই অবশ্যম্ভাবী প্রযুক্তিই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও তরুণদের জন্য।

মুঠোফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে থাকছে শিশু-কিশোর, তরুণদের একাংশ। পড়াশোনা করবে ফোনের মাধ্যমে, খাবার হাতের মুঠোই পাবে ফোনের মাধ্যমে, আত্মীয়তা রক্ষা করবে ফোনের মাধ্যমে, এমনকি বিয়ের জন্য পাত্রপাত্রী খুঁজতেও ফোনের জুড়ি নেই। বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য হাস্যকর একটি ব্যবস্থা হচ্ছে মুঠোফোন বিবাহ। যেখানে আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি অবাধে একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছে ৫০-৬০ বছর, কিন্তু আমরা? বছর অতিক্রান্ত হবে তার নিশ্চয়তাটুকু নেই। আমাদের ব্যস্ত জীবনের সর্বস্তরে ছেঁয়ে গেছে এই প্রজন্মের অমোঘ হাতিয়ার মুঠোফোন। কেউ মুঠোফোন বা ল্যাপটপে গেমস খেলে। এই গেমসের আসক্তির ফলে আলমডাঙ্গা রেললাইনে বসে

মোবাইল গেম ফ্রি ফায়ার খেলার সময় খুলনাগামী একটি ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে ওয়ালিদ হোসেন বিদ্যুত (১৮) নামের এক কিশোর।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ও শিক্ষাবিদ ড. মো. কায়কোবাদ বলেন, 'এত বেশি প্রযুক্তিনির্ভরতা সমাজে একটা বিরূপ প্রভাব ফেলবে। কারণ, এই শিশুরা মানুষের সঙ্গে মিশতে না শিখে বরং ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সময় কাটানো শিখছে। সে মানবিক সমাজে না বেড়ে বরং সাইবার সমাজের মধ্যে বড় হচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক হৃদয় স্থাপিত হওয়ার বদৌলতে স্থান পাচ্ছে পৈশাচিক মনুষ্য তৈরির হৃদয়। ফলে তৈরি হচ্ছে পাশবিক ঐশীর মতো হাজারো ছেলেমেয়ে, যারা অবলীলায় ঠান্ডা মস্তিষ্কে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলছে জন্মদাত্রী পিতা-মাতা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, নানা-নানিকে।

প্রযুক্তি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক আনন্দ-বেদনার স্পর্শ কি ঠিক আগের মতোই আছে?

আজ কিন্তু তারা আধুনিক, তবে শিক্ষিত নয়। তাদের মেধার বিকাশ হচ্ছে কিন্তু আত্মার পরিপুষ্টি সাধন নেই বললেই চলে। কেননা প্রাকৃতিক আর কারিগরি বিনোদনের মধ্যে থেকে যায় আকাশ-পাতাল ফারাক। না তারা জীবনের পথে একজন সফল পথিক তৈরি হচ্ছে আর না বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। ঘরবন্দি থাকতে থাকতে এক সময়ে বের হচ্ছে পোলট্রি মুরগির মতো ঝিমধরা মনুষ্য দেহ। এটা কি আগামী দিনের ধ্বংসের জন্য অল্প অল্প সঞ্চয় নয়? কিন্তু তাই বলে প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবহার বন্ধ নয় বরং ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। পরিবারের ছোটদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখা গেলে, প্রযুক্তি ও অনলাইনের প্রতি আসক্তি অনেকটাই কমানো সম্ভব। এতে করে তারা খেলাধুলা করে আনন্দও পাবে আর শরীরও সুস্থ থাকবে। এছাড়া শিশুরা সাধারণত অনুকরণপ্রিয় হয়। তাই অভিভাবকদের নিজেদের কার্যকলাপ নিয়েও বাচ্চাদের সামনে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই স্মার্ট হয় না, প্রযুক্তির অভিশাপ থেকে নিজে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখাই হলো প্রকৃত স্মার্ট।

প্রযুক্তির ফাঁদ

প্রযুক্তির অপব্যবহার আমাদের জীবনে নানা সমস্যা ডেকে এনেছে। মানুষ আজ যন্ত্রের মতো হয়ে পড়ছে, মানবিক সম্পর্ক হারিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মনোযোগ কমে যাচ্ছে। ভুয়া খবর, সাইবার অপরাধ, হ্যাকিং, গোপনীয়তার হুমকি—সবই প্রযুক্তির ফাঁদ। আবার অটোমেশনের ফলে অনেক মানুষ চাকরি হারাচ্ছে। প্রযুক্তিও পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যতই আমরা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হচ্ছি, ততই তার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছি। মানুষ আজ বাস্তব জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে ভার্চুয়াল জগতে হারিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ায় সময়ের অপচয় হচ্ছে, পড়ালেখায় মনোযোগ কমছে, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে শিশুরা বাস্তব জীবন ভুলে যাচ্ছে।

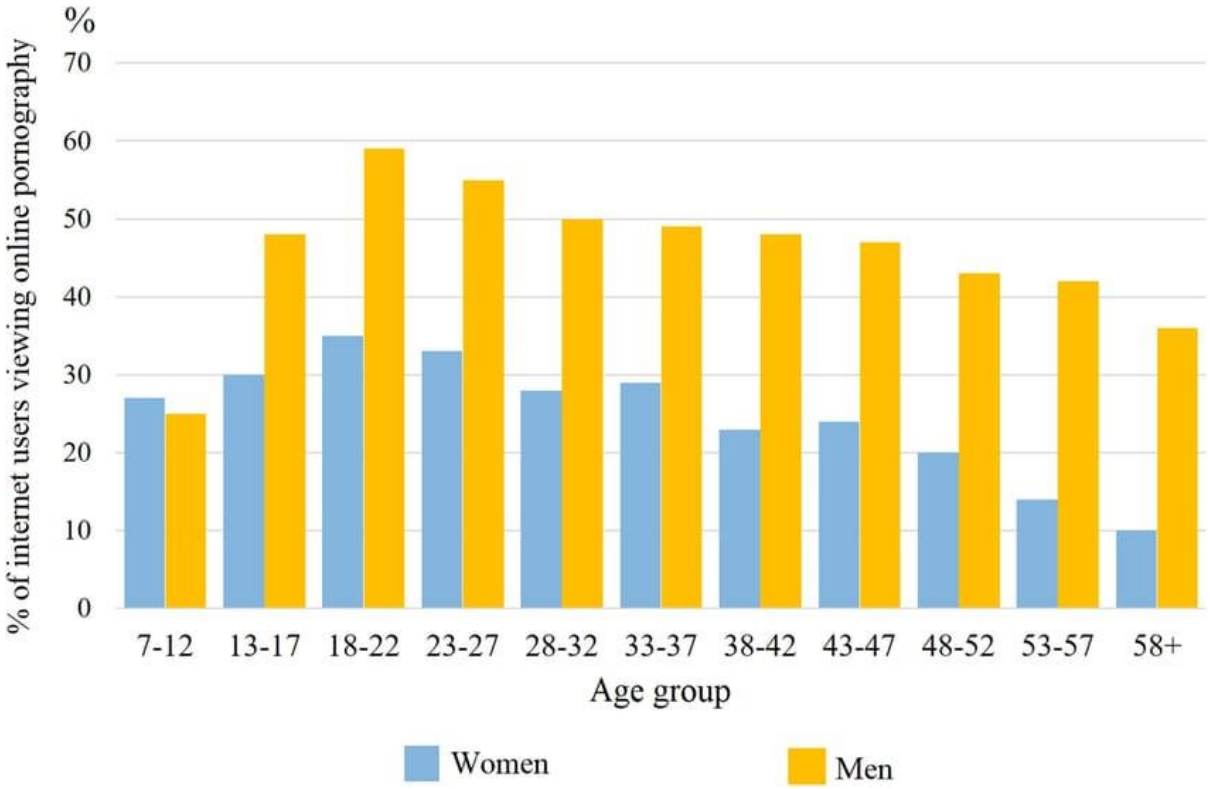
প্রযুক্তি আজ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্যও হুমকি। অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য সহজেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ভুয়া খবর, প্রতারণা, সাইবার বুলিং—এসব সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এছাড়া প্রযুক্তির অটোমেশনের কারণে অনেক কর্মসংস্থান নষ্ট হচ্ছে, যা বেকারত্ব বাড়াচ্ছে।

ইন্টারনেট-পর্নোগ্রাফি

গত মাসের শেষের দিকে বিটিআরসি জানিয়েছে যে 'বাংলাদেশে ইন্টারনেট-পর্নোগ্রাফি ও আপত্তিকর কন্টেন্ট প্রকাশ বন্ধের প্রক্রিয়ার শুরুতে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ৫৬০ টি সাইট বন্ধ করেছে।'

এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। ফাঁক ফোকর কতটুকু বন্ধ করা যাবে বা করা হবে সে আলোচনায় না গিয়ে আপাতত এই পদক্ষেপটিকে সাধুবাদযোগ্য বলা প্রয়োজন। প্রযুক্তির নামে এখন যে এক প্রকারের 'হিস্টিরিয়াগ্রস্ততা'- এ অবস্থায় এ পদক্ষেপও কম নয়! এটা প্রমাণ করছে পরিস্থিতি আসলেই কত ভয়াবহ।

একটি দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বেসরকারী সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী ঢাকার স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ শতাংশ নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখছে। (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১)



এই প্রজন্মের বর্তমান ও ভবিষ্যত নানা দিক থেকে চরম ঝুঁকিগ্রস্ত হয়ে পড়ার কারণেই হয়তো বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যে কারণেই নেয়া হোক, এখন এই বোধোদয় প্রয়োজন যে, মানুষের জীবনে সংযমের কোনো বিকল্প নেই। সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য এ এক বিকল্পহীন ব্যাপার। মনের সকল ইচ্ছা পূরণ করা, এককথায় প্রবৃত্তিপরায়ণতা মানুষের সুস্থতা ও সুখী-সুন্দর জীবনের জন্যই হুমকি। আর এর জন্য যেমন দরকার ব্যক্তিগত চেতনা তেমনি দরকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

এই চেতনাও প্রয়োজন যে, যৌনতা জীবনের একটি অংশমাত্র; এটিই জীবন নয়। আর জীবনের এই অংশেও অতি প্রয়োজন সংযম রক্ষা । কারণ এক্ষেত্রের স্বেচ্ছাচারও একজন মানুষের শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইসলাম এই সীমা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, যা রক্ষা করা মানুষের নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। এ কারণে যে জীবন-যাপনে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অমনোযোগী এবং যারা ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরোধী তাদের জন্য বেদনাবোধ হয় বৈকি।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীল অনেক বড় আশা প্রকাশ করে বলেছেন, '৮০ থেকে ৭০ শতাংশ পারলেও বড় কাজ হবে।' এই আগ্রহটা ইতিবাচক। সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করা উচিত।

সদিচ্ছা ও নিষ্ঠা থাকলে কিছু সফলতাও যে আসবে না, তা নয়। কিন্তু একইসাথে এই কথাটিও মনে রাখলে ভালো হবে যে, এটি খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কিছু সুফল পাওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা। গোটা সমাজ-ব্যবস্থা যখন এক ধারায় চলে তখন দু'এক জায়গায় কিছু বিধি নিষেধ বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না।

এখানেই বড় পার্থক্য সমাজ-সংস্কারের ইসলামী ব্যবস্থা ও তথাকথিত প্রগতিবাদী ব্যবস্থায়। ইসলামেও দৃষ্টির সংযমের সুস্পষ্ট বিধান আছে। কিন্তু ইসলাম যখন দৃষ্টির সংযমের বিধান দিয়েছে তখন একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন বিধান দেয়নি, ঐ ব্যবস্থাটাও দিয়েছে, যা এই সংযমের পক্ষে সহায়ক। ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থায় সতর থেকে শুরু করে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও লেবাস-পোষাক পর্যন্ত নানা বিষয়ে এবং ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা-দীক্ষা,বিচরণ-উপার্জন, সংস্কৃতি-বিনোদন, পর্ব-উৎসব প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত এক ব্যবস্থা, যা দৃষ্টির সংযম থেকে শুরু করে চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষা পর্যন্ত পবিত্রতার সব কিছুকেই সহজ করে তোলে। আর এই ব্যবস্থার সাথে রয়েছে ইসলামের খোদাভীতি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতির মতো গভীর চেতনা ও বিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষকতা, যা একজন মানুষকে সংযমের বিধান পালনে স্বতঃস্ফূর্ততা দান করে। সারকথা এই যে, ইসলামে একেকটি বিধানের পেছনে একেকটি ব্যবস্থা কাজ করে তেমনি এর প্রতিটি বিধান ইসলামী চেতনা ও বিশ্বাসের গভীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এটা তার সাফল্যের এক বড় কারণ। আর এ কারণে বর্তমান প্রতিকূল স্রোতেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর সাফল্যের উদাহরণ একেবারে কম নয়।

পক্ষান্তরে এখনকার প্রগতিবাদী সমাজে অপারগতাবশত যে সকল সংযমের বিধান বা ব্যবস্থা কখনো কখনো আসছে এগুলো সাধারণত সাফল্যের মুখ দেখছে না। কারণ, এসব বিধান ও ব্যবস্থা 'বিচ্ছিন্ন' ও 'আরোপিত'। অর্থাৎ বিশেষ কোনো ক্ষেত্রের ঐ বিধানটি এসংক্রান্ত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সাংঘর্ষিক। যেমন, আলোচ্য বিষয়টিই ধরুন। এখানে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে একটি বিধি-নিষেধ আরোপিত হলেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক, মেলা-মেশা, লেবাস-পোষাক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রচলিত ধারাটা ঐ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বরং বলা যায়, বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতির একটি বড় অংশ দৃষ্টির স্বেচ্ছাচারের অনুকূল ও প্রেরণাদানকারী। এ অবস্থায় এ ধরনের বিচ্ছিন্ন কোনো পদক্ষেপ কীভাবে সফল হতে পারে? তাছাড়া এই বিধি-নিষেধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করার মতো শক্তিশালী কোনো চেতনা ও প্রেরণাও তো কার্যকর নেই। বরং নানাভাবে ঈমান ও তাকওয়ার চেতনাকেই দুর্বল ও বিলুপ্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে এইসকল বিধি-ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে অনেকটাই 'আরোপিত' প্রকৃতির। কাজেই ফাঁক ফোকর খোঁজার ব্যাপারটা অনেক বড় ও

ব্যাপকভাবেই এসে যাচ্ছে। এ কারণে সত্যিকার অর্থেই জাতি ও সমাজকে অশ্লীলতা ও তার কুফল থেকে রক্ষা করতে হলে ঈমান ও তাকওয়া;বিশ্বাস ও খোদাভীতির চর্চার কোনো বিকল্প নেই। চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাস ও কর্মে ইসলামী শিক্ষা ও জীবনধারা অনুসরণের দাওয়াতই আল্লাহর ইচ্ছায়- ব্যক্তি ও সমাজকে আত্মসংযমের পথে নিয়ে আসতে পারে। তখন দায়িত্বশীলদের পক্ষ হতে অন্যায়-অপরাধ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ-আয়োজনগুলোও সফলতার মুখ দেখবে।

এই সংযম ও নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই সত্যিকারের প্রগতি ও চিন্তার মুক্তির পরিপন্থী নয়; বরং তার সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। দৃষ্টির সংযম থেকে শুরু করে চরিত্র ও নৈতিকতার শুদ্ধি পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থাটা ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থতার জন্যই প্রয়োজন। সমাজ যদি সুস্থ থাকে তবেই না প্রগতি ও প্রযুক্তি। অসুস্থ মৃতপ্রায় সমাজে প্রযুক্তি ও প্রগতি কী কাজে আসবে?

বুয়েট টিচারের তাওবা

আমি এরকমও শুনেছি, আমার কাছে এসে এক যুবক তওবা করছিলো। বুয়েটের নব নিযুক্ত টিচার। তার বক্তব্য ছিল এরকম যে, সে ইন্টারমিডিয়েটের সময় থেকে পর্ণ আসক্ত। এখন সে বুয়েটের শিক্ষক। তখন থেকে সে কবে রাতে ঘুমিয়েছে- ভুলে গেছে।
আল্লাহ মাফ করুন। হতে পারে, আমাদের মধ্যেও কোন যুবকের সাথে এই ঘটনাটা মিলে যাচ্ছে। আপনার জন্য আমার জন্য হয়তো গল্প হতে পারে। কিন্তু কারো জন্য এটাই বাস্তব হতে পারে।
তো তার বক্তব্য ছিল, সে কবে রাতে ঘুমিয়েছে–ভুলে গেছে। ইসলামপ্রেম তার অন্তরে বিদ্যমান। তাই কখনো কখনো হয়তো সে ফিরে আসার চেষ্টা করেছেও; কিন্তু ফেরত আসতে পারে নাই।
একবার চিন্তা করে দেখুন, ইন্টারমিডিয়েট থেকে নিয়ে বুয়েটের টিচার হওয়া পর্যন্ত কত বছর সময় লাগে!? এই বিশাল সময়ের মধ্যে কবে সে রাত ঘুমিয়েছে ভুলে গেছে। তাহলে তার আসক্তিটা কোন পর্যায়ের ছিল! এটা ছিল পরনারীর প্রতি আকর্ষণের কারণে। পরনারীর প্রতি আসক্তির কারণে তাকে এই নোংরা অভ্যাস পেয়ে বসেছিল।

মোবাইল ফোন¬- সেলফোন না হেল ফোন?

গত ৫/৩/২০০৯ ঈ. তারিখে পাকিস্তানের জনপ্রিয় দৈনিক জং পত্রিকায় জনাব ফারুক কায়সার সাহেব ‘মোবাইলের ক্ষতিকর ব্যবহার সম্পর্কে ‘মোবাইল ফোন’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। তিনি যেভাবে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তা পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরছি। তিনি লেখেন :

কেমন হত যদি মোবাইল না থাকত! মোবাইল ফোন ও প্রাইভেট নিউজ চ্যানেলের আগমনের সাথে সাথে আমাদের সুখ-শান্তি ও ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যও বিদায় নিয়েছে। আগে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা যেখানে বড়দের সামনে পরস্পরে কথা বলতেও ভয় পেত, বাড়িতে ফোন থাকা সত্ত্বেও ফোনে কথা বলা কিংবা কথা শোনার সাহস করত না, সেখানে সেলুলার ফোনের সুযোগে এখন তারা নিজেদের রুমে বা বাথরুমে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতেও ইতস্তত বোধ করে না।

মুরুবীদের সামনেই এসএমএস করে, চ্যাটিং করে, প্রেমালাপ করে, ডেটিং-এর জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করে। এখন স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে মুদি দোকানদার এমনকি ভিক্ষুকদের কাছেও মোবাইল না থাকা পশ্চাৎপদতা বলে মনে করা হয়। মোবাইলের বদৌলতেই হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটানো সহজ হয়ে গেছে। অন্যদিকে নাশকতাকারী ও সন্ত্রাসীদেরকে ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে। গ্রাহকের আইডি (পরিচয়পত্র) ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মোবাইল সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা কোথায়, কীভাবে হামলা চালানো যাবে, ডাকাতি ও লুটপাট করা যাবে তার পরিকল্পনা করে। অপরদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে এই মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলছে এবং পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। একথা কি সত্যি যে, মোবাইল যদি না থাকত তাহলে আমাদের উন্নতি-অগ্রগতি থেমে যেত? এটা ঠিক যে, মোবাইলের বদৌলতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। দূরত্ব কমে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল উন্নতি ও সুবিধা উন্নত জাতির জন্য, আমাদের মতো অনুন্নত জাতির জন্য নয়।

টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে মোবাইল সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের এত বেশি ছড়াছড়ি যে, মনে হয় মোবাইল করা আর প্রেম ও রসের আলাপ করা ছাড়া যেন পৃথিবীতে আর কোনো কাজই নেই। গাড়ি চালানোর সময় সামনের কোনো গাড়িকে যদি দেখা যায় যে, রাস্তার মধ্যে একবার এদিক আরেকবার ওদিক করছে তাহলেই বোঝা যায় যে, ড্রাইভারের এক হাত স্টিয়ারিংয়ে আর অন্য হাতে রয়েছে মোবাইল। ইদানীং কল করলে অপর প্রান্ত থেকে গানও শোনা যায়। কোনো কোনো দ্বীনদার লোক রয়েছে যারা গানের বদলে কুরআনের আয়াত ও তেলাওয়াত সেট করেন। এক্ষেত্রে কী হয়? বহু লোক কুরআন তেলাওয়াত শুনে মিথ্যাচার করতে শুরু করে, অবৈধ কারবার নিয়ে আলাপ করে। এসএমএস একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, রাজনৈতিক আলাপ, সরকার কিংবা নেতৃস্থানীয় কারো বিরুদ্ধে ইংরেজিতে মত বিনিময়সহ

বহু কিছু হয়ে থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেই মোবাইলকে তাদের উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। তাদের অবসর সময় কাটে ফোনে অশ্লীল কথাবার্তা বলে ও ডাউনলোডকৃত অশ্লীল ছবি দেখে। আমার কয়েকজন বন্ধু আছে, যারা কোথাও একত্র হলেই কার কাছে নুতন কী মডেল আছে, তা নিয়ে গল্প শুরু করে। ৯৯ শতাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থা হল তাদের সাথে না কম্পিউটারের কোনো সম্পর্ক আছে আর না ই-মেইলের কোনো প্রয়োজন তাদের পড়ে। আর বাকি এক শতাংশের অর্ধেক এমন যাদের ইন্টারনেট সংযোগ নেই, যদি থাকেও তাহলে নগ্ন ছবি আর অশ্লীল ছায়াছবি দেখার কাজেই তা ব্যবহৃত হয়।

এখন তো উচ্চপদস্থ ও সরকারী লোকদের দুই-তিনটি করে মোবাইল সংযোগ থাকে। একটি সাধারণ মানুষের জন্য, অন্যটি প্রেমিক-প্রেমিকা ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য তৃতীয়টি স্ত্রীর জন্য। ফোনকারীর আইডি দেখে এই সমস্ত বড় লোকেরা বিপদগ্রস্ত ও সমস্যাগ্রস্ত লোকদের কথা শোনে না। কারো কারো ফোনে তো আনসারিং মেশিন লাগানো থাকে। যাতে কথাবার্তা শুনে সে উত্তর তো দেয়ই না, ভুলে কখনও কল রিসিভ করে ফেললে মিথ্যা কথা বলে। যেমন- আমি এখন শহরের বাহিরে আছি। একবার আমি ইসলামাবাদের এক কফিশপে এক মন্ত্রীকে বসা দেখে তাঁকে কল করলাম। মন্ত্রী মহোদয় রিসিভ করে বললেন, আমি এখন করাচিতে আছি। আমি বললাম, ভাগ্যক্রমে আমিও করাচিতে আছি। যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার সাথে একটু দেখা করে নেই। সে বলল, আমি তো সন্ধ্যার ফ্লাইটে ফিরে যাব, আপনি কীভাবে আমার সাথে দেখা করবেন? আমি বললাম, আমি এখনই দেখা করছি। একথা বলেই হাঁটতে হাঁটতে আমি তার টেবিলে পৌছে গেলাম। সে আমাকে দেখে বিব্রত হল। এরপর শুকনো একটি হাসি দিয়ে বলল, দোস্ত! আগে তো মিছেকথা বলে পার পাওয়া যেত এখন আর পার পাওয়া যায় না! আমি মনে মনে বললাম, মন্ত্রী মশাই মিথ্যে বলেছেন এটা কোনো দোষ নয়। ধরা খেয়ে গেলেন কেন এজন্য মোবাইলের দোষ হয়ে গেছে। আমাদের দেশে চোর-গুন্ডা আর ভিক্ষুকরা মোবাইল থেকে যত উপকৃত হতে পেরেছে সম্ভবত আর কেউ ততটা পারেনি। একবার এক ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইসলামাবাদে তো ভিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এখন কী করবে? উত্তরে সে মোবাইল বের করে বলল, এটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ ধরতে পারবে না। কখনও কোনো সেন্ট্রি আমার পিছে লাগলে আমার সাথী আমাকে ফোন করে সতর্ক করে দিবে। সে পৌঁছার আগেই আমি তার আওতার বাইরে চলে যাব। ব্যাংক ডাকাতরাও মোবাইলের বদলে আর্থিকভাবে বড় মাপের লাভ হাতিয়ে নিয়েছে। ব্যাংক থেকে কেউ টাকা নিয়ে বের হওয়ার সময় ডাকাতদের সঙ্গীরা ব্যাংকের ভেতর থেকেই ফোনে জানিয়ে দিচ্ছে অমুক নগদ এত টাকা নিয়ে ব্যাংক থেকে বের হয়েছে। এভাবে বাস ডাকাতদেরকেও তাদের সাথীরা ফোনে জানিয়ে দেয় অমুক অমুক বাসে ...।

বড় লোকদের মধ্যে পুলিশ অফিসার, আইজি, সচিব, সংবাদপত্র বা চ্যানেলের মালিকদেরও দুটি মোবাইল থাকে। একটি সেক্রেটারির কাছে থাকে, অন্যটি ভি.আই.পি দের জন্য। সাধারণত সেক্রেটারির নম্বর সবাইকে দেওয়া হয়। যদি কোনো সাধারণ লোক কোনো প্রয়োজনে সাহস করে কল করে তখন সেক্রেটারি বলে দেয়, স্যার এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে আছেন। ফলে তারা তাঁদের সাথে কখনই মোবাইলে কথা বলার সুযোগ পায় না।

প্রিয় পাঠক! এভাবেই আমাদের অন্যান্য কর্মকান্ডের মতো মোবাইলও আমাদের দুই নম্বরী সমাজ ব্যবস্থারই প্রতিনিধিত্ব করছে। যেখানে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ নেই। যৌনতা ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, ধোকাবাজি, প্রতারণা, ঘুষ ও মিথ্যার জয়জয়কার। সততা ও সত্যবাদীতার যেখানে কোনোই স্থান নেই, সেই সমাজ যতই উন্নতি করুক, যতই আলীশান ইমারত ও প্লাজা তৈরি করুক, যত মোবাইল কানে লাগিয়ে ঘুরতে থাকুক। একদিন ধ্বংস ও বিপর্যয়ের করাল গ্রাসে পতিত হবে।'

প্রসঙ্গত বলতে হয়, নিবন্ধকার যদিও তার নিজের দেশ সম্পর্কে কথাগুলো বলেছেন কিন্তু সচেতন ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করেন যে, বাস্তবতার যে ভয়াবহ রূপ এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের দেশের চিত্রের খুব বেশি অমিল নেই। তবে মোবাইল ফোন হচ্ছে যোগাযোগের একটি মাধ্যম মাত্র। এটির ভালো-মন্দ নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর। প্রযুক্তির এই সুবিধাগুলো গ্রহণ করে আমরা আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে পারি, আমাদের মূল্যবান সময় সাশ্রয় করতে পারি, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে জাতির চারিত্রিক ও আদর্শিক পতন ঘটে সে জাতির কাছে যতই উন্নত উপায় উপকরণ থাকুক না কেন তা তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে অবক্ষয় ও পতনকেই ত্বরান্বিত করে। নিবন্ধকার সত্যিই বলেছেন যে, এগুলো প্রয়োজন উন্নত বিশ্বের, আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলোতে এগুলো বরং বিনোদনের সামগ্রী। এখন আমরা যদি এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই, তাহলে আমাদের নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতি অপরিহার্য। আর এর জন্য আমাদেরকে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে। সেজন্য আলেম ও দ্বীনদার শ্রেণীকে দাওয়াতের ময়দানে আরো জোর কদমে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সাথে সরকারের পরিচালনায় যারা রয়েছেন তাদের কর্তব্য হল, মোবাইলের এই অপব্যবহার থেকে কীভাবে জাতিকে বাচানো যায়, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা। যেমন গভীর রাত্রে ফোন কোম্পানিগুলো বিল কমিয়ে দেয়। এর ফলে দেশের যুব সমাজ রাত্রের ঘুম নষ্ট করে কথা বলে, ফলে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, দিনের বেলা কাজের উদ্যম

হারিয়ে যায়। তাই আইন করে এ ধরনের ব্যবস্থা বন্ধ করা উচিত। তদ্রূপ মোবাইলের ইন্টারনেটে অশ্লীল ও ক্ষতিকর সাইটগুলো ঢুকতে না দেওয়া, পরিচয় পত্রহীন কোনো সীম যাতে ব্যবহার না হয়, তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

গান ও বাদ্যযন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আমার এক ছাত্র এসে বলল, উস্তাদ! গান শোনা তো জায়েয হয়ে গিয়েছে। এই বলে সে একটি মাসিক পত্রিকার রেফারেন্স দেখাল। আরেক ছাত্র বলল, উস্তাদ! ড. ইউসুফ কারযাভী তো বাদ্যসহ গানকে জায়েয বলেছেন! গান-বাজনার পক্ষে কেউ এই যুক্তি দেন যে, দফ ছিল তৎকালীন আরবের বাদ্যযন্ত্র। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন তা আরো উন্নত হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, বিয়ে-শাদিতে গান-বাজনা করা সুন্নত। কিছুদিন পর আমার সেই ছাত্র এসে বলল, উস্তাদ! বাদ্যসহ গান জায়েয, এটা শোনার পর গানের প্রতি আমার সংকোচ কেটে গেছে। কেমন আনন্দ আনন্দ লাগছে। এই বিষয়টি আমি অনুধাবন করলাম এবং সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলাম যে, এ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত শোনার চেয়ে প্রিয় শিল্পীর গান শোনাই তার কাছে বেশি ভালো লাগবে। আর ইবলিস শয়তান তো এটাই চায় যে, আল্লাহর বান্দা কুরআন থেকে দূরে থাকুক। এজন্যই তো আবু বকর রা. গানবাদ্যকে শয়তানের বাঁশি বলে আখ্যায়িত করেছেন। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার চেয়েও এটা ভয় ভাষ্য : আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানে আখেরাত-প্রত্যাশী মুমিনদের প্রশংসা করার পর দুনিয়া-প্রত্যাশীদের ব্যাপারে বলছেন,

“আর একশ্রেণীর লোক আছে, যারা অজ্ঞতাবশত খেল-তামাশার বস্তু ক্রয় করে বান্দাকে আল্লাহর পথ থেকে গাফেল করার জন্য।” (-সূরা লুকমান : ৬)

উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে বলা হয়েছে যে, নযর ইবনে হারিস বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী খরিদ করে এনে তাকে গান-বাজনায় নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনানোর জন্য সে গায়িকাকে আদেশ করত এবং বলত মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায, রোযা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে শুধু কষ্টই কষ্ট। তার চেয়ে বরং গান শোন এবং জীবনকে উপভোগ কর। (-মাআরিফুল কুরআন ৭/৪)

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে উক্ত আয়াতের 'লাহওয়াল হাদীস'-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তা হল গান।' আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একই কথা বলেন। তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে যুবাইর থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী রাহ. বলেন, উক্ত আয়াত গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যা বান্দাকে কুরআন থেকে গাফেল করে দেয়। -তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪৪১

কুরআন মজীদের অন্য আয়াতে আছে, "ইবলিস-শয়তান আদম সন্তানকে ধোঁকা দেওয়ার আরজী পেশ করলে আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে বললেন, তোর আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস পদস্খলিত কর।" (-সূরা ইসরা : ৬৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তাই ইবলিসের আওয়াজ। বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন, ইবলিসের আওয়াজ বলতে এখানে গান ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. বলেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেসব বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তার মধ্যে গান-বাদ্যই সেরা। এজন্যই একে ইবলিসের আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৯)

সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী বহু গুনাহর সমষ্টি হল গান ও বাদ্যযন্ত্র। যথা :

ক) নিফাক এর উৎস
খ) ব্যভিচারের প্রেরণা জাগ্রতকারী
গ) মস্তিষ্কের উপর আবরণ
ঘ) কুরআনের প্রতি অনিহা সৃষ্টিকারী
ঙ) আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী
চ) গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও
ছ) জিহাদী চেতনা বিনষ্টকারী। (-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৮৭)

বস্তুত গান বাজনার ক্ষতিকর প্রভাব এত বেশি যে, তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদা কোনো দলীল খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীসের মাধ্যমে তা প্রমাণিত।

হাদীসের ভাষ্য

গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় কর না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখ, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম। (-জামে তিরমিযী হাদীস : ১২৮২; ইবনে মাজাহ হাদীস : ২১৬৮)

বর্তমানে গান ও বাদ্যযন্ত্রের বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে যাতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এর সকল উপার্জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমনীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন। (-সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস : ৪০২০; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস : ৬৭৫৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে। (-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৩; তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২)

উপরোক্ত বাণীর সত্যতা এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। গান-বাজনার ব্যাপক বিস্তারের ফলে মানুষের অন্তরে এই পরিমাণ নিফাক সৃষ্টি হয়েছে যে, সাহাবীদের ইসলামকে এ যুগে অচল মনে করা হচ্ছে এবং গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইত্যাদিকে হালাল মনে করা হচ্ছে। সহীহ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে। (-সহীহ বুখারী হাদীস : ৫৫৯০)

মুসনাদে আহমদের হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ ও জাহেলি প্রথা বিলোপসাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসের আলোয় সাহাবীদের জীবন

দু'একটি ক্ষেত্রে শুধু দফ বাজানোর বিষয়টি ব্যতিক্রম থাকলেও যে কোনো বাদ্যযন্ত্রই হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং সাহাবীদের বাস্তব আমল তা প্রমাণ করে।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত নাফে' রাহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার চলার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছু দূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাফে'! এখনো কি আওয়াজ শুনছ? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথে বাঁশির আওয়াজ শুনে এমনই করেছিলেন। (-মুসনাদে আহমদ হাদীস : ৪৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ৪৯২৪) বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. থেকেও এমন একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (-ইবনে মাজাহ হাদীস : ১৯০১)

একটু ভেবে দেখুন তো, যে আওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম মুহূর্তের জন্যও কানে তুলতে রাজি ছিলেন না সেই ইবলিসী আওয়াজের অনুকূলে কথা বলার দুঃসাহস আমরা দেখাতে পারি কি না?

বাজনাদার নুপুর ও ঘুঙুরের আওয়াজও সাহাবায়ে কেরাম বরদাশত করতেন না। তাহলে গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রশ্নই কি অবান্তর নয়? নাসাঈ ও সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট বাজনাদার নুপুর পরে কোনো বালিকা আসলে আয়েশা রা. বললেন, খবরদার, তা কেটে না ফেলা পর্যন্ত আমার ঘরে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যে ঘরে ঘণ্টি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (-সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ৪২৩১; সুনানে নাসাঈ হাদীস : ৫২৩৭)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘণ্টি, বাজা, ঘুঙুর হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। (-সহীহ মুসলিম হাদীস : ২১১৪)

মৃদু আওয়াজের ঘণ্টি-ঘুঙুরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আধুনিক সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের বিধান কী হবে তা খুব সহজেই বুঝা যায়।

চার ইমামের ভাষ্য

গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-অভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সকলেই গান-বাদ্যকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম মালেক রাহ. কে গান-বাদ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেবল ফাসিকরাই তা করতে পারে।(-কুরতুবী ১৪/৫৫)

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন যে, গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হল আহমক। তিনি আরো বলেন, সর্বপ্রকার বীণা, তন্ত্রী, ঢাকঢোল, তবলা, সারেঙ্গী সবই হারাম এবং এর শ্রোতা ফাসেক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। (-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৭৯; কুরতুবী ১৪/৫৫)

হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা আলী মারদভী লেখেন, বাদ্য ছাড়া গান মাকরূহে তাহরীমী। আর যদি বাদ্য থাকে তবে তা হারাম। (-আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৮৮)

ইমাম শাফেয়ী রাহ. শর্তসাপেক্ষে শুধু ওলীমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। কেননা বিয়ের ঘোষণার উদ্দেশ্যে ওলীমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশের বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। (-জামে তিরমিযী হাদীস : ১০৮৯; সহীহ বুখারী হাদীস : ৫১৪৭, ৫১৬২) মনে রাখতে হবে, এখানে দফ বাজানোর উদ্দেশ্য হল বিবাহের ঘোষণা, অন্য কিছু নয়। (-ফাতহুল বারী ৯/২২৬)

দফ-এর পরিচয়

যারা সরাসরি আরবে দফ দেখেছেন, তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, দফ-এর এক পাশ খোলা। বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ হয়। প্লাস্টিকের গামলা বাজালে যেমন আওয়াজ হবে তেমন। আসলে দফ কোনো বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না।

আওনুল বারী গ্রন্থে দফ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে যে, এর আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। কোনো দফ-এর আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তখন তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে। আর দফ-এর মধ্যে যখন বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এসে যাবে তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয বলে পরিগণিত হবে। (-মিরকাত ৬/২১০) এখন কেউ যদি বলেন, তৎকালীন যুগে দফ ছিল আরবের সর্বোচ্চ বাদ্যযন্ত্র, বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা-ই উন্নত হয়েছে। তাহলে একে অজ্ঞতাপ্রসূত অবাস্তব কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। কেননা একাধিক হাদীসে ঢোল, তবলাসহ অনেক বাদ্যযন্ত্রের নাম এসেছে। বাস্তবে না থাকলে এসব বাদ্যযন্ত্রের নাম আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া মুহাদ্দিসদের ভাষ্য অনুযায়ী দফ বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না, যা ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি। আরবে এখনো দফ বিদ্যমান আছে।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদানী উস্তাদকে ছাত্ররা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দফ তো বাচ্চাদের জন্য, আর বড়দের জন্য হল কুরআন। পরিণত ব্যক্তিদের জন্য কুরআন ছেড়ে এসবের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এরপরও যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তৎকালীন যুগে দফ সর্বোচ্চ বাদ্যযন্ত্র ছিল তবে তাতেই বা লাভ কী? বাদ্যযন্ত্রকে তো আর জায়েয বানানো যাচ্ছে না। হাদীসে রাসূলই তাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামকে আধুনিক বানানোর 'সদুদ্দেশ্যে' আজ কেউ কেউ ফতোয়া দিচ্ছেন যে, মেয়েদের সাথে হাত মেলানো জায়েয, নারী-পুরুষের মাঝে পর্দা বিধানের এত কড়াকড়ির প্রয়োজন নেই, গান-বাদ্য, সিনেমা, টেলিভিশন এসব তো বিনোদনেরই অংশ। ক্লীন শেভে কোনো সমস্যা নেই, দাড়ি ইসলামের কোনো জরুরি বিষয় নয় ইত্যাদি বহুবিধ 'আধুনিক', 'অতি আধুনিক' ফাতাওয়া আজ শুনতে পাওয়া যায়। মনে রাখা উচিত যে, ইসলাম অন্যান্য 'ধর্মে'র মতো নয়; বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত চির আধুনিক আদর্শ, একে নিজেদের পক্ষ থেকে আরো অতি আধুনিক বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামে যেমন বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই, তেমন ছাড়াছাড়িরও সুযোগ নেই। ইসলাম হল মধ্য পন্থা। যে বিধান যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন

আল্লাহ তাআলা তা ততটুকুই দিয়েছেন। এর পূর্ণ অনুসরণই যে সকল কল্যাণের সূত্র সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যযুগই তার বাস্তব প্রমাণ। আমরাও যদি কল্যাণের প্রত্যাশা করি তাহলে আমাদেরকেও ইসলামের সকল বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে এবং আমাদের ঈমান, আমল ও ফতোয়া সবকিছুকে যাচাই করতে হবে তাদেরই মানদণ্ডে।

আমরা কেউ তো এ দাবি করতে পারি না যে, সাহাবীদের চেয়ে ইসলামকে ও রাসূলের হাদীসকে চেপ্টা করে আমরা বেশি বুঝে ফেলেছি।

বাদ্যসহ কাওয়ালি

সুফী সাধকের নাম ব্যবহারকারী একটি জগতেও আজ আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তাই আধুনিক কিছু সুফী বলে থাকে, বাদ্যসহ যিকির ও কাওয়ালি জায়েয। দলীল হিসেবে তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত দুটি বালিকার দফ বাজিয়ে কবিতা গাওয়ার হাদীসটি উপস্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. লেখেন, উক্ত হাদীসে আয়েশা রা.-এর বর্ণনাই তাদের অবাস্তব দাবির বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট জবাব। গান-বাদ্য যে নাজায়েয এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হাদীসের রাবী হযরত আয়েশা রা. বলছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় কোনো গায়িকা ছিল না। তারা কোনো গান গায়নি।
(-ফাতহুল বারী ২/৪৪২)I

ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, গান বলতে যা বুঝায়, বালিকাদ্বয় তা গায়নি। পাছে কেউ ভুল বুঝতে পারে তাই আয়েশা রা. বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী আরো বলেন, বর্তমানে একশ্রেণীর সুফীরা যে ধরনের গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ঘটিয়েছে তা সম্পূর্ণ হারাম।(-তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫৪) বিখ্যাত সাধক হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহ. তার যুগে কাওয়ালি শোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে কাওয়ালি শোনার শর্তগুলো পালন করা হয় না। তাই আমি এর থেকে তওবা করছি। (-আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৯২)

জুনাইদ বাগদাদী রাহ.-এর যুগেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের যুগের অবস্থা কেমন হবে তা ভাববার বিষয়। এক বিদ্যান ব্যক্তি একটি শিক্ষণীয় উক্তি করেছিলেন যে, তোমরা আধুনিক হও ভালো কথা, কিন্তু আধুনিক হতে গিয়ে মনুষ্যত্বের সীমানা অতিক্রম করো না এবং শয়তানের দোসর বনে যেও না।

জীবন : হুশ আসুক আমাদের

একজন মানুষের একটি মৃত্যুর ঘটনা। ঘটনাটি বেদনাদায়ক। বেদনাদায়ক দু'দিক থেকেই। বাহ্যিক পরিণতির দিক থেকেও, ঘটনাকালীন অবস্থার দিক থেকেও। ঘটনাটি ঘটেছে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি এলাকায়। ৫ নভেম্বর সোমবার বিকালের ওই ঘটনায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান ত্রিশ বছর বয়সী এক যুবক। পরদিন একটি জাতীয় দৈনিকের ৪-এর পাতায় খবরটি ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল-'মুঠোফোনে গান শোনার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু।'



ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নিহত ব্যক্তি রেললাইনে বসে ইয়ারফোনে গান শুনছিলেন। পেছন দিক থেকে ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি ট্রেন আসছিল। কয়েকবার হর্নও বাজানো হয়েছিল। কানে ইয়ারফোন থাকায় শুনতে পাননি। এর মধ্যে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান তিনি। জিআরপি থানার উপপরিদর্শক জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করার সময় তার কানে ইয়ারফোন বাঁধা পাওয়া গেছে। তার ব্যবহৃত মুঠোফোন থেকে পরিচয় নিশ্চিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।

ঘটনাটি নিশ্চয়ই একটি দুর্ঘটনা। আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা। এ দুর্ঘটনায় যিনি চলে গেছেন তিনি তো চলেই গেছেন। তার স্বজন-পরিজনরাও দুঃখে-শোকে কাতর হয়েছেন। কিন্তু বাহ্যিক বিবেচনায় এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা যাবে কাকে? ট্রেনের লাইনে বসে ইয়ারফোনে গান শোনা আর হর্ন বাজানো হলেও সে কারণেই শুনতে না পাওয়ার দায়টা কার ওপর বর্তাবে? আহা! মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে গভীর মগ্নতার সঙ্গে গান শুনতে থাকার এ অবস্থাটাই বা কে প্রত্যাশা করতে পারে! এ তো দুর্ঘটনার মধ্যে আরেক 'দুর্ঘটনা'। এ জন্যই ঘটনাটি বেদনাদায়ক অনেক বেশি। একই সঙ্গে এতে রয়েছে শিক্ষাগ্রহণ ও সতর্কতার বহু উপাদান। আল্লাহ তাআলা শেষ সময়ে আমাদের প্রত্যেককে হেফাযত করুন-রহম করুন।

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার আর সব রকম প্রযুক্তির ভুল ব্যবহারের বিষয়ে ঘটনাটি অনেক বড় সতর্কতার বার্তা দেয় আমাদের। তাৎক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে যে মোবাইল ফোন পুরোপুরি কল্যাণকর একটি উপকরণ হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা ছিল, ভেবে দেখা দরকার, উপকরণটির অপকার এখন কত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাধারণ ও স্বল্প মূল্যের একেকটি মোবাইলফোনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হরেক রকম 'বিনোদন সুবিধা'। 'দেখা-শোনার' জগত সেখানে অবারিত। ভালো-মন্দ, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ কোনো বাছবিচার নেই। আর এতেই মজে থাকছে তরুন-তরুনী, যুবক-যুবতীরা। এই মজে থাকার প্রতিযোগিতায় কোনো স্তর ও শ্রেণীর বিভক্তি নেই। ভালোর তুলনায় মন্দের মাদকতাই টানছে বেশি মানুষকে। কঠিন ও দুরূহ পাপের বিষয়গুলোকেও সহজলভ্য ও স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে এতে। এরই বিষফল কখনো কখনো আঁতকে ওঠার মতো বেদনাদায়ক ঘটনারও জন্ম দিচ্ছে।

গত কুরবানীর ঈদের দিনের অভিজ্ঞতা। গ্রামের মেঠোপথে মোটরসাইকেলে যাচ্ছি। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মাঝপথ ধরে ধীরলয়ে এঁকে বেঁকে বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে এক বিশোর্ধ্ব গ্রাম্য যুবক। বার বার হর্ন দিলেও বাইসাইকেল আরোহীর মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটছে না। কাছে গিয়ে দেখা গেল, ওই বেচারার কানে ইয়ারফোন লাগানো। পকেটে তার মোবাইল ফোন। বেচারার কী দোষ! সে তো হর্ন শুনতেই পায়নি। অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথে রাজকীয় চালে গান শুনতে শুনতে চলছে। পেছনে দ্রুতগতির মোটর সাইকেল এসে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিলেও কিছু করার নেই-তার ভাবখানা ছিল এমনই।

মোবাইল ফোনের আরেক সংযুক্তি ইন্টারনেট। দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ও 'তথ্যের আলো' আহরণের শ্লোগান এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নানা আয়োজন করে এটাকে সহজ ও জনপ্রিয় করেও তোলা হচ্ছে। কিন্তু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও বখে যাওয়া তারুণ্য এ সহজ মাধ্যমে কী এমন 'তথ্য' সংগ্রহে সময় ও টাকা খরচ করছে-এ বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার। দেশজুড়েই এখন এই অবস্থা। শহর আর গ্রাম নেই। নতুন উপকরণ, নতুন বিনোদন, নতুন আয়োজন। অদ্ভূৎ মাদকতার মধ্যেই কাটছে সময়। চরিত্রে নেমে আসছে 'আলোহীন' সন্ধ্যা। আর ধুপ করেই জীবনের সূর্য ডুবে যাচ্ছে হঠাৎ। তখন কোনো আক্ষেপ আর হা-হুতাশ কোনো কাজেই আসছে না।

আল্লাহ! আমাদের হুশ দাও।

Call Spoofing কী?

Call Spoofing হচ্ছে এমন এক ধরনের কল প্রযুক্তি, যেখানে প্রতারক তার প্রকৃত ফোন নম্বর গোপন করে ভুয়া বা ছদ্মনাম্বার ব্যবহার করে কল করে। ফলে কল রিসিভার মনে করে,

কলটি এসেছে তার পরিচিত বা নির্ভরযোগ্য কোনো উৎস থেকে। অনেক সময় ব্যাংক, সরকারি সংস্থা, এমনকি পরিচিত নম্বর ব্যবহার করেও প্রতারকরা মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করে।

Call Spoofing কীভাবে কাজ করে?

Call Spoofing সাধারণত VoIP (Voice over Internet Protocol) প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে। প্রতারকেরা নানা ধরনের সফটওয়্যার বা অ্যাপ ব্যবহার করে যে কোনো ফোন নম্বর দিয়ে কল করতে পারে। যেমন:

✪ নম্বর পরিবর্তন করার Spoofing অ্যাপ।

✪ সফটওয়্যার-ভিত্তিক ভুয়া Caller ID জেনারেটর।

✪ কালো বাজারে পাওয়া যায় এমন spoofed কলিং সার্ভিস।

Spoofing কাজের ধাপ:

১। প্রতারক একটি স্পুফিং অ্যাপ বা টুলে যায়।

২। সেখানে তারা একটি ভুয়া নম্বর সেট করে—যেমন ব্যাংকের হেল্পলাইন নম্বর।

৩। এরপর তারা ভিক্টিমকে কল করে এবং তাদের স্ক্রিনে সেই ভুয়া নম্বরই দেখা যায়।

৪। কল রিসিভ করলেই প্রতারণার শুরু—তথ্য চাওয়া, পাসওয়ার্ড নেয়া, অর্থ দাবি ইত্যাদি।

Call Spoofing-এর ঝুঁকি

✪ আর্থিক প্রতারণা: ভুয়া ব্যাংক কলের মাধ্যমে একাউন্ট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া।

✪ তথ্য চুরি: জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসওয়ার্ড, OTP সংগ্রহ।

✪ মানসিক চাপ: ভয়ভীতির মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ।

✪ পরিচয় চুরি: আপনার নাম ব্যবহার করে অন্যকে কল করা।

Call Spoofing থেকে বাঁচার উপায়

১। নম্বর দেখে বিভ্রান্ত হবেন না: অপরিচিত বা সন্দেহজনক নম্বর থেকে কল এলে সতর্ক থাকুন—even যদি তা পরিচিত নম্বর মনে হয়।

২। ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না: OTP, পাসওয়ার্ড, পিন—এই সব কখনোই ফোনে কাউকে বলবেন না।

৩। কল ব্যাক করুন: যদি কোনো ব্যাংক বা অফিসের নাম বলে ফোন আসে, নিজে অফিসিয়াল নম্বরে কল করে যাচাই করুন।

৪। Spam Call Detector ব্যবহার করুন: Truecaller, Hiya, CallApp-এর মতো অ্যাপ ব্যবহার করে সন্দেহজনক নম্বর শনাক্ত করা যায়।

৫। মোবাইল অপারেটরের সহায়তা নিন: spoofed কল রিপোর্ট করে অপারেটর বা পুলিশের সহায়তা চাইতে পারেন।

৬। DND (Do Not Disturb) তালিকায় নাম নথিভুক্ত করুন: এটি টেলিমার্কেটিং কল প্রতিরোধে সহায়ক।

Call Spoofing একটি মারাত্মক সাইবার অপরাধ, যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রযুক্তির সুবিধা যেমন আমাদের জীবনে গতি এনেছে, তেমনি এর অপব্যবহার আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিও হয়ে উঠেছে। সচেতনতা ও সতর্কতা থাকলেই প্রতারকদের ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

সিম কার্ড ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে পাপাচার

বর্তমান সময়ে ভয়ংকর এক অপরাধের নাম সিম কার্ড ক্লোনিং। অপরাধীরা সিম কার্ড ক্লোনের মাধ্যমে একই নম্বরের একাধিক সিম কার্ড তৈরি করে। ফলে ওই নম্বরে কোনো কল বা মেসেজ এলে তা একই সঙ্গে সব সিমেই আসে। অন্যের মোবাইল নম্বরের মতো নম্বর বানিয়ে তার পরিচিতজনদের ফোন করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া বা দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির নম্বর কপি করে ফোন করে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ঘটনা এখন দেশে আর নতুন নয়।

প্রতারণার পাশাপাশি অনেক সময় এই ক্লোন সিম দিয়ে হুমকি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর ঘটনাও ঘটে। এ ছাড়া ক্লোন করা সিম দিয়ে (মোবাইল নম্বর) এসএমএস বা কল-লগ অথেনটিকেশন-নির্ভর যে কারো ফেসবুক আইডি, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি হ্যাক করা সম্ভব। মোবাইল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সব ধরনের অর্থ লেনদেনের অ্যাকাউন্ট দখলে নিয়ে, লেনদেনের সব তথ্যসহ টাকা-পয়সা কবজা করে নেওয়াও সম্ভব। অন্যদিকে মেসেজিং অ্যাপ আইএমও, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সেবা দখলে নিয়ে নিতে পারে প্রতারকরা।

এক কথায় সিম কার্ড ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির আইডেন্টিটি ছিনতাই হয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত এসব তথ্যে হস্তক্ষেপ করা জঘন্য অপরাধ। নিম্নে সিম কার্ড ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে কিছু পাপের ভয়াবহতা তুলে ধরা হলো—

অবৈধভাবে ফোন কল ও মেসেজে প্রবেশ : সিম কার্ড ক্লোন করে অপরাধীরা বৈধ ব্যবহারকারীর ফোন কল এবং এসএমএসের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্য, ব্যক্তিগত মেসেজ, লোকেশন, কল লিস্ট ইত্যাদি চুরি করে। সাধারণত মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করতেই এমন ফাঁদ পাতা হয়।

অথচ ব্যক্তির গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করা নিষেধ। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ব্যক্তির অধিকার। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ঈমানদাররা, তোমরা বেশি অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কিছু কিছু অনুমান তো পাপ এবং তোমরা কারো গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান কোরো না।’ (সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১২)

ব্যাংকিং ফ্রড : অনেক ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য ওটিপি বা টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন প্রয়োজন হয়, যা ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বরে পাঠানো হয়।

সিম ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে অপরাধীরা সেই ওটিপি চুরি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি থেকে অর্থ চুরি করতে পারে। চুরি ইসলামের দৃষ্টিতে এতটাই জঘন্য অপরাধ যে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থায় চুরির শাস্তি হাত কেটে দেওয়া। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

(সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৩৮)

অপরাধমূলক কাজ করা : ক্লোন করা সিম ব্যবহার করে অপরাধীরা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হতে পারে, যেমন—অবৈধ লেনদেন বা সন্ত্রাসবাদে সাহায্য করা, কাউকে হুমকি দেওয়া, যেখানে মূল ব্যবহারকারীকে দোষারোপ করা হয়। এখানে দুই ধরনের অপরাধ পাওয়া যায়, এক. সিমের মূল মালিককে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বড় ধরনের অপরাধের

অভিযোগ মাথায় নিতে হয়, যা একটা নিরপরাধ লোককে বিপদে ফেলার শামিল। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের ক্ষতিসাধন করে অথবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সে অভিশপ্ত।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৪১)

দুই. অপরাধীরা এর মাধ্যমে অন্যকে হুমকি, গালাগাল ইত্যাদি দিয়ে সিমের মালিককে বিপদে ফেলে। অথচ হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপ আর তার সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফরি।' (নাসায়ি, হাদিস : ৪১১২)

প্রতারণা করা : অনেক সময় সিম কার্ড ক্লোন করে সিমের মালিকের পরিচিত মহল থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়। আবার অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়। অর্থ আদায়ের সময় যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয় ক্লোন করা সিমগুলো, যাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত না করতে পারে। প্রতারণা এত বড় অপরাধ যে আল্লাহর রাসুল (সা.) প্রতারকদের তাঁর উম্মত বলে স্বীকৃতি দেবেন না। যেখানে নবীজি (সা.)-এর সুপারিশ ছাড়া নাজাত পাওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয় আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম, হাদিস : ১৮৪)

মোবাইল ফোন : প্রয়োজনীয় মাসায়িল

মোবাইল ফোন বর্তমান সময়ের একটি নতুন আবিষ্কার। এর কিছু ভালো দিক যেমন আছে তেমনি ক্ষতির দিকও রয়েছে। আর দশটা প্রয়োজনীয় জিনিসের মতো এরও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার আপত্তিকর নয়, কিন্তু এখন যেভাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মোবাইলের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর তুলনায় এর যে ব্যাপক আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতির দিক অভিজ্ঞতায় এসে গেছে, বিশেষত এলম চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য এর যে ক্ষতিকর প্রভাব, তার তালিকা মোটেই ছোটো-খাটো নয়। তবে বাস্তবতা এই যে, মোবাইলের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নও আসছে। এজন্য এসব প্রশ্ন একত্র করে শরীয়তের দলীল ও নীতিমালার আলোকে তার জওয়াব প্রস্তুত করা এবং পাঠকবৃন্দের খেদমতে তা পেশ করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে হয়েছে। এ অনুভূতি থেকেই বর্তমান প্রবন্ধটি তৈরি হল। এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে :

১. বেশ কিছু মাসায়িলে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি সংযুক্ত হয়েছে। এগুলো মূলত কুরআন, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর ওইসব নীতিমালার উদ্ধৃতি, যার আলোকে এই সমাধানগুলো পেশ করা হয়েছে। কেননা, উল্লেখিত প্রাচীন উদ্ধৃতিগুলোতে স্পষ্টভাবে মোবাইল ফোনের উল্লেখ যে থাকবে না তা তো বলাই বাহুল্য।

কিছু মাসায়িল এমনও আছে, যেগুলো অনেকের কাছেই স্পষ্ট বলে মনে হবে। তারপরও ওই মাসআলাগুলো এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব বিষয়েও বিভিন্ন সময় প্রশ্ন এসেছে। আর সকল বিষয় সবার সমানভাবে জানা থাকবে-এটাও অপরিহার্য নয়।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর ওই মাসয়িলগুলো বিশেষ কোনো বিন্যাস ছাড়াই পেশ করছি। আলোচনা সহজ করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকটিই বহাল রাখা হয়েছে।

১. ভিডিও ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : 'মোবাইল' ফোনেরই আধুনিক সংস্করণ। কিন্তু এ আবিষ্কার শুধু কথোপকথন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং মোবাইলের সাথে আজকাল ক্যামেরা এবং ভিডিও, ইন্টারনেটসহ সবধরনের সুবিধা রয়েছে। মোবাইলের এ সুবিধাগুলো আজকাল ভাল-খারাপ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় এ সকল সুবিধাযুক্ত মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি না?

উত্তর : ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। তবে অবৈধ কোনো কাজে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৯১, আল-বাহরুররায়েক ৮/২০২, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/৪৪৬, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ ১/৩৫৯

২. সিম হস্তান্তর

প্রশ্ন : সিম ক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করা জরুরি। এখন কোনো ব্যক্তি নিজ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সিম ক্রয় করে কোম্পানীর অনুমোদন এবং পুনঃ রেজিস্ট্রেশন ছাড়া অন্য ব্যক্তির কাছে সিম বিক্রি করা বৈধ কি না?

উত্তর : বৈধ।

৩. চোরাই সেট ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : মোবাইলের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে মোবাইল চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনাও বেড়েছে। অনেকের মোবাইল হারিয়েও যায়। প্রশ্ন হল, এ ধরনের সেট ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম কী?

উত্তর : ছিনতাইকৃত বা চোরাই সেট জেনে শুনে ক্রয় করা জায়েয নেই। কেউ ক্রয় করলেও এ সেট ক্রেতার জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবে না। বরং মালিক জানা থাকলে মূল মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে যার থেকে কিনেছে তাকে দিয়ে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। আর কারো কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া সেট হস্তগত হলে কী করতে হবে তা তো সবারই জানা আছে। এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। -আল-মুহীতুল বুরহানী ৭/৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ৬/৪৫, খানিয়া ৩/৪১৮, ফাতহুল কাদীর ৫/১৬৯

৪. ডাউন লোডিং ব্যবসা

প্রশ্ন : মোবাইলে রিংটোন, মিউজিক, গান, ভিডিও-ছবি ইত্যাদি ডাউন লোড করার প্রবণতা বেড়েছে। এজন্য অনেক সার্ভিসিং সেন্টারে পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকে। জানতে চাই ডাউন লোড করে বিনিময় নেওয়া এবং এ ব্যবসা করা জায়েয কি না?

উত্তর : মিউজিক সংবলিত গান, প্রচলিত অশ্লীল ছবির ভিডিও ফিল্ম, অবৈধ চিত্র ইত্যাদির ডাউনলোড ব্যবসা নাজায়েয। কারণ এতে নিজের তো গুনাহ হয়ই, উপরন্তু অন্যের নিকট গুনাহের উপকরণ সরবরাহ করা হয়। তাই এ ধরনের ডাউনলোড থেকে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। হাঁ, কোনো বৈধ চিত্র, মিউজিক ছাড়া রিংটোন, বাদ্যহীন গজল ইত্যাদি ডাউনলোড করা জায়েয এবং এ থেকে অর্জিত টাকাও হালাল।

-সহীহ বুখারী ১/২৯৮, জামে তিরমিযী ১/২৪১, সহীহ মুসলিম ২১৯, শরহে নববী ২/২৯, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫, আল-বাহরুররায়েক ৮/১৯

৫. স্ক্র্যাচকার্ডের নির্ধারিত মূল্য থেকে কম/বেশীতে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : স্ক্র্যাচকার্ডের গায়ের মূল্যের এর চেয়ে কম-বেশীতে বেচা-কেনা করা জায়েয আছে কি না? যেমন ১০০ টাকার কার্ড অনেক দোকানে কোনো কোনো সময় দুই তিন টাকা বেশী নেয়। আবার কোন কোন মোবাইল কার্ডে ৪/৫ টাকা কমও রাখে। এখন ১০০ টাকার পরিবর্তে কম-বেশী করে লেনদেন করা কি জায়েয, এটি কি সুদ নয়?

উত্তর : স্ক্র্যাচকার্ডের গায়ের মূল্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ টেলিযোগাযোগ সুবিধা তথা আউটগোয়িং সেবা প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য সেবার মত এটিও বিক্রিয়যোগ্য সেবা। সুতরাং কার্ডের গায়ের দাম যেহেতু টাকা নয় তাই কম-বেশীতে বিক্রি করা সুদ নয়। ১০০ টাকার কার্ড কম-বেশীতে ক্রয়-বিক্রয়কে সুদ মনে করা ভুল। তবে এখানে আরেকটি বিষয় আছে, তা হল, কোম্পানী থেকে পণ্যের বা সেবার মূল্য নির্ধারিত করে দিলে ঐ নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করা নিয়ম। কমবেশি করা ঠিক নয়। কেননা এতে বাজারের স্বাভাবিকতা বাঁধাগ্রস্ত হয়।

-ফাতহুল কাদীর ৬/১৫৯; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৪০০

৬. ফ্লেক্সিলোড ব্যবসা ও গ্রাহক থেকে ফ্লেক্সিকৃত অর্থের বেশী গ্রহণ করা

প্রশ্ন : ঋষবীর খড়ধফ (ফ্লেক্সিলোড) করতে অধিকাংশ দোকানে অতিরিক্ত টাকা নেয় না। যত টাকার ফ্লেক্সি করা হয় তত টাকা নেয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহক থেকে ২/৪ টাকা বেশি রাখে। এটা জায়েয কি না? এখানেও অতিরিক্ত নেওয়াকে কেউ কেউ সুদ মনে করে। এছাড়া দোকানীকে কোম্পানি ফ্লেক্সির উপর ১০% কমিশন দিয়ে থাকে। যেমন- ৯০০০ টাকা ফ্লেক্সি বাবদ জমা দিলে তার নামে ১০,০০০/- টাকার ফ্লেক্সি সুবিধা দেওয়া হয়। এটাকেও কেউ কেউ ৯০০০/-এর পরিবর্তে ১০,০০০/- টাকার লেনদেন মনে করে। বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : ফ্লেক্সিলোডে যত টাকার ফ্লেক্সি করা হচ্ছে এর চেয়ে কম-বেশীতে লেনদেন করার হুকুম কার্ডের মতই। এতেও সুদ নেই। নির্ধারিত অংকের ফ্লেক্সি অর্থাৎ ঐ পরিমাণ টেলি যোগাযোগ আউটগোয়িং সেবা, যা বিক্রয়যোগ্য। তাই এটা নির্ধারিত মূল্যের বেশীতে লেনদেন করা সুদ নয়। কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে লোডকারী তথা দোকানীকে যেহেতু কমিশন দেওয়া হয় এবং গ্রাহক থেকে এবাবদ অতিরিক্ত কোনো টাকা নেওয়া কোম্পানি কর্তৃক নিষিদ্ধ তাই নির্ধারিত মূল্যের বেশী নেওয়া ঠিত হবে না। একইভাবে ফ্লেক্সিকারী দোকানীকে দেওয়া কমিশন তার জন্য বৈধ। এখানেও সুদের কিছুই নেই। বরং এ কারবারের ব্যাখ্যা হল, ১০ হাজার টাকার সেবা কোম্পানি তার ডিলারদের নিকট নয় হাজার টাকায় বিক্রি করছে। -প্রাগুক্ত

দোকানগুলোর ফোন ব্যবসা

৭. কল-মিনিটের হিসাব কীভাবে হবে

প্রশ্ন : সিটিসেল মোবাইলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা যে, সিটিসেলের মিনিট গণনা শুরু হয় ডায়ালের পর থেকেই। এখন ৭-৮ টা রিং হওয়ার পর অপর প্রান্ত থেকে রিসিভ করলে রিসিভ করার আগেই প্রায় এক মিনিট চলে যায়। অনেক ব্যবসায়ীকেই দোকানে সিটিসেল ফোন রাখতে দেখা যায়। তারা এই এক মিনিটের বাড়তি সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ এই অগ্রীম ১ মিনিটেরও বিল রাখে। জানতে চাই, রিসিভের আগের সময়ের বিল নেওয়া জায়েয কি না? এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : গ্রাহক থেকে কল রিসিভ হওয়ার আগের সময়ের বিল নেওয়া জায়েয হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে চুক্তি হল, রিসিভের পর থেকে যত মিনিটের কথা হবে তার বিল নিবে। সুতরাং রিসিভের আগের মিনিটের বিল নেওয়া জায়েয হবে না। এজন্য সিটিসেল মোবাইল দিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা করতে চাইলে হয়ত পৃথক মিনিটমাইন্ডার রাখতে হবে যা দ্বারা রিসিভ করার সময় থেকে মিনিটের হিসাব করা হবে। এছাড়া কল ডিউরিশন অপশন থেকেও শেষ কলের সময় জেনে নেওয়া যেতে পারে। আর এখন সিটিসেল অপারেটরের পক্ষ থেকেই কল শেষে কলের মোট সময় সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। তাই সে অনুপাতেও বিল নেওয়া সহজ।

৮. পরবর্তী মিনিটের ১-২ সেকেন্ড হলেও পুরো মিনিটের বিল নেওয়া

প্রশ্ন : সাধারণত ফোন দোকানীরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মিনিট শুরু হলেই এমনকি সেকেন্ড পরিমাণ কথা হলেও পরবর্তী পুরো মিনিটের বিল করে। মোবাইল কোম্পানী থেকে পাল্স সুবিধা থাকলেও তার হিসাব করে না। এটা জায়েয কিনা? এক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর : ফোন ব্যবসায়ীর জন্য কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত পাল্স সুবিধা গ্রাহকদের দেওয়া জরুরি নয়। বরং পালস হিসাব না করতে চাইলে গ্রাহককে পূর্ব থেকেই অবহিত করবে যে, এখানে পরবর্তী মিনিটের এক সেকেন্ড হলেও পুরো মিনিটের বিল নেওয়া হয়। প্রয়োজনে গ্রাহকের দৃষ্টি পড়ে এভাবে দোকানের কোথাও লিখে রাখা যেতে পারে। তবে এব্যাপারে পরামর্শ হল, পরবর্তী মিনিটের ২/৩ সেকেন্ড হয়ে কথা শেষ হয়ে গেলে পুরো মিনিটের বিল না নিয়ে আধা মিনিটের বিল নেওয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাবের ওপর আমল উভয় পক্ষের জন্য ভাল।

৯. ভুল নাম্বারে গেলে এর বিল কার জিম্মায়

প্রশ্ন : ফোন দোকানে ভুল নাম্বারে গেলেও গ্রাহক থেকে বিল আদায় করা হয়ে থাকে। আগে টিএন্ডটির এ্যানালগ লাইনে সঠিক নাম্বারে রিং করলেও ভুল নাম্বারে চলে যেত। এজন্য ফোন দোকানগুলোতে এ নিয়ম চলে আসছে যে, ভুল নাম্বারে গেলেও বিল দিতে হবে। সেই

এ্যানালগ নাম্বার এখন আর নেই। মোবাইল করার পর ভুল নাম্বারে ডায়াল হলে এর বিল কে দিবে? এ বিল কি গ্রাহক দিতে বাধ্য?

উত্তর : মোবাইলে যে নাম্বারে রিং করা হবে সে নাম্বারেই যাবে। সঠিক নাম্বারে রিং করার পরও ভুল নাম্বারে যাওয়ার অবকাশ নেই। তাই ভুল নাম্বারে চলে গেলে বুঝতে হবে নিশ্চয় ভুল নাম্বারে ডায়াল করা হয়েছে। এখন দেখতে হবে এ ভুল কার। দোকানী ভুলে একটির পরিবর্তে অন্যটি টিপেছে, নাকি গ্রাহক নাম্বার দিতে ভুল করেছে? গ্রাহকের ভুল হলেই কেবল এর ক্ষতিপূরণ তার ওপর আসবে। আর দোকানীর ভুল হলে সেই ভুলের ক্ষতি তারই। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক থেকে কিছুই নেওয়া যাবে না।

১০. কল রিসিভের জন্য বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : গ্রামেগঞ্জে অনেকের হাতে মোবাইল থাকে না। অনেকের হাতে থাকলেও টিএন্ডটি ইনকামিং নেই। তাই বিদেশ থেকে কিংবা অন্য কোথাও থেকে দোকানীর মোবাইলে কল আসলে তার কিছু খরচ না হলেও সে গ্রাহক থেকে কিছু টাকা নিয়ে থাকে। এটাকা নেওয়া কি জায়েয?

উত্তর : হাঁ, এ বাবদ বিনিময় নেওয়া জায়েয। বিল না কাটলেও তার সেট ও লাইন ব্যবহার হচ্ছে। সময় ব্যয় হচ্ছে। তাই সে এর ন্যায্য বিনিময় নিতেই পারে। দোকানী এ সেবা ফ্রি দিতে বাধ্য নয়।

১১. ভিওআইপি সংযোগ নিয়ে বিদেশে কম খরচে কথা বলা

প্রশ্ন : এক ধরনের মেশিন দেশীয় টিএন্ডটি এবং মোবাইলের সাথে সংযোগ করলে সরাসরি বিদেশে অনেক কম খরচে কথা বলা যায়। কিন্তু এটি সরকার অনুমোদিত নয়। কেউ কেউ অবৈধভাবে এর ব্যবহার করে থাকে। এ ব্যবসা জায়েয কি না? এ ধরনের সুবিধাযুক্ত ফোনের গ্রাহকদের ফোন বা মোবাইল ব্যবহার করার কী হুকুম?

উত্তর : এ ধরনের লাইনে কথা বলা বৈধ হবে না। কারণ, এতে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ লাইন ব্যবহার করা হয়। সরকারের আদায়যোগ্য ফি অনাদায় থাকে এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ব্যবসায় সহায়তাও করা হয়। এছাড়া এতে অনেকগুলো টিএন্ডটি চোরা লাইনও থাকে। এমনটি হলে তো এর অবৈধতা আরো প্রকট।

ভিওআইপি ব্যবসায়ীরা এতে কোনো চোরা লাইন ব্যবহার করে থাকলে এ বাবদ উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। তবে চোরা লাইন ব্যবহার না করলে সরকারী নিয়ম ভঙ্গ করে এ কারবার করার জন্য গুনাহ হবে। কিন্তু এ কারণে কারবার থেকে উপার্জিত অর্থ অবৈধ গণ্য হবে না।

১২. মিউজিক, গানের কলির রিং টোন

প্রশ্ন : মোবাইলের রিং টোন হিসাবে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক বা গানের কলি ইত্যাদি ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর : মিউজিক, বাদ্য ইত্যাদি গানের সাথে শোনা তো কবীরা গুনাহ। গান ছাড়া পৃথকভাবে শোনাও গুনাহ। তাই যেকোনো ধরনের বাদ্য, মিউজিক টোন রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করাও গুনাহ। তদ্রূপ গানের কলি বা অংশবিশেষও রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করা নাজায়েয। প্রকাশ থাকে যে, মিউজিক বা গান রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করলে নিজে শোনার গুনাহ তো আছেই, সাথে সাথে যে স্থানে মোবাইলটি ব্যবহার হচ্ছে তার আশপাশের লোকদেরকে বাদ্য, গান শোনানোর গুনাহও হয়। এছাড়া এমন রিংটোন মসজিদে বেজে উঠলে মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাই রিংটোন হিসাবে এর ব্যবহার নিতান্তই মন্দকাজ ও গুনাহ। সেজন্যই গান বা মিউজিক ছাড়া অন্যান্য শব্দ রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

-সূরা লোকমান-৬, সহীহ বুখারী ২/৮৩৭, জামে তিরমিযী ১/২৪১; সুনানে ইবনে মাজা ৩০০; আলগিনা ফিল-ইসলাম ৮৭; ফাতহুল কাদীর ৬/৪৮২

১৩. ওয়েলকাম টিউন হিসাবে গানের ব্যবহার

প্রশ্ন : কারো কাছে ডায়াল করার পর তার মোবাইল বা ফোনে রিং হচ্ছে কিনা এটি বুঝানোর জন্য যে টোন বা শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়েলকাম টিউন বলে। এখন এই টোনের পরিবর্তে গান ডাউন লোড করা যায়। কেউ ডাউন লোড করলে তাকে যে ব্যক্তি কল করবে সে রিং টোনের পরিবর্তে ঐ গান বা ডাউন লোডকৃত আওয়াজ শুনতে পাবে। এতে ডাউন লোডকারীর প্রত্যেক মাসে ২০/৩০ টাকা করে খরচ হয়। এটি জায়েয কি না?

উত্তর : ওয়েলকাম টিউনে গান বা মিউজিক ডাউন লোড করলে এই নাম্বারের সাথে যোগাযোগকারী সকলকে বাধ্য হয়ে গান বা মিউজিক শুনতে হবে। এতে অন্যকে গান শোনানো তথা গুনাহের কাজে বাধ্য করার গুনাহ হয়। তাই এটিও নাজায়েয। -সূরা লোকমান ৬, সহীহ বুখারী ২/৮৩৭, ফাতহুল কাদীর ৬/৪৮২, প্রাগুক্ত

১৪. ওয়েলকাম টিউন হিসাবে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের ব্যবহার

প্রশ্ন : গানের ব্যবহার যেহেতু নাজায়েয তাই অনেকেই এক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, আযান ইত্যাদি ডাউনলোড করে থাকে। ধারণা করা হয় যে, এতে গুনাহ তো হবেই না, বরং আমার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি কিছু সময় হলেও কুরআনের তিলাওয়াত শুনছে। বাহ্যত এটাকে ভাল মনে করা হয়। আযানের শব্দ বা জিকর শুনছে। এতে শ্রোতাকে সওয়াবের বিষয় শোনানো হচ্ছে। এদৃষ্টিতে একে অনেকেই ভাল বলে। জানতে চাই ওয়েলকাম টিউন হিসাবে কুরআন, জিকির, আযানের ব্যবহারের হুকুম কী?

উত্তর : নিঃসন্দেহে প্রশ্নোক্ত উদ্দেশ্যেটি ভালো। রিংটোন, মিউজিক বা গান না শুনিয়ে সেস্থানে কুরআনের তিলাওয়াত বা জিকর, আযান ইত্যাদি শোনানোর ব্যবস্থা করা অবশ্যই একটি

প্রশংসণীয় কাজ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এটি ভাল মনে হলেও এক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহারে একাধিক খারাপ দিক রয়েছে। যার একটিই এ থেকে বিরত থাকার জন্য যথেষ্ট। যেমন-

(১) ওয়েলকাম টিউন-এর ব্যবহার হয় যার কাছে কল করা হয়েছে তার সাথে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না এটি বুঝার জন্যই। কারো কাছে কল করার পর রিংটোন পেলে বুঝা যায় যে, তার মোবাইলে রিং হচ্ছে। কল করার পর বিজিটোন আসলে বুঝা যায় সে এখনও অন্যের সাথে কথা বলছে। আবার ফোন বন্ধ থাকলেও এক ধরনের টোন পাওয়া যায়। মোটকথা কাঙ্ক্ষিত ফোনটিতে সংযোগ লাগার জন্য যে সংকেত-টোন রয়েছে সেস্থানে কুরআনের তিলাওয়াত, আযান ইত্যাদি ফিট করলে এই তিলাওয়াত ও আযানও ফোনকারীকে প্রথমে ঐ টোনের কাজ দিবে। অর্থাৎ ফোনকারী বুঝবে যে, কাঙ্ক্ষিত ফোনটিতে সংযোগ পেয়েছে, রিং হচ্ছে। আচ্ছা, বলুন তো আল্লাহর মহান কালাম কি এই কাজে ব্যবহার করা উচিত? এই কাজে তিলাওয়াতের ব্যবহার কি অপাত্রে কুরআনের ব্যবহার নয়? আযান যা শরীয়তের একটি মহান নিদর্শন ও জিকর, একে এই কাজে ব্যবহার করা কি সমীচীন?

(২) কাঙ্ক্ষিত নাম্বারে কল করার পর রিংটোন হিসাবে ফোনকারীর কানে কুরআনের তিলাওয়াত ভেসে আসছে, হয়ত রিসিভের অপেক্ষার সাথে সাথে তিলাওয়াতও শুনছে। কিন্তু যার নাম্বারে ফোন করা হয়েছে সে তো তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছে না। বিধায় সে এমন সময় রিসিভ করল যখন তিলাওয়াতের কোন শব্দের মাঝে কিংবা এমন স্থানে রিসিভ করা হল যখন থেমে গেলে আয়াতের অর্থই বদলে যায়। তদ্রূপ আযান ডাউনলোড করলে কেউ যদি 'লা-ইলাহা' পর্যন্ত উচ্চারিত হওয়ার পর ফোন রিসিভ করে ফেলে তাহলে অর্থ দাঁড়ায়- 'কোন মাবুদ নেই।' ফলে অর্থের বিকৃতি ঘটে। এই সমস্যার কারণেও এস্থানে এগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

(৩) এছাড়া বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে থেকে ফোনে কথা বলার সময় কানে তিলাওয়াতের ধ্বনি আসলেও তা মনোযোগ সহকারে শোনা হয় না। ফলে তিলাওয়াত শোনার হক আদায় হয় না। তাই ওয়েলকাম টিউন হিসাবে কুরআন-তিলাওয়াত বা আযান কিংবা যিকরের ব্যবহার করা যাবে না। এর জন্য স্বাভাবিক রিংটোনই উপযোগী।

-আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন- নববী ৪৬, হককুত্তিলাওয়া-হুসাইনী শাইখ উসমান-৪০১, আলমগীরী ৫/৩১৫, রদ্দুল মুহতার ১/৫১৮, আল মুগনী ৪/৪৮২, আলাতে জাদীদাহ কী শরয়ী আহকাম- ১৭১

১৫. রিংটোন হিসাবে 'সালাম'-এর ব্যবহার

প্রশ্ন : অনেকে সালাম ডাউনলোড করে তা রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করে এটি জায়েয কিনা?

উত্তর : হাঁ, এ ক্ষেত্রে সালামের ব্যবহার জায়েয। কারণ, শরীয়তে সালাম এর ব্যবহার দু'ভাবে এসেছে। একটি হল অভিবাদন হিসাবে সালামের ব্যবহার। দ্বিতীয়টি হল অনুমতি প্রার্থনামূলক

সালাম। অর্থাৎ কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম দেওয়া। মোবাইলের রিংটোন হিসেবে সালামের ব্যবহার এ প্রকারের সাথে কিছু মিল রয়েছে। রিংটোনের জন্য সালামের ব্যবহার না জায়েয নয়।

১৬. আযান, জিকর বা তিলাওয়াত রিংটোন হিসাবে ব্যবহার

প্রশ্ন : অনেকে রিংটোন হিসাবে ঘণ্টা, বাজনা ইত্যাদির পরিবর্তে আযান, যিকর ও তিলাওয়াতের ব্যবহারকে পছন্দ করে। জানতে চাই এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো খারাপী আছে কি না?

উত্তর : তিলাওয়াত, যিকর ও তাসবীহ সবকিছুই অতীব মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। আযান আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও তাসবীহ সম্বলিত কিছু বাক্যের সমষ্টি যা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক তথা 'শিআর'। এগুলোর ব্যবহার একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করার উদ্দেশ্যে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। শরীয়তে এগুলোর ব্যবহার-ক্ষেত্র সুনির্ধারিত। মোবাইলের রিংটোন হিসাবে এগুলোর প্রয়োগ অপব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মোবাইলে রিং এসেছে, কেউ কথা বলতে চায় এই খবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম ওহী, জিকর ও তাসবীহের ব্যবহার যে এগুলোর অপাত্রে ব্যবহার তা বলাই বাহুল্য।

ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বিক্রেতার জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ বলা, তদ্রূপ প্রহরী জাগ্রত আছে একথা বুঝানোর জন্য জোরে জোরে যিকর করাকেই ফিকহবিদগণ অপব্যবহার হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে মোবাইলে কল এসেছে এ খবর দেওয়ার জন্য এগুলোর ব্যবহার যে কেমন হবে তা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। উপরন্তু রিংটোন হিসাবে এগুলোর ব্যবহারে আরো অন্যান্য শরয়ী খারাবী রয়েছে যেমন :

(ক) রিং আসলে কুরআনের তিলাওয়াত বেজে উঠছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যস্ততার দরুণ তিলাওয়াতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করারই সুযোগ হয় না। তদ্রূপ কে রিং করেছে তা দেখা ও কল রিসিভ করার ব্যস্ততা তো লেগেই থাকে এ কারণেও তিলাওয়াতের আদব রক্ষা করে শ্রবণ করা হয় না।

(খ) রিং আসলে যেহেতু রিসিভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এটিই মূল উদ্দেশ্য থাকে তাই আয়াতের যেকোনো স্থানেই তিলাওয়াত চলতে থাক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রিসিভ করে ফেলে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারিত অংশের বিবেচনায় আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যায়।

(গ) মোবাইল নিয়ে টয়লেট কিংবা বাথরুমে প্রবেশের পর রিং আসলে অপবিত্র স্থানে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম, যিকর ও আযান বেজে উঠবে। এতে এগুলোর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। মোটকথা অনেক কারণেই তিলাওয়াত, আযান ও জিকরকে রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

-আততিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন-ইমাম নববী ৪৬, হক্কুততিলাওয়া- হুসাইনী শাইখ উসমান ৪০১, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩১৫, আলমুগনী ৪/৪৮২, রদ্দুল মুহতার ১/৫১৮, ১/৫৪৬, আলাতে জাদীদা, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., আলকাফী ১/৩৭৬, আলআশবাহ ৩৫

রেকর্ড/ডাউনলোভ

১৭. মোবাইল মেমোরিতে কুরআন তিলাওয়াত ডাউনলোড করা

প্রশ্ন : মোবাইল মেমোরী বা মেমোরী কার্ডে কুরআন তিলাওয়াত বা কোন যিকর ডাউনলোড করে রাখা জায়েয কিনা?

উত্তর : মেমোরি কার্ড বা মোবাইল মেমোরিতে তিলাওয়াত ডাউনলোড বা রেকর্ড করা জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। এর হুকুম অন্যান্য রেকর্ডারের মতই। তবে যখন তিলাওয়াত চালানো হবে তখন খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে। অন্য কাজে ব্যস্ত থেকে তিলাওয়াতের রেকর্ড ছেড়ে দেওয়া তিলাওয়াতের আদব পরিপন্থী কাজ।

১৮. কুরআন শরীফের সূরা বা পুরো কুরআন মোবাইলে ডাউনলোড করা

প্রশ্ন : লিখিত কুরআন শরীফ বা তার অংশবিশেষ ডাউনলোড করে মেমোরিতে সংরক্ষণ করা যায়। আজকাল ইন্টারনেট থেকে অল্প খরচে 'পকেট কুরআন' নামে পুরো কুরআন শরীফ মোবাইলে ডাউন লোড করা যায়। তদ্রূপ হাদীস শরীফও ডাউন লোড করা যায়। লিখিত কুরআন ডাইনলোড করা এবং মেমোরিতে সংরক্ষণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : হাঁ, লিখিত পূর্ণ কুরআন বা তার অংশ বিশেষ ডাউনলোড করে মেমোরিতে রেখে দেওয়া জায়েয। তবে কখনো তা স্ক্রিনে আনলে এর অসম্মানী না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। মেমোরিতে হেফাযত করা অবস্থায় মোবাইল ধরতে অযুর প্রয়োজন নেই। তেমনিভাবে স্ক্রিনে থাকা অবস্থায়ও মোবাইল বিনা অযুতে ধরা যাবে।

১৯. মোবাইলের স্ক্রিনে ছবি সেভ করে রাখা

প্রশ্ন : মোবাইলের স্ক্রিনে পুরুষ বা মহিলার ছবি সেভ করে রাখার হুকুম কী?

উত্তর : স্ক্রিনে ছবি সেভ করে রাখলে ছবির প্রদর্শনী হয় এবং ছবি খুলে রাখা হয়। যা রহমতের ফিরিশতার আগমন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এছাড়া শরীয়তে ছবির প্রকাশ ও প্রদর্শন নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, স্ক্রিনে মানুষ বা কোন প্রাণীর ছবি সেভ করে রাখা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

আর স্ক্রিনের ছবিটি যদি কোনো মহিলার হয় তবে গায়রে মাহরামদের জন্য ছবিটি দেখা এবং অন্যদের দেখানোর ভিন্ন গুনাহ হবে। এতে ছবি প্রদর্শনের গুনাহ ছাড়া পর্দা লংঘনের গুনাহ হয়। তাই এ থেকে বিরত থাকা আরো বেশী জরুরি।

-সহীহ বুখারী ২/৮৮০; সহীহ মুসলিম ২/২০০; আলমাদখাল ইবনুল হাজ ১/২৭৩; বাদায়েউস সানায়ে ১/৩০৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯; আলবাহরুর রায়েক ৬/১৭২

২০. স্ক্রিনে কুরআনে কারীমের আয়াত, যিকর, বা এগুলোর ক্যালিগ্রাফী সেভ করে রাখা

প্রশ্ন : মোবাইল স্ক্রিনে কুরআনের আয়াত, জিকর বা আল্লাহ তাআলার নাম সেভ করে রাখা হয়। তদ্রূপ কেউ এগুলোর ক্যালিগ্রাফি সেভ করে রাখে। এটি জায়েয কি না?

উত্তর : মোবাইল স্ক্রিনে আল্লাহ তাআলার নামের ক্যালিগ্রাফি বা লিখিত আয়াত কিংবা অন্য কোন যিকর ইত্যাদি সেভ করে রাখা ঠিক নয়। কারণ, এভাবে ক্ষেত্রবিশেষে এগুলোর সাথে বেয়াদবি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এছাড়া মোবাইল সাধারণত সম্মানের সাথে ব্যবহার করা হয় না। বরং অধিক ব্যবহারের ফলে যত্রতত্র রাখা হয়। অনেক সময় বসার স্থানে, নিচেও থাকে, চার্জের প্রয়োজনেও নিচে রাখতে হয় ইত্যাদি। সুতরাং স্ক্রিনে দৃশ্যমান অবস্থায় রেখে এর যথাযথ আদব রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এ ধরনের কোন কিছু স্ক্রীন সেভারে রাখা ঠিক হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫০

মোবাইলের ব্যবহার

২১. পিকচার ম্যাসেজ

প্রশ্ন : পিকচার ম্যাসেজের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিভিন্ন চিত্র, ফুল ইত্যাদি কাঙ্ক্ষিত নাম্বারে পাঠানো যায়। তদ্রূপ মোবাইলে ধারণকৃত মানুষ বা প্রাণীয় ছবিও পাঠানো যায়। ছবির এই ব্যবহার জায়েয কি না?

উত্তর : এসএমএস মাধ্যমে প্রাণীর ছবি ছাড়া অন্য কিছু পাঠাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষ বা কোন প্রাণীর ছবি পাঠানো জায়েয হবে না। কেননা এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়া ছবির ব্যবহার হচ্ছে। আর ছবিটি যদি কোন গায়রে মাহরাম মহিলার হয় তবে তো পর্দার হুকুম লংঘন করার গুনাহ হবে। এ ধরনের ছবি যার কাছে পাঠানো হচ্ছে সেও দেখে, আশপাশের অন্য পুরুষরাও দেখে। এতে ব্যাপকভাবে পর্দা লংঘনের গুনাহ হয়। তাই এ থেকে বিরত থাকা জরুরি। তবে জরুরতের সময় জায়েয। যেমন শরীয়তসম্মত বিশেষ প্রয়োজনে কারো ফটোর জরুরত হলে মোবাইলের মাধ্যমে অন্যত্র ছবি পাঠানো যাবে। প্রাপক মোবাইলের এই ছবি প্রিন্ট করে নিজ কাজে লাগাতে পারবে। তবে এক্ষেত্রেও এর ব্যবহার জরুরত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। -সহীহ মুসলিম ২/২০০; আলমাদখাল ১/২৭৩

২২. মিসডকল

প্রশ্ন : মোবাইল ব্যবহারকারীর অনেকেই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মিসডকল দেয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে যাকে মিসডকল দেওয়া হচ্ছে সে বিরক্ত হয়। এছাড়া এতে অনর্থক নেটওয়ার্ক ব্যস্ত রাখা হয়। গ্রামীণ ফোন কোম্পানি মিসডকলকে নিরুৎসাহিত করার জন্য একবার

মিসডকলকে বিনষ্টকারী পোকার সাথে তুলনা করে একটি বিজ্ঞাপনচিত্র দিয়েছিল। মোটকথা প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে মিসডকল দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে মিসডকল দিলে অনর্থক নেটওয়ার্ক ব্যস্ত রাখা হয়। ফলে প্রয়োজনীয় কথার জন্য অনেকের সংযোগ পেতে কষ্ট হয়। বিনা প্রয়োজনে মিসডকল দিয়ে নেটওয়ার্ক ব্যস্ত রাখার কোন বৈধতা নেই। এতে মোবাইল কোম্পানীরও কোন উপকার নেই বরং এতে তাদের ক্ষতি হয়। এছাড়া বিনা প্রয়োজনে এ মিসডকল দেওয়ার দ্বারা যাকে মিসডকল দেওয়া হচ্ছে তাকে বিরক্ত করা হয়। তার একাগ্রতা বা কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এসবই মিসডকলের ক্ষতি। এসব কারণে বিনা প্রয়োজনে মিসডকল দেওয়া গুনাহ।

তবে প্রয়োজনে মিসডকলের ব্যবহার বৈধ। যেমন কারো সাথে পূর্বেই কথা থাকল যে, তুমি প্রস্তুত হলে কিংবা অমুক স্থানে পৌঁছলে কিংবা অমুক জিনিস পেলে অথবা অমুক ব্যক্তি আসলে আমাকে মিসডকল দিবে। এসব ক্ষেত্রে মিসডকল দেয়ার দ্বারা কিছুটা উপকার পাওয়া যায়। তদ্রূপ আত্মীয়-স্বজন কিংবা কম আয়ের লোকদের সহযোগিতা কামনার্থে অনেকেই বলে থাকে, তুমি আমাকে শুধু মিসডকল দিলেই আমি ব্যাক করব। তোমার কল করার প্রয়োজন নেই।' তুমি কল করে টাকা খরচ কর না ইত্যাদি। এসবই মিসডকলের বৈধ ক্ষেত্র। এককথায় যে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মিসডকল করা হয় আর এর কারণে যাকে মিসডকল করা হচ্ছে তার অসন্তুষ্টি বা কষ্টের কারণ না হয় সেক্ষেত্রে এতে কোন অসুবিধা নেই।

২৩. মোবাইলে কে আগে সালাম দিবে

প্রশ্ন : মোবাইলে কোন পক্ষ আগে সালাম দিবে এ নিয়ে দুধরনের মতামত শোনা যায়। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি রিং করবে সে আগে সালাম দিবে। আবার কেউ বলেন, যে রিসিভ করবে সে সালাম দিবে। জানতে চাই শরীয়তের দলীলের আলোকে কোনটি সঠিক? মহিলার সাথে কথা বললে সালাম দেওয়া যাবে কি না? কোন বড় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় যে ছোট সেই কি শুধু সালাম বলবে?

উত্তর : 'আস্সালামু কাব্লাল কালাম'এর ভিত্তিতে যে ব্যক্তি আগে কথা বলবে সেই সালাম দিবে। সাধারণত যে রিসিভ করে সেই যেহেতু আগে কথা বলে থাকে তাই সে কথা শুরু করার আগে সালাম দিবে। কারণ রিসিভ করার পর কথা না বললে অনেক সময় রিসিভ হয়েছে কি না তা বুঝা যায় না। তাই রিসিভকারী সাধারণত আগে কথা বলে থাকে।

অবশ্য কখনো রিসিভকারী যদি রিসিভ করে কথা না বলে বা কোন কারণে কলকারী কথা শুনতে না পায় অথবা বুঝতে না পারে তখন কলকারী আগে কথা বলে থাকে। এক্ষেত্রে যেহেতু কলকারী আগে কথা বলছে তাই কথা শুরুর আগে সে সালাম দিবে, এমনকি হ্যালো বলার আগে সালাম বলবে।

২৪. গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে মোবাইলে সালাম আদান-প্রদান

গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে প্রয়োজনে পর্দায় থেকে কথা বলা জায়েয। (যদি ফেতনার আশংকা না থাকে।) তাই মোবাইলে মহিলার সাথে কথা বলতে হলেও সালাম দিয়েই কথা শুরু করবে।

যে আগে কথা বলবে সে সালাম দিবে। মহিলা আগে কথা বললে সে আগে সালাম দিবে। আর পুরুষ আগে কথা বললে সে সালাম দিবে।

যার নাম্বারে কল করা হচ্ছে তিনি যদি বড় ও সম্মানী ব্যক্তি হন তখন তিনি সালাম দিলে এ সালামের উত্তর দেওয়া হয় না। বরং কলকারী উল্টো তাকে সালাম দেয়। এটা ভুল নিয়ম। তাই বড় ও সম্মানী ব্যক্তি রিসিভ করে সালাম দিলে অপর প্রান্ত থেকে এর শুধু উত্তরই দিবে। পাল্টা সালাম দিবে না। -সুনানে তিরমিযী ২-৯৯

আগে হ্যালো না আগে সালাম

২৫. প্রশ্ন : ফোনে অনেকে আগে হ্যালো বলে এরপর সালাম বলে। এটি কি ঠিক নিয়ম?

উত্তর : এ নিয়ম সুন্নত পরিপন্থী। কারণ, সুন্নাত নিয়ম হল,.....সবধরনের কথার আগে সালামের ব্যবহার হবে। এমনকি হ্যালো বলার আগেও। তাই হ্যালো বলে সালাম বলা ঠিক নয়। বরং আগে সালাম বলবে। এটিই সুন্নত। -জামে তিরমিযী ২/৯৯, রদ্দুল মুহতার ৫/৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৫

উভয় পক্ষের সালাম মুখোমুখী হলে

২৬. প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা যায় উভয় পক্ষ থেকেই সালাম দেয়া হয়। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তর : যদি রিসিভকারী এবং কলকারী উভয়ে একই সাথে সালাম বলে তবে প্রত্যেককেই উত্তর দিতে হবে। কিন্তু কেউ যদি আগে সালাম দিয়ে দেয় তাহলে অপর পক্ষের জন্য উত্তর দেওয়া নির্ধারিত। সে ভুলে বা ইচ্ছাকৃত পাল্টা সালাম দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির সালাম উত্তর হিসাবে ধর্তব্য হবে।

-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৪৯৬, শরহুল মুহাযযাব ৪/৪৬৩

মসজিদে মোবাইলের ব্যবহার

২৭. প্রশ্ন : মসজিদের ভিতরে থেকে মোবাইলে কথাবার্তা বলা যাবে কি না? কী ধরনের কথাবার্তা বলা যাবে?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহ তাআলার ঘর। এখানে অন্য ইবাদতকারীর ক্ষতি করে বৈধ কথাবার্তাও নাজায়েয। অবশ্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে এসে অন্য ইবাদতকারীর ক্ষতি না হয় এভাবে বৈধ কথাবার্তা বলার অবকাশ আছে। তবে মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলাই উচিত। আর মসজিদে প্রবেশের আগেই রিংটোন বন্ধ করে দেয়াই আদব। বিশেষ করে কেউ ইবাদতে মগ্ন থাকলে বা জামাতের সময় হলে এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া খুবই জরুরী।

-আল মাসনূ ফী মাআরিফাতিল হাদীসিল মাওজু' ৯২, আলমুহাল্লা-৩/১৬০, শরহুল মুনইয়াহ ৬১০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২১,ফাতহুল বারী ১/৬৫৩, এলামুস সাজিদ ০৩২৬

এতেকাফে মোবাইলের ব্যবহার

২৮. প্রশ্ন : ইতিকাফ অবস্থায় মোবাইল রাখা যাবে কি না? ইতিকাফ অবস্থায় মোবাইলে কথাবার্তা বলার হুকুম কী?

উত্তর : ইতিকাফকারীর জন্য পূর্ণ সময় বাইরের সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা এবং আল্লাহমুখী হয়ে থাকাই কাম্য। তাই অধিক প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফ অবস্থায় মোবাইলের ব্যবহার না করাই শ্রেয়। আর অন্য কোন মুসল্লী বা ইবাদতকারীর ক্ষতি না করে মোবাইলে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে। -আল বাহরুর রায়েক ২/৩০৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৪১২

ভুল নাম্বারে ফ্লেক্সি হলে টাকা কে দিবে?

২৯. প্রশ্ন: ফ্ল্যাক্সিলোডে ভুল হলে কোনো কোনো সময় অন্যের মোবাইলে টাকা চলে যায়। এক্ষেত্রে এর ক্ষতিপূরণ কে দিবে? অনেক দোকানীকে এ টাকা জোরপূর্বক ফ্লেক্সি করতে আসা গ্রাহক থেকে আদায় করতে দেখা যায়। এটা জায়েয কি না?

উত্তর : যে নাম্বারে ফ্লেক্সি করা হবে সে নাম্বারেই টাকা জমা হবে। ভুল নাম্বারে করা হলে ভুল নাম্বারে যাবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে টাকা উদ্ধার না করা গেলে দেখতে হবে ভুল কার থেকে হয়েছে। সাধারণত ফ্লেক্সিকারী গ্রাহকের নাম্বার ভিন্ন খাতায় প্রথমে নোট করা হয়। সেটা কখনো দোকানী নিজে লিখে কখনো গ্রাহকের হাতে লেখায়। দোকানী লিখলে গ্রাহকের জন্য ঐ লিখা মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য। এরপর খাতার নোটকৃত নাম্বারে ফ্লেক্সি না করে ভুলে অন্য নাম্বারে করলে এর ক্ষতি দোকানীর নিজেরই। এ বাবদ গ্রাহক থেকে কিছুই নিতে পারবে না। হাঁ, গ্রাহক যদি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দিতে চায় তবে তা নিতে বাধা নেই।

আর খাতায় যা নোট করা হয়েছে দোকানী যদি সে নাম্বারেই ফ্লেক্সি করে থাকে তবে এ ভুলের ক্ষতিপূরণ গ্রাহককে দিতে হবে। অবশ্য দোকানী খাতায় ভুল নাম্বার নোট করেছে এ কথা প্রমাণিত হলে এ ভুলের দায়দায়িত্ব দোকানীর, গ্রাহকের নয়।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো সমাজে রাজনৈতিক আগ্রাসনের চেয়ে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রভাব ভয়াবহ হয়ে থাকে। রাজনৈতিক আগ্রাসনের ফলে হয়তো কিছু আন্দোলন হয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, বিবাদ-বিসংবাদ বাড়ে কিংবা হতাহতের ঘটনা ঘটে। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে একেকটি জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছে।

এ সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী একটি মাধ্যম হল স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ এবং প্রায় পুরো বিশ্ব এখন এই আগ্রাসনের তীব্র ধাক্কায় বেসামাল। উত্তরণহীন অধঃপতনে মুমূর্ষু।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ক্ষতি বহুমুখী এবং বহু বিস্তৃত। এত ব্যাপক ক্ষতি ও আগ্রাসনের পেছনে সবচে বড় কারণ হল– জীবনের সাথে স্মার্টফোনের ওতপ্রোত সংযুক্তি। জগৎ ও জাগতিক বিষয়ের সাথে ইন্টারনেটের ঘন সংমিশ্রণ। প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের যে আশ্চর্য সম্পৃক্তি তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটে, সত্যিই তা নজিরবিহীন।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ক্ষতি তালিকাবদ্ধ করতে গেলে উল্লেখযোগ্য শিরোনামে আসবে– সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয়, চোখের গোনাহ, দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি, শারীরিক-মানসিক চাপ, চরিত্র ও চিন্তা-চেতনার বিপর্যয় এবং ঈমানের ভয়াবহ অধঃপতন। এছাড়া কত ঘর-সংসার যে এর মাধ্যমে টুকরো টুকরো হয়েছে, কত জীবন যে বিপন্ন হয়েছে, কত মা-বাবা সন্তান হারিয়েছেন, কত সন্তান হারিয়েছে তার ভবিষ্যৎ এবং কতভাবে কত মানুষ কত ভয়ংকর জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছে– সেই ফিরিস্তি শেষ হবার নয়।

দেখা যায়– অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট প্রয়োজনীয় কাজের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়। এমনকি যারা কঠিনভাবে নিয়ম মেনে চলেন, মজবুত রুটিন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন, তারাও এখানে সময় বাঁচাতে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হন কেবল প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে। না চাইলেও এতে বিপুল সময়ের অপচয় হয়, লক্ষ্যমুখী কাজে বিঘ্ন ঘটে।

এটা তো হল সময়-সচেতন ও লক্ষ্যে অবিচল মানুষের ক্ষেত্রে। যারা অসচেতন কিংবা অসতর্ক– তারা যে কত রকমের ক্ষতির শিকার হয়, হিসাব করে বের করা যাবে না।

ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় ক্ষতিগুলোর একটি হল, চোখের গোনাহ। নেট ব্যবহার করেও এ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে– এমন মানুষ বোধহয় হাজারে একজন পাওয়া দুষ্কর হবে। কারণ এখানে সর্বব্যাপী আয়োজনটাই এমন যে, এই গোনাহমুক্ত হয়ে থাকা সম্ভব নয়। ফলে বার বার গোনাহটি করতে করতে একসময় খুব সহজ হয়ে যায় এবং এটাকে খুব স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়। অথচ হাদীস শরীফে কত কঠিন কথা বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে–

زِنَا العَيْنِ النَّظَرُ.

দৃষ্টি নিক্ষেপ হল চোখের যিনা। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬২৪৩

চোখের গোনাহের যেসকল ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের মনোজগতে পড়ে, এখানেও তা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।

খুব তিক্ত হলেও সত্য যে, এর দ্বারা সীমাহীন ক্ষতির শিকার হয়েছে সমাজের দ্বীনদার শ্রেণি এবং পর্দানশীন পরিবারগুলো। ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে, দ্বীনী পরিবেশে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা এবং পর্দানশীন নারীরা আগে অন্তত এই গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেত না। বাবা, স্বামী, ভাই এবং মা ও সংসারের অন্য অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানেই তাদের জীবন পরিচালিত হত। সম্পূর্ণ ঘরোয়াভাবে থাকার কারণে গায়রে মাহরাম কোনো পুরুষকে দেখা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই মোবাইল ইন্টারনেটের কারণে এখন আর কোনো তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা কোনো নজরদারি তাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

এক্ষেত্রে মোবাইলের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত অজুহাত সবচে বড় ভূমিকা পালন করে। আর ভূমিকা পালন করে 'ইসলামিক ভিডিও' ও 'ইসলামী সংগীত' দেখার অজুহাত। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, এইসব অজুহাত কতটা অনর্থ! এইসব অজুহাতের নামে শয়তান আমাদেরকে কত মারাত্মক ধোঁকায় ফেলছে! একটু দরদের সাথে, পর্দানশীন নারীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অভিভাবকগণ কি বিষয়টি ভেবে দেখবেন?

ইন্টারনেটের ক্ষতিকে আরো বাড়িয়ে দেয় তার সহজলভ্যতা ও অভিভাবকদের সহজ দৃষ্টি। হাতের নাগালে স্মার্টফোন থাকার কারণে ছোট-বড় যে কেউ যে কোনো সময় তা ব্যবহার করতে পারে। যে কোনো সুযোগে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে তার ক্ষতির দিকসমূহে। পরিবারের

ছোট থেকে ছোট কোনো সদস্যও হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো কিংবা মেসেঞ্জারের ছুঁতোয় নেটে প্রবেশ করতে পারে। অভিভাবকগণও এটাকে সহজভাবে নেন, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখেন। অথচ এর মাধ্যমেই কত বড় বড় ক্ষতির শিকার হয়ে যায় তারা।

দ্বীনদার অনেক মা-বাবার মুখেও শোনা যায়, শিশুরা নাকি ইউটিউবে মজার ভিডিও আর কার্টুন না দেখে খাবারই খেতে চায় না! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! একটু শান্তভাবে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে– কী দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিণতি এটা কিংবা এটা কত ভয়ংকর ক্ষতির পূর্বাভাস!

শুধু এক ইন্টারনেটের মাধ্যমেই দ্বীনদার বা দ্বীনদার নন– এমন কত পরিবারের কত সদস্যের চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটেছে এবং কতজনের জীবন ও ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়েছে তা কি হিসাব করে বের করা সম্ভব?

এজন্য প্রথম কাজ হল, যথাসম্ভব ঘরকে ইন্টারনেট মুক্ত রাখা। অন্তত সন্তানের সামনে মা-বাবার দীর্ঘ সময় নিয়ে নেট ব্যবহার ও মোবাইল ফোন দেওয়া থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা।

মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেট এক বিষধর সাপ। এর এক ছোবলে যে কারো প্রাণনাশ হতে পারে। এর ছোবল থেকে বেঁচে থাকা তো সবার সাধ্যের বিষয় নয়!

প্রযুক্তি : সেলফি

বর্তমান সময়ে সেলফি-আসক্তি অনেকটা মনোরোগের পর্যায়ে চলে গেছে। মনস্তত্ত্ববিদগণ এভাবেই তা ব্যাখ্যা করছেন। সেলফির বিচিত্র রূপ ও ব্যাপক বিস্তার সামনে রাখলে তাদের ব্যাখ্যার যথার্থতা বেশ বুঝে আসে।

কিছু কিছু সেলফি আছে যা সরাসরি নিজের প্রাণকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা। হিংস্র প্রাণীর সাথে সেলফি, চলন্ত ট্রেনের সামনে সেলফি, পাহাড়ের চূড়ার প্রান্তে পা ঝুলিয়ে সেলফি, আরো কত রকমের সেলফি যে মানুষ তুলছে এবং দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আহত-নিহত হচ্ছে তা একজন সাধারণ পত্রিকা-পাঠকেরও অজানা নয়। এখন তো সেলফির দৌরাত্ম্য ইবাদত-বন্দেগী পর্যন্তও পৌঁছে গেছে। মুসলমানের বহু কাঙ্ক্ষিত ইবাদত হজ্বে ও তাওয়াফেও সেলফির ছড়াছড়ি!

সেলফির মূল কথাটি হচ্ছে নিজেকে বা নিজের বিশেষ কোনো মুহূর্তকে নিজে ধারণ করা। এই ধারণের প্রেরণা কী, উদ্দেশ্য কী? সাধারণত তা হয় মনের ইচ্ছা পূরণ, ক্ষণিকের আনন্দ এবং অন্যের কাছে নিজেকে উপস্থাপন ।

মনের সকল ইচ্ছা পূরণ কি মানুষের জন্য কল্যাণকর? আর মানুষের কাছে সবকিছু উপস্থাপন করে কী লাভ? নিজেকে ও নিজের সকল মুহূর্তকে উপস্থাপন করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। কুরআন মাজীদ আমাদের শেখাচ্ছে, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি রাব্বুল আলামীন।'

আমার হজ্ব, আমার তাওয়াফ তো মানুষের জন্য নয়, আমার নিজের ইচ্ছা পূরণ বা বিনোদনের জন্যও নয়, এ তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। আমি কি চিন্তা করেছি, সেলফির মতো সামান্য একটি ইচ্ছাপূরণের দ্বারা আমার ইবাদতটিই মাটি হয়ে যাচ্ছে? সেলফির দ্বারা তো ইবাদতের স্বরূপই বদলে যায়। বলুন তো ইবাদতের মধ্যে যে আল্লাহর বান্দা সেলফিগ্রস্ত হয় তার উদ্দেশ্য কি ইবাদত থাকে, না ইবাদতের অঙ্গ-ভঙ্গি? সে তো ইবাদত করছে না, ছবি তোলার জন্য ইবাদতের অঙ্গ-ভঙ্গি করছে। কিংবা অন্তত আল্লাহকে ভুলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রাণহীন অঙ্গ-ভঙ্গির কী মূল্য তাহলে আল্লাহর কাছে হতে পারে? কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; পুণ্যবান তো সে যে, ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, শেষ দিবসের উপর, সমস্ত ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপরI (-সূরা বাকারা (২) : ১৭৭)

ঈমানদারের জন্যও এ আয়াতে এই গভীর শিক্ষা আছে যে, তার ইবাদত-বন্দেগীও যেন শুধু অঙ্গভঙ্গিতে পর্যবসিত না হয়।

আরেক জায়গায় মুমিনদের লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে-

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.

আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তার (কুরবানীর প্রাণীর) গোশত ও রক্ত; বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। –(সূরা হজ্ব (২২) : ৩৭)

অথচ কুরবানীর মতো ইবাদতও যারা ভিডিও করে থাকেন তারা কি কুরবানীর পশুর রক্ত-মাংসের মধ্যেই বাধা পড়ে গেলেন না?

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইবাদতের প্রাণ হচ্ছে 'যিকরুল্লাহ' আল্লাহর স্মরণ। একারণেই সালাত ও কুরবানী, হজ্ব ও তাওয়াফ সব ক্ষেত্রেই কুরআন-সুন্নাহয় 'আল্লাহর স্মরণ' কথাটি উল্লেখিত হয়েছে। ছবি তোলা, ভিডিও করা ইত্যাদির মাধ্যমে ইবাদতের এই বড় অনুষঙ্গটি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা তো বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়ত, সেলফি যদি হয় বিনোদন তাহলে ইবাদত-বন্দেগীতে সেলফিগ্রস্ততার দ্বারা কি ইবাদতকে বিনোদনে পরিণত করা হয় না? দ্বীন-ধর্মকে ক্রীড়া ও বিনোদনে পর্যবসিত করা তো অনেক বড় অপরাধ।

তৃতীয়ত, সেলফিতে যখন যোগ হয় লোকের বাহবা পাওয়ার চিন্তা তখন এর মাধ্যমে ইবাদত রিয়াগ্রস্ত হয়, যাকে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে 'শিরকে আসগর'।
চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরের যে কোনো একটি বিষয়ই ইবাদতকে বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। কাজেই সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য হজ্ব-কুরবানীর মতো বাঞ্ছিত ও প্রতীক্ষিত ইবাদতকে নষ্ট করে ফেলা কত বড় নির্বুদ্ধিতা! দেখুন, শয়তান কত সহজে আমাদের বহু আকাক্সিক্ষত ইবাদতগুলো মাটি করে দেয়!

এরপর আসুন ঝুঁকিপূর্ণ সেলফি প্রসঙ্গে। যে সেলফির জন্য তরুণ-যুবকেরা জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়ে ফেলছেন তারা হয়তো সচেতন নন যে, এভাবে তারা একটি গর্হিত কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। শরীয়তের বিধানে এটা বৈধ নয়। এ তো উপযুক্ত কারণ ছাড়া নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা, যা পরিষ্কার নিষেধ। হাদীস শরীফে তো মৃত্যুর কামনা করতেও নিষেধ করা হয়েছে তাহলে নিজেকে মৃত্যু-ঝুঁকির মুখোমুখি করার তো প্রশ্নই আসে না।

মানুষের জীবন অতি মূল্যবান। এই একটিমাত্র জীবনকে কাজে লাগিয়ে যেমন মানুষকে আখিরাতের চিরস্থায়ী মুক্তি ও সাফল্য অন্বেষণ করতে হয় তেমনি পৃথিবীর অনেক এবং অনেকের দায়-দায়িত্বও পালন করতে হয়। তাহলে অর্থহীন কাজে এই জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলা মর্মান্তিক অবিবেচনা নয় কি? হায়! মানুষের প্রকাশ্য দুশমন শয়তান যে মানুষকে কতভাবে প্ররোচিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে!

প্রিয় বন্ধু! আপনি কি একজন সাহসী যুবক? আপনি কি আনন্দ পান অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া বা আলাদা হওয়ার মধ্যেই? তাহলে আপনাকে স্বাগতম! ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানায় অর্থহীন কাজে নয়, অর্থপূর্ণ কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনে-মানবসেবায়, জাতিগঠনে, ন্যায়ের বিস্তারে, অন্যায়ের প্রতিরোধে। দেখুন, একজন বহু সাধ্য-সাধনা করে তেলতেলে মুলিবাঁশ বেয়ে উঠে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। এই কর্মে সে এমনই অভাবিতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল যে, শুধু মাটির মানুষ নয়, গাছের বানরও অভিভূত হয়ে গেল; বলুন তো এতে তার কী প্রাপ্তি ঘটল?

তাই আজেবাজে কাজ নয়, এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কর্ম-কুশলতা। চলুন না, এই সব ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাই। আর এগিয়ে যাই একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, একমাত্র যাঁর কাছেই আমাদের সকল কর্ম ও মুহূর্ত থাকবে চির অক্ষয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

এক.

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনে ‘অসামাজিক’ কিংবা আপনদের সমাজ ও সামাজিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় উপাদানে রূপ নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মোহনীয় শ্লোগান ও পরিচিতির কথা বলা হলেও এ মাধ্যমের বদৌলতে আপন জগৎ ও আপন মানুষের সমাজ হয়ে গেছে অনেক দূরের। বয়স ও পেশা নির্বিশেষে সামাজিক মাধ্যমের আকর্ষণ, নিমগ্নতা ও এককেন্দ্রিকতা- এর সঙ্গে যুক্ত লোকদের জীবনে বিচ্ছিন্নতা ও ‘বুঁদ’ হয়ে থাকার একটি অর্থহীন অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছে। কিছু এই নিমগ্নতার কারণে আর কিছু এই উপলক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যের কারণে খুলে দিয়েছে আরো বহুবধি সংকট ও শঙ্কার দরজা।

কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও ঠিক যে মূলধারার গণমাধ্যম বা তথ্য বিনিময়-বিতরণ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ-জটিলতার কারণে সামাজিক মাধ্যম অনেক সময় দরকারি তথ্য সামনে আনার একটি সুযোগ করে দেয়। উপলক্ষ্য তৈরি করে প্রভাব ও প্রতিপত্তির সহযোগিতায় জারি হওয়া বিচ্যুতি ও সংকটের বিপরীত চেহারাটা তুলে ধরার।

এজন্যই সামাজিক মাধ্যম/অনলাইন যোগাযোগ পরিধির বড় পরিসরটি নানারকম নেতিবাচক অবস্থা-আচার-অভ্যাসের চোরাই দরজা খুলে দিলেও ইতিবাচক কিছু পরিবেশন ও উপস্থাপনের পরিস্থিতিও তৈরি করে দিতে পারে। এ মাধ্যমের ব্যবহারকারীর সদিচ্ছা-সদ্ব্যবহার ও সংযমী পদক্ষেপ এসব ইতিবাচকতার পথ নির্মাণ করতে সাহায্য করে। তা না হলে রঙ-চমক ও উদ্ভ্রান্তির হাতছানি মিলিয়ে ডিজিটাল এই সামাজিক মাধ্যম মানুষকে নানারকম অকল্যাণকর জীবনাচারে যুক্ত করে দিয়ে থাকে। আর এর বড় রকম শিকার হতে পারে এবং হয়ে থাকে তরুণ প্রজন্মের সম্ভাবনা।

দুই.

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমের সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম মনে করা হয় ফেইসবুক-কে। এই মাধ্যমে যুক্ত হয়ে থাকার সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হয় তা হচ্ছে, এর সঙ্গে পড়ে থাকা। কৌতূহল, সম্পৃক্ততা, খোঁজখবর নেওয়া, নিজের মতামত দেওয়া, অনেক রকম বিষয়-আশয়ের ভেতর-বাইরের প্রতিক্রিয়া দেখার একটি চক্রের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় অনেকের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় এভাবেই ফুরিয়ে যেতে থাকে। সময়ের বরকত ও জরুরত দুটোই নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। নিবিষ্ট মনে দরকারি দ্বীনী ও পার্থিব কোনো কাজই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার আগ্রহ-সুযোগ থাকে না। দিনের পর দিন এভাবে পার হয়ে গেলেও সময় ও ফুরসতের এই সংকোচনের বিষয়টি অনুভূতই হতে চায় না। সময় ধ্বংসের এই চক্রের বাইরে থাকার চেষ্টা করাটা জরুরি। বহু মানুষ এমন আছেন, এই চক্রে ঢোকেন না, ঢুকলেও সীমিত সময়ের মধ্যে ‘প্রয়োজন’ সম্পন্ন করে সরে আসেন। নিজের সময়ের দস্তরখানে অফলাইন ইতিবাচকতার সৌন্দর্য ও ব্যস্ততার পশরা সাজিয়ে রাখেন। আসলে সময়-গ্রাস ও সময়-ধ্বংসের এই অজগর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ছোট-বড় সবারই করা উচিত।



তিন.

অনলাইন এই যোগাযোগ মাধ্যম অনেককেই সংকোচহীন-নির্ভয় বানিয়ে দেয়- ফলে যে কোনো বিষয়ে অযাচিত মন্তব্য, কটূক্তি, অশোভন কথা এবং বিশেষজ্ঞ মন্তব্য দেওয়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। এবং এটাকে একটি নিয়ম ও অধিকার মনে করা হতে থাকে। এভাবে গীবত, তোহমত, বেয়াদবি, অসংযম, যথেচ্ছাচারের পরিধি অনেক বড় হয়ে যায়। কোন্টা ন্যায্য প্রতিবাদ, কোন্টা উচিত সংশোধন এবং কোন্টা অন্যায় বেয়াদবি- এ বিষয়গুলির জ্ঞান না থাকায় সবকিছুকে নিজের মতো করে 'বিচার' করার আসনে বসে গিয়ে 'রায়' দেওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হয়। আত্মভোলা পরচর্চার জগতে ঢুকে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়। পরের বিষয়ে এই আক্রমণাত্মক অভ্যস্ততা, অনুশীলন ও চর্চা কিছুতেই নিরাপদ নয়। এসব বিষয়ে অনেক বেশি সংযম ও সতর্কতা দরকার।

চার.

উন্মুক্ত বিচরণের রাস্তাটা খোলা থাকে ইন্টারনেটে, অনলাইনে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এজন্য অসংযমী তারুণ্য কিংবা বয়সী জীবন এখান থেকে অশালীন জীবন ও বিনোদনের বিচিত্র অশুভ বারান্দায় উঁকিঝুকি-অনুপ্রবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ এক অন্ধকার ও জীবনবিনাশী পাপের জগৎ। মোহ, মোহাচ্ছন্নতা এবং গুনাহের আবর্তনে ঘোরের মধ্যে অটকে যাওয়ার উপলক্ষ তৈরি হয় এতে। এরপর পাপের এই হাতছানি আরো দীর্ঘ হতে থাকে, স্ফীত

ও বড় হতে থাকে। অনেক সময় এসব অশুভ বিনোদনমুখী কৌতূহল থেকে নানারকম অযাচিত সম্পর্ক ও অসুস্থ যোগাযোগের ঘটনাও ঘটে। সভ্যতা ও সুস্থতা তখন প্রতারিত হয়, প্রতারক হয় এবং বড় গুনাহ ও পার্থিব জটিলতার এক কঠিন চক্রে কেউ কেউ আটকে যায়। হাজারো ভুল ঘটনার মধ্যে মাঝেমধ্যেই গণমাধ্যমে এজাতীয় দু-চারটি ঘটনার খবর প্রকাশ করা হয়।

সর্বাত্মক উন্মুক্ততার এই জগৎটা তাই রেলিংহীন উন্মুক্ত ছাদের মতো; ছাদের জমিনে বিচরণ করা গেলেও তার চারপাশ দাপিয়ে বেড়ানো যায় না। কিনারা-কার্নিশের পতন এবং শ্যাওলায় পিচ্ছিলের ভয় নিয়ে সতর্ক বিচরণ করে চলতে হয়। আসলে সমস্ত কৌতূহল-বিনোদন ও মোহাচ্ছন্নতার চেয়ে গুনাহ থেকে দূরত্ব এবং অন্তর-জীবনের স্থিরতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ.

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে অত্যধিক যুক্ত থাকার আরেকটি অনিবার্য পরিণতি হল, সাধারণ স্থির পাঠাভ্যাস লোপ পাওয়া বা কমে যাওয়া। অনেক ঘটনা, অনেক অনুভূতি, বিপরীতমুখী অনেক প্রতিক্রিয়ার টুকরো টুকরো চিত্র মগজের ময়দান দখল করায় দীর্ঘ-নাতিদীর্ঘ, উপকারী ও কল্যাণকর উপাত্তগুলো, গ্রন্থ ও পৃষ্ঠাগুলো পড়ার আগ্রহ ফুরিয়ে যায়, পাঠের দম হারিয়ে যায়। মোবাইল ফোনের ছোট্ট স্ক্রিনই হয়ে ওঠে ছবি-টেক্সটের আরাধ্য বই। সাদা-নীলের এই পাতায় চোখ ও মনযোগ আবদ্ধ হয়ে যায়। এটি মন ও মনস্তত্বের এবং মস্তিষ্ক ও রুচির নীরব সংকট; যা সামাজিক মাধ্যমের হাত ধরে তারুণ্যের জীবনে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেকেই এখন বইপত্র পড়ার সময় ডিভাইস দূরে সরিয়ে রাখেন। অনেকেই ডিভাইস ও নেট সংলগ্ন সময় কমিয়ে দেওয়ার উপায় গ্রহণ করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও নেট-ফোনে অতিরিক্ত নিমগ্নতার অনেক অসুখ ও সংকটের কথা এখনকার দিনে খোদ পশ্চিমের সমাজ-মানুষেরাই উঁচু গলায় বলছেন। এর সঙ্গে এ পর্যবেক্ষণও অনেকেই দিচ্ছেন যে, এসবের ফলে স্বাস্থ্য ও মনোস্বাস্থ্যের নানারকম ক্ষতির ঘটনাও ঘটছে। চিন্তা-প্রবণতা বদলে যাচ্ছে, ধৈর্য্য ও গ্রহণক্ষমতা কমছে এবং চোখ-হাত, ঘাড়, কোমড়সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও পড়ছে নানারকম অসুখের ছাপ। তাই সামাজিক মাধ্যমের নিমগ্নতা-সম্পৃক্ততায় মাত্রা ও সংক্ষিপ্ততা অবলম্বনের কোনো বিকল্প আসলে নেই।

ছয়.

অবশ্য প্রবল মূলধারার গণমাধ্যমের একপেশে ও আরোপিত ভূমিকার বাইরে সঠিক বক্তব্য ও বার্তার কিছু চিত্র তুলে ধরার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্লাটফর্মটি এখনও গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হতে পারে; কিছু কিছু হচ্ছেও। এর পাশাপাশি চাপিয়ে দেওয়া পরিস্থিতি ও দমবন্ধ বিচ্যুতির সময়গুলোতে সংশোধনী প্রয়াসের জন্যও এ মাধ্যমটিকে কিছু মাত্রায় কাজে লাগানো যায়; এবং প্রত্যাশিত কিছু কাজ এতে হচ্ছেও। প্রভাবশালী অঙ্গন ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় প্রচারিত কোনো বিচ্যুতি, দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে সংশোধন-কাম্য এমন জরুরি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে সত্য বক্তব্যটি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর তাৎক্ষণিক সুফল বেশ ভালো। তবে এসব উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুজব, অতি আবেগ, অসংযত গালাগাল, ভুল তথ্য ও ভুয়া প্রচারণা বিষয়ে কঠোর সতর্কতা রক্ষা করা দরকার। দ্বীন, জাতি, মানুষ ও দেশের জন্য ইতিবাচক ও কল্যাণকর বিষয়গুলোর প্রচারে সামাজিক মাধ্যমের মধ্যস্থতা গ্রহণ করে সাধারণ নাগরিক সচেতনতা তৈরির কাজটি পারিকল্পিতভাবে করা যায়। দ্বীন, ঈমান ও দ্বীনী চেতনা এবং মুসলিম প্রধান সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর কোনো আঘাত এলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাল্টা প্রচার, প্রতিবাদ, জবাব ও সঠিক বক্তব্য তুলে ধরার যৌক্তিক ও জোরালো উদ্যোগ কার্যকর প্রভাব রাখতে পারে; অনেক সময় রেখেও থাকে। এসবের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনমত গঠন হলে সুফল ও সুপ্রভাবের ছাপ পড়ে প্রভাবক গণমাধ্যমে এবং নীতি-নিয়ন্ত্রক পর্যায়েও।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতি ব্যবহার, অসংযত ও ভুল ব্যবহারের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত ও কল্যাণকর ব্যবহারে চলতি তথ্যের অবগতি এবং দ্বীন ও ইতিবাচকতার প্রচারে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এ ক্ষেত্রটিতে তাই প্রয়োজন সতর্কতা, সচেতনতা এবং বাস্তব ইতিবাচকতার একটি যুথবদ্ধ মানসিক ও বাস্তব পদক্ষেপ-প্রস্তুতি। আল্লাহ তাআলা যোগাযোগ ও প্রচারের অসুস্থতা থেকে বেঁচে সুস্থতার পথে আমাদের পথচলার তাওফীক দান করুন।

প্রোফাইলে শিশুদের ছবি দেয়া

শিশুদের ছবি প্রোফাইল পিকচারে দেয়া থেকে বিরত থাকতে আমরা সকল বাবাদেরকে উৎসাহিত করি। বিশেষকরে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ছবি। এ কাজটি মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি মনে করি সন্তানদের প্রতি মমতাবোধ থেকেই এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে শিশু বদনজর এবং হিংসা থেকে হিফাযতে থাকবে। হযরত ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম তার ছেলেদের যেমন বলেছিলেন:

يُبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে।'
(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৭)

অর্থাৎ, যাতে তোমাদের বদনজর না লাগে। কেননা বদনজর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এ নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে সতর্ক থাকা মাত্র। তাই উপরোক্ত কথার পরেই ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম বলেন:

আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। বিধান আল্লাহরই। আমি তার ওপরই নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করুক।' '
(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৭)।

সোশ্যাল মিডিয়া, নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয়

মুসলিমের সন্তান তার মা-বাবার জন্য পার্থিব নিআমতই শুধু নয়; আখিরাতের সঞ্চয় ও শ্রেষ্ঠ সদকায়ে জারিয়াও বটে, যদি সে সন্তান হয় ঈমানদার।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ঈমান-লুটেরার দল কীভাবে নীরবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঃযরংস ও নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবিত করছে তার কিছু বৃত্তান্ত এই লেখায় উপস্থাপন করব। দৃশ্যত অধ্যয়ন ও এন্টারটেইনমেন্টের সদুদ্দেশ্যে যে মা-বাবা তাদের কচিকাঁচা সন্তানকে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ না করুন আপনার সন্তানও হয়ত এই ফিতনার শিকার হয়ে ঈমান হারানোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অথচ সে সম্পর্কে আপনার বিন্দু-বিসর্গও জানা নেই।

করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ ও পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ এখন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণত মুসলিম পরিবারের ১৫-২০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরাই এতে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। উদাহরণ এক-দুটি নয়, শত শত। উলামায়ে কেরাম দিন-রাত তা লক্ষ্য করছেন।

বিষয়টি এই যে, সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারে এমন অসংখ্য একাউন্ট আছে, যেগুলোর কাজই হচ্ছে দিন-রাত বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে যাওয়া, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপত্তি তোলা এবং আলিম-উলামাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের নিশানা বানানো।

এদের অধিকাংশই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন এনজিওর সাথে যুক্ত এবং এদের টার্গেটই এটা। এগুলোর নামের ধরন সাধারণত এরকম হয়ে থাকে-

Ex-Muslims Together
Atheist Muslims
Muslims Liberated
Muslims Awakening
Islam Exposed

এদের কর্মী ও সহমত পোষণকারী হিসেবে রয়েছে শত শত ছেলে-মেয়ে, যারা ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত। এদের অধিকাংশই দ্বীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রোডাক্ট। এরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের তরুণ-তরুণীদের দলে ভেড়ানোর কাজে ব্যস্ত। এরা দৃশ্যত মুসলিম-সংশ্লিষ্ট নামের একাউন্ট রাখলেও মতাদর্শগতভাবে নাস্তিক্যবাদী।

এদের আলোচনার ধরন অনেকটা এরকম...

প্রথম দিকে ইসলামের উপর প্রশ্ন তোলা হয় না; বরং কিছু কিছু ইসলামী বিধানকে সাইন্স ও লজিকের মানদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু দ্বীনী বিষয়ই নির্বাচন করা হয়, যা সাইন্স দ্বারাও প্রমাণিত। এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই মানসিকতা গঠন করা হয় যে, দ্বীনের সকল বিধান বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বিজ্ঞান যা সমর্থন করে তা নিঃসন্দেহে সত্য।

এর পরের ধাপে আলোচনায় আনা হয় ঐসকল বিষয়, যা সাইন্সের আওতার ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলি, অহী, মিরাজ ইত্যাদি, যা একান্তই গায়েবের বিষয়। এগুলোও সন্দেহাতীতভাবে সত্য তবে সাইন্সের আওতা-বহির্ভূত। কিন্তু ইতিপূর্বে যেহেতু মানসিকতাটা এভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যা নিরূপণের অব্যর্থ মাপকাঠি হচ্ছে সাইন্স, তাই এ ধাপে এসে এই মৌলিক আকীদাগুলো সম্পর্কে সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। (দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকা আর সাইন্সের ব্যাপারে অতিউৎসাহের ফলে কোন্ বিষয়টি সাইন্সের আওতাভুক্ত আর কোন্টি তার আওতা-বহির্ভূত- তা উপলব্ধি করার ফুরসত থাকে না।)

এর পরের ধাপে আরো অগ্রসর হয়ে সরাসরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত জীবনের নির্দিষ্ট কিছু দিক আলোচনায় নিয়ে আসা হয়। এ পর্যায়ে এমন কিছু বিষয়কে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়, যা দ্বীন সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তিদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরের। যেমন দাস-প্রথা, নারী-পুরুষে সমতা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একধিক বিয়ে ও দাসী, বিয়ের সময় আম্মাজান আয়েশা রা.-এর বয়স ইত্যাদি।

প্রজ্ঞাবান মুসলিমের কাছে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট, কিন্তু কাঁচা বুদ্ধির আবেগপ্রবণ মুসলিম ছেলে-মেয়ের কাছে, যারা একে তো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অন্যদিকে পশ্চিমা চিন্তা-ধারা ও জীবন-ধারায় প্রভাবিত, এ বিষয়গুলো খুবই অস্বস্তিকর ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে দ্বীন ও উলামায়ে দ্বীনের সাথে মেলামেশা না থাকায় এসবের সঠিক স্বস্তিদায়ক উত্তর পাওয়ারও তাদের রাস্তা থাকে না। এরা তখন গুগল ও ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়, যেখানে নাস্তিক্যবাদী ও ধর্ম-বিদ্বেষীদের পূর্ব প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ওয়েবসাইট তাদের সন্দেহ-সংশয়কে অটল বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে। এরপর ঈমান খুব দ্রুত বিদায় নিয়ে যায়।

হজ্ব-কুরবানী থেকে শুরু করে বিয়েশাদী ও মীরাছের বিধি-বিধান পর্যন্ত ইসলামের প্রত্যেক বিধানকে পশ্চিমের সরবরাহকৃত মাপকাঠিতে পরীক্ষা করার পর অবশেষে একে মনগড়া ধর্ম আখ্যা দিয়ে নীরবে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়। (নাউযু বিল্লাহ)

প্রকাশ্যে ইসলামের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখী ও আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারের পর্যায়টা এর পরে আসে। এরপর এই ছেলে-মেয়েগুলোই ঐসব সংগঠনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবকেও দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করতে থাকে।

এই গোটা বিষয়টা আমাদের আশেপাশেই ঘটছে। আমাদের পাশে বসেই ১৫-২৫ বয়সের তরুণ-তরুণীরা টুইটার, ফেসবুক ইত্যাদিতে এই কাজ করে চলেছে, কিন্তু আমরা একেবারেই বেখবর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সন্তান-সন্ততিকে আমরা কীভাবে রক্ষা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নীচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন :

-মাঝেমধ্যে আলেমদের কাছে ও বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে নিজেও যান, সন্তানকেও নিয়ে যান। যেন তাদের সাথে স্বাভাবিক পরিচয় গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

-সন্তান-সন্ততিকে কাছে টেনে নিন, ভালবাসুন। তাদের সমস্যাগুলো শুনুন ও পরামর্শ দিন। তাদের সাথে নিজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করুন এবং তাদেরকে নিজের চিন্তা-ভাবনার ধারক হিসেবে গড়ে তুলুন।

আপনি যদি তাদের দূরে ঠেলে রাখেন তাহলে বিপথগামী লোকেরা ওদের কাছে টেনে নেবে।

-ধীরে ধীরে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানুন এবং ঘরেও তা আলোচনা করুন।

-ছেলে-মেয়ে ছোট হলে তাদের জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করুন।

-অতি প্রয়োজন ছাড়া বাচ্চাদের হাতে স্মার্টফোন দেয়া থেকে বিরত থাকুন নিজেও তা থেকে বিরত থাকুন।

-একান্ত দিতে হলে শর্তসাপেক্ষে দিন, অসময়ে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুন। রাতে সবার ফোন নিজের কক্ষে জমা রাখুন। এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করুন।

-বিনা কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো থেকে নিজেও বাঁচুন, ছেলে-মেয়েকেও বাঁচান।

-ছেলে-মেয়ের সামনে সবসময় ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

-যে কোনো প্রশ্ন বা সংশয়ের জবাব পেতে ইন্টারনেটের সামনে না বসে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হোন।

ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সাফল্য, ঈমানকে নিরাপদে কবরে নিয়ে যাওয়া। ছেলে-মেয়েকে ঈমান-লুটেরাদের কবল থেকে রক্ষা করুন। যেন আমাদের আগামী প্রজন্মের মাঝেও দ্বীন ও ঈমান বাকি থাকে।

আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন- আমীন।

মুসলিম বানানোর উদ্দেশ্যে প্রেম করা

চীনের যুবকের নাম ওয়াং তাও (৩৬)। চীনের হোয়ানান প্রদেশের ওয়াং ইচাং চাওয়ের ছেলে তিনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার কুন্ডা ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামের তাহের মিয়ার মেয়ে সুরমা আক্তারের (২২) সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক আছে তাঁর। সুরমা একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন এবং ঢাকার লালবাগে থাকেন। আজ রোববার তাঁরা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন বলে তরুণীর পরিবার জানিয়েছে।

স্থানীয় লোকজন, পুলিশ ও তরুণীর পরিবারের দাবি, দেড় থেকে দুই মাস আগে ডেটিং এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ওয়ার্ল্ড টক' নামের একটি অ্যাপের মাধ্যমে ওয়াং তাওয়ের সঙ্গে সুরমার পরিচয় হয়। তাঁরা নিয়মিত চ্যাটে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে। বিষয়টি চীনের যুবক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তরুণী নিজ নিজ পরিবারকে জানান। উভয় পরিবারের সম্মতিতে তাঁরা একে অপরকে বিয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। পরে চীনের যুবক বাংলাদেশ ও চীনের দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসেন। ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হলে দুপুরের পর থেকে চীনের যুবককে দেখার জন্য সুরমার বাড়িতে ভিড় করেন স্থানীয় লোকজন।

সুরমা স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, 'ওয়ার্ল্ড টক' অ্যাপের মাধ্যমে চীনের যুবক ওয়াং তাওয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্ক প্রেমে গড়ায়। ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে চ্যাট করতেন। একপর্যায়ে তাঁরা পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

সুরমার মা নুরেনা বলেন, 'আমার মেয়ের ভালোবাসা পেতে চীন থেকে যুবক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে চলে এসেছে। ওই যুবক কোনো ধর্মই বিশ্বাস করে না। মেয়েকে বিয়ে করতে প্রয়োজনে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। আগামীকাল (আজ) রোববার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আদালতে মুসলিম রীতি মেনে সুরমাকে বিয়ে করবে চীনের যুবক। এতে দুই পরিবারের সম্মতি আছে। আমরা এই বিয়েতে আনন্দিত। মেয়ের খুশিই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

নাসিরনগর থানার কুন্ডা বিট উপপরিদর্শক (এসআই) জাহান-ই-আলম প্রথম আলোকে বলেন, 'বিষয়টি জানতে পেরে কুন্ডা গ্রামে যাই। পাসপোর্ট দেখে নিশ্চিত হলাম যে যুবক চীনের নাগরিক। ওই তরুণী ঢাকার লালবাগে থাকেন। 'ওয়ার্ল্ড টক' নামের একটি অ্যাপসের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয়। একপর্যায়ে তাঁরা প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। চীনের যুবক ইংরেজি বোঝেন না। তাই কথা বলা সম্ভব হয়নি। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে কথা বলতেন। তরুণী ও তাঁর পরিবার জানিয়েছে, রোববার হলফনামার মাধ্যমে চীনের যুবক

মুসলিম হবেন। তারপর তাঁরা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন।' তরুণীর বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান, চীনের যুবক এক থেকে দেড় মাস থাকবেন। যাওয়ার সময় হয় ওই তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বা পরে নিয়ে যাবেন।

চীনের প্রেম ও বিয়ের বাজার এখন এক অদ্ভুত রূপ নিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'চীনা বয়ফ্রেন্ড' বা 'বিদেশি বউ' নিয়ে ট্রেন্ডের আড়ালে লুকিয়ে আছে জটিল এক জাল—যেখানে প্রেমের ছদ্মবেশে চলছে অর্থনৈতিক প্রতারণা, মানবপাচার, এমনকি জোরপূর্বক বিয়ে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সিক্সথ টোন, গার্ডিয়ান সহ আন্তর্জাতিক সূত্রের রিপোর্ট মিলিয়ে আঁকা চিত্রটি ভয়ংকর ও গভীর।

বিগত বছর গুলাতে বাংলাদেশেও আমরা দেখতে পাই চীনা লাভারবয় দের আনাগোনা। চলতি মাসের শুরুর দিকে এক চীনা পুরুষ এসেছে তার প্রেমিকার টানে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তাদের বিয়েও হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু আজকে সেই চীনা লাভারবয় বিয়ে না করেই দেশে ফিরে যাচ্ছে। নভেম্বর ০৭, ২০২৫, বাংলা নিউজ জানায় : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়ে S এর ভালোবাসার টানে সুদূর চীন থেকে এসেছিলেন চীনা নাগরিক তাওজেন।

মাত্র দেড় মাসের প্রেমের সম্পর্ককে বিয়েতে পরিণতি দিতেই এসেছিলেন তিনি। মিয়া-বিবি রাজি থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। ফলে বিয়ে না করেই নিজ দেশে ফিরতে হচ্ছে তাওজেনকে।

যাওয়ার সময় তাওজেন তার ভালোবাসার মানুষ S কে বলে গেছেন, সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আবার বাংলাদেশে এসে তাকে বিয়ে করবেন।

কিন্তু লাভারবয় তাওজেন কি আর ফিরে আসবে?

বিগত বছরের রিপোর্ট গুলা কী বলে?

শুরু করা যাক কাম্বোডিয়ার উত্তরাঞ্চলের এক তরুণী ন্যারিকে (ছন্দনাম) দিয়ে।

ন্যারি, মাত্র ২২ বছর বয়সে চার বছর চীনে "বউ " হিসেবে কাটিয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৬ দেশে ফিরে এসেছে। কিন্তু সেই ফিরে আসার পর থেকে তিনি তাঁর গ্রামে কারও সঙ্গে নিজের অতীত নিয়ে একটি কথাও বলেননি।

ন্যারি জানতেন যে চীনে থাকতে হলে তাকে বিয়ে করতে হবে—কিন্তু সেখানে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে, তা কল্পনাও করতে পারেননি।শুধু আমার স্বামী নয়, তার বাবা আর আত্মীয়রাও আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করত," তিনি বলেন। "প্রথম এক মাস আমি শুধু গৃহিণী ছিলাম, কিন্তু তিন মাস পর সবকিছু বদলে গেল। তখন যেই চাইত, যখন চাইত—আমাকে ব্যবহার করত।

শুধু ন্যারিই নয়, মায়ানমার ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, লাওস ও উত্তর কোরিয়া থেকে পাচার বা প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়া শতশত ন্যারির খোঁজ মিলে চীনে যেমনটি আমরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বিগত বছরের প্রতিবেদন গুলাতে দেখতে পাই।



মানবপাচারের শিকল: হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অনুসন্ধান

২১ মার্চ ২০১৯, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রকাশ করে এক ভয়াবহ প্রতিবেদন—"Myanmar: Women, Girls Trafficked as 'Brides' to China"।

রিপোর্টে বলা হয়, মিয়ানমারের কাচিন ও উত্তর শান রাজ্যের শত শত নারীকে "চাকরি"র প্রতিশ্রুতি দিয়ে চীন নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় পুরুষদের সঙ্গে। বিয়ের পর শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন, যৌন শোষণ, এবং সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করা। উদ্ধার হওয়া এক নারী বলেন, "আমাকে বলা হয়েছিল অফিসে কাজ পাব, কিন্তু পৌঁছে দেখি আমি কারও স্ত্রীর ভূমিকায় বন্দী।"

এই ঘটনার মূল কারণ চীনের লিঙ্গ অনুপাতহীনতা—দশকের পর দশক ধরে ছেলে সন্তানের প্রতি সামাজিক পছন্দ এবং এক সন্তান নীতি মিলিয়ে দেশে "নারীর ঘাটতি" তৈরি করেছে, যা এখন মানবপাচারের বাজারকে বাড়িয়ে তুলেছে।

একই বছরের ৩১ অক্টোবর ২০১৯-এর আরেক প্রতিবেদনে ("China's Bride Trafficking Problem") হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, লাওস ও উত্তর কোরিয়া থেকেও নারীদের পাচার হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে—চীনা পুরুষদের জন্য "বধূ" হিসেবে।

সংস্থার মতে, এটি কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, বরং একটি বাণিজ্যিক চেইন, যেখানে দালালচক্র, ভুয়া বিবাহ নিবন্ধন, এবং স্থানীয় প্রশাসনিক দুর্নীতি মিলিতভাবে কাজ করছে।

ডিসেম্বর ০৫, ২০১৯ সালে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এই প্রতিবেদনটা দেখুন যেখানে বলা হয় পাকিস্তান থেকে ৬০০ এর বেশি তরুণীকে বউ হিসেবে চীনে পাচার করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয় পাকিস্তানের ৬০০-র বেশি নারী ও কিশোরীকে "বিবাহের নামে" চীনে বিক্রি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এক তদন্ত রিপোর্ট। এদের মধ্যে বেশিরভাগ বিয়ে সংঘটিত হয়েছে ২০১৮ সালে থেকে ২০১৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ৬২৯ জন কন্যাকে তাদের নিজ পরিবারই চীনা বরদের কাছে বিক্রি করেছিল।

তালিকা প্রস্তুতের পর ঠিক কতজন নারী ও কিশোরীকে আরও পাচার করা হয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "এই লাভজনক বাণিজ্য এখনো অব্যাহত রয়েছে।"

অজ্ঞাতনামা থাকতে অনুরোধ জানিয়ে ওই কর্মকর্তা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)-কে বলেন, "চীনা এবং পাকিস্তানি দালালরা একেকজন বর থেকে ৪০ লাখ থেকে ১ কোটি রুপি (২৫,০০০ থেকে ৬৫,০০০ ডলার) পর্যন্ত আয় করে। কিন্তু মেয়ের পরিবার পায় মাত্র দুই লাখ রুপি (প্রায় ১,৫০০ ডলার)।"

মানবপাচার সংক্রান্ত তদন্তে দীর্ঘদিন কাজ করা ওই কর্মকর্তা আরও জানান, অনেক নারী তদন্তকারীদের বলেছেন, তাঁদের জোর করে গর্ভধারণ করানো হতো, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করা হতো, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

যদিও এখনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, অন্তত একটি তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ উঠেছে—চীনে পাঠানো কিছু নারীর অঙ্গ কেটে নেওয়া হয়েছিল।

শুধু বাহিরের দেশই নয় চীনের ভিতরই এমন অনেক প্রতারণা হয় বলে জানায় দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যম।

২১ এপ্রিল ২০২৫, চীনা সংবাদমাধ্যম Sixth Tone প্রকাশ করে এই রিপোর্ট—"চীনের অনলাইন ও অফলাইন বিয়ের মাধ্যম বা 'ম্যাচমেকিং' খাতে ভয়াবহ প্রতারণার ঢেউ বইছে। একসময় ভালোবাসা ও বিবাহের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জনপ্রিয়তা পাওয়া এই খাত এখন বহু মানুষের আর্থিক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত এক বছরে এ

ধরনের প্রতারণার মামলায় ১,৫০০-রও বেশি মানুষকে অভিযুক্ত করেছে চীনের সর্বোচ্চ প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষ, সুপ্রিম পিপলস প্রোকিউরেটরেট (SPP)।

SPP-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশজুড়ে অসংখ্য ভুয়া ম্যাচমেকিং সংস্থা গড়ে উঠেছে, যেগুলোর নিবন্ধন বা লাইসেন্স যাচাইয়ের কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। ফলে যে কেউ চাইলে নিজেদের 'বিয়ের পরামর্শক' বা 'পেশাদার ম্যাচমেকার' পরিচয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে—এই নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতিই প্রতারকদের জন্য সহজ সুযোগ তৈরি করেছে।

প্রতারণার ধরনগুলোও নানা রকম। কেউ ধনী উদ্যোক্তা সেজে প্রেম বা বিনিয়োগের ফাঁদ পেতে কোটি কোটি ইউয়ান হাতিয়ে নিচ্ছে। কেউ আবার বিদেশি নারীদের পাচার করে সাজানো বিয়ের আয়োজন করছে—যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ই প্রতারণার শিকার হচ্ছে।

একটি ঘটনায় দেখা যায়, 'ওয়াং' নামের এক ম্যাচমেকার বিবাহিত নারীদের অবিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ৯ লাখ ইউয়ান হাতিয়ে নেয়।

আরেক ঘটনায়, 'ঝ্যাং' নামের এক ব্যক্তি বার ও কারাওকে ক্লাবের নারী কর্মীদের ব্যবহার করে ১২৮ জন পুরুষের কাছ থেকে ২৫ লাখ ইউয়ানেরও বেশি প্রতারণা করেন।

একইভাবে, এক নারী 'সু' নিজের বিবাহিত পরিচয় গোপন করে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে ভুয়া বিনিয়োগ ও পারিবারিক বিপদের অজুহাতে তার প্রেমিকের কাছ থেকে ৩০ লাখ ইউয়ান আত্মসাৎ করেন।

তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো—এগুলো এখন আর একক ব্যক্তির অপরাধ নয়, বরং সংগঠিত চক্রের হাত এতে স্পষ্ট।

SPP সম্প্রতি প্রকাশিত এক মামলায় দেখা গেছে, ৩২ সদস্যের একটি চক্র একাধিক অনলাইন ডেটিং প্ল্যাটফর্মে ধনী ব্যক্তির ছদ্মবেশে ভুয়া বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়ে মোট ১ কোটি ৬০ লাখ ইউয়ান প্রতারণা করে।

কিছু ম্যাচমেকিং সংস্থা এতটাই অপরাধচক্রে পরিণত হয়েছে যে তারা এখন ভুয়া ভিসা, অবৈধ সীমান্ত পারাপার ও নারী পাচারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

এক ঘটনায়, 'ওয়ান' নামের এক ব্যক্তি ৪৬ জন বিদেশি নারীকে পাচার করে একাধিক শহরে অবৈধ বিয়ের আয়োজন করেন—যাদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন। এই অপরাধ থেকে তিনি ১৩ লাখ ৩০ হাজার ইউয়ান আয় করেন।

মে ২৬, ২০২৫

গ্লোবাল টাইমসের সংবাদে বলা হয়,

বাংলাদেশে অবস্থানরত চীনা নাগরিকদের উদ্দেশে একটি সতর্কতা জারি করেছে ঢাকায় অবস্থিত চীনা দূতাবাস। দূতাবাসটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিদেশি নারীদের সঙ্গে বিয়ের ক্ষেত্রে চীনা নাগরিকদের অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে, কোনো বেআইনি বিবাহ

মধ্যস্থতাকারী বা ম্যাচমেকিং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হওয়া যাবে না এবং শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত 'ক্রস-বর্ডার ডেটিং' বা 'বিদেশি বউ খোঁজা'র মতো বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে দূরে থাকতে হবে।

দূতাবাসের ভাষায়, চীনা নাগরিকদের "বিদেশি স্ত্রী কেনা" ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে এবং বাংলাদেশে বিয়ের আগে দু'বার ভাবতে হবে।

চীনের আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে বিবাহের মধ্যস্থতা বা এ সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রমে জড়িত হতে পারে না। এ ধরনের কার্যক্রম প্রতারণা বা মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে তা ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে।

দূতাবাস আরও জানায়, অনলাইন বিয়ের প্রতারণা বা রোমান্স স্ক্যাম থেকে দূরে থাকা উচিত। এতে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, ব্যক্তিগত জীবনও ঝুঁকিতে পড়তে পারে। যাঁরা এমন প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত চীনের জননিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের মানবপাচারবিরোধী আইন অনুযায়ী, অবৈধ ক্রস-বর্ডার বিবাহে জড়িত কেউ মানবপাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারেন। দোষী সাব্যস্ত হলে সাত বছর থেকে আজীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, সঙ্গে কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা। যারা মানবপাচারে সহায়তা করে, তাদের তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।

দূতাবাস সতর্ক করেছে যে বাংলাদেশের বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় নিতে পারে। মানবপাচারের সন্দেহে গ্রেফতার হলে তদন্ত থেকে রায় পর্যন্ত সময় কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে, যা পরিবার ও ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

বিগত বছরের নানা অনুসন্ধান ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনগুলো আসলে চীনা দূতাবাসের এই সতর্কবার্তাকে উল্টোভাবে পড়তে বাধ্য করে। অর্থাৎ, এটি যেন চীনা নাগরিকদের উদ্দেশে নয়—বরং বাংলাদেশি নারীদের উদ্দেশেই এক নীরব সতর্কতা: সাবধান হোন, চীনের এই তথাকথিত "লাভারবয়"দের মায়ার জালে পা দিলে আপনার জীবন ও হতে পারে কাম্বোডিয়ার উত্তরাঞ্চলের ২২ বছর বয়সী তরুণী ন্যারির মতো।

অমুক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছি। এখন মুসলমান করে বিয়ে করা যাবে? ভাই, মুসলমান করে বিয়ে করার দ্বায়িত্ব আল্লাহ তোমাকে দেন নাই। তোমাকে দ্বায়িত্ব দিয়েছেন পরনারী থেকে দূরে থাকার। সে যে বাস্তবে মনের দিক থেকে ইসলাম গ্রহণ করবে; এর কী নিশ্চয়তা! বরং ৯০ ভাগ আশংকা–না, না ১০ ভাগও আমি রাখতে পারবো না; বরং ৯৮ ভাগ ৯৯ ভাগ আশংকা এইযে, সে তোমাকেই হিন্দু বানিয়ে ছাড়বে! কারণ মানুষের স্বভাব হলো, মানুষ যখন

একসঙ্গে থাকে, কারো সহবতে থাক, সংস্পর্শে থাকে আর সঙ্গীটা যদি ভালো হয় তখন তার ভালো স্বাভাবটা খারাপ লোকটা গ্রহণ করে একটু দেরিতে। সময় নেয়। পক্ষান্তরে ভালো লোকটা যদি সে নফসের গোলাম হয় তবে সে খারাপ লোকের স্বভাব গ্রহণ করে খুব দ্রুত। নেক আমল যায় উপরের দিকে আর বদ আমল যায় নিচের দিকে। বলেন তো গতি উপরের দিকে বেশি না নিচের দিকে? একটা জিনিস ছাড়লে সেটা নিচের দিকে তাড়াতাড়ি আসে আর উপরের দিকে দেরিতে যায়। এজন্যই মন্দের প্রভাব ভালো জিনিসের চাইতে দ্রুত বিস্তারকারী হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ফেসবুক ব্যবহার

সামাজিক যোগাযোগের অতি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল জগতে আগমন ঘটেছিল ফেসবুকের। কিন্তু ইতোমধ্যে ফেসবুক তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীকে মাদকাসক্তের ন্যায় নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছে। সময়ের অপচয়, আড্ডাবাজি, অশ্লীল পত্রালাপ, বেগানা ছেলে-মেয়ের ছবি আদান-প্রদান, বিনা কারণে প্রাণীর ফটো আপলোড করা এবং নাজায়েয প্রেম নিবেদনসহ যাবতীয় অনৈতিক ও অহেতুক কাজে লিপ্ত করা এখন এর বড় অবদান। বখাটে চরিত্র, বিভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রকাশের এক অতি সহজ মাধ্যম এ ফেসবুক। এর বিষাক্ত ছোবলে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যত বিপন্ন হতে চলেছে। পরকীয়ায় আসক্তির মাধ্যমে সংসার ভাঙ্গতে শুরু করেছে বহু দম্পতির। অশ্লীল কিংবা পরপুরুষ ও পরনারীর ছবি দেখা ছাড়া অহেতুক সময়ের অপচয় বাদ দিয়ে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যখন শতকরা একজনও নয় তখন ইসলামী শরীয়া মতে ফেসবুক ও এ জাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার জায়েয হতে পারে না। কারণ এতে উপকারের তুলনায় অপকার অনেক বেশি এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার রয়েছে পরিপূর্ণ ঝুকি। বৈধ যতটুকু ব্যবহার সম্ভব তার জন্য রয়েছে এর চেয়ে নিরাপদ বিকল্প। এ অবস্থায় শরীয়তের কোনো মূলনীতিই যোগাযোগের এ মাধ্যম ব্যবহারের বৈধতা দান করে না ।

কারো কারো ধারণায় বৈধ উপায়ে ফেসবুক ব্যবহার করে অতি সহজে অসংখ্য লোকের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো যায়। তাদের ধারণা সঠিক হলে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর অজুহাতে বর্তমান টেলিভিশনকে ফেসবুকের চেয়েও অধিক কার্যকর মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করতে হয়। অথচ বিবেক ঠিক থাকলে কেউ এমনটা বলতে পারবে না। আজ পর্যন্ত কোন হক্কানী আলেম বা মুফতী টিভির মাধ্যমে দীন প্রচারকে জায়েয ফতওয়া দেননি।

কারো কারো দাবী, ফেসবুক ব্যবহার করলে নাস্তিক-বদমায়েশদের হাত দিয়ে যে মল-মূত্র নির্গত হয় সে সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। তাদের

এ দাবী গ্রহণযোগ্য হলে কিছু দীনদার লোককে সিনেমা দেখার অনুমতি দিতে হয় (?) কেননা সিনেমার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বর্তমানে আরো বেশি হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তার প্রতিরোধে দীনদার কোন লোককে সিনেমা হলে গিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে বা দর্শকদেরকে তিন চিল্লার দাওয়াত দিতে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে? কখনও নয়।

কিছু অবিবেচক ফেসবুকের ব্যবহারকে দৈনিক পত্রিকা পড়ার সাথে তুলনা করতে চেষ্টা করে। অথচ পত্রিকায় যখন-তখন ছবি আপলোড করার সুযোগ নেই। পত্রিকার মাধ্যমে যার তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ার সুবিধা নেই। সহজে ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি করে রাত-বিরাতে আড্ডা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা পত্রিকার মূল প্রতিপাদ্য নয়। এতগুলো পার্থক্য থাকাবস্থায় ফেসবুককে দৈনিক পত্রিকার সাথে তুলনা করা মোটেও সঠিক নয়। মোটকথা, লাভ-ক্ষতি উভয়টি একত্রিত হলে শরীয়তের মূলনীতিতে ক্ষতির দিকটি প্রাধান্য পায়। শরয়ী প্রয়োজন না থাকলে গুনাহের ঝুঁকি তৈরি করে এমন বস্তুও পরিত্যাগ করতে হয়। কুরআন-হাদীসে অনুল্লেখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্বসাধারণের ব্যবহারের ভিত্তিতে বৈধ-অবৈধ বিবেচিত হয়। গুনাহের পথ বন্ধ করার স্বার্থে গুনাহের মাধ্যমকেও বন্ধ করা আবশ্যক। শরীয়তের স্পষ্ট এ সকল মূলনীতির আলোকে বর্তমান ফেসবুক ও এ জাতীয় গণমাধ্যমের ব্যবহার নাজায়েয ও হারাম। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা জায়েয হবে না। আর যারা না জেনে এ যাবত ব্যবহার করেছে তাদের জন্য এ অপশন বন্ধ করে অতীতের জন্য তওবা করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গুনাহমুক্ত যিন্দেগী নসীব করেন।

স্মার্ট টিভি ও ইন্টারনেট সিকিউরিটি: আপনার তথ্য কতটা নিরাপদ

টেলিভিশন, একসময় ছিল কেবল বিনোদনের মাধ্যম—সংবাদ, নাটক বা সিনেমা দেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সেটি ছিল একেবারেই একমুখী, যেখানে দর্শক শুধু দেখতেন, কিন্তু কিছু নিয়ন্ত্রণ বা যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। সময়ের পরিক্রমায় টেলিভিশন হয়ে উঠেছে স্মার্ট, সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের বিশাল জগতে। এখন আমরা টেলিভিশনে ইউটিউব, নেটফ্লিক্সসহ বিভিন্ন ওটিটি চ্যানেলে কনটেন্ট দেখার পাশাপাশি গেমও খেলি। ভয়েস কমান্ডে টিভি চালু করা, বন্ধ করা—সবই সম্ভব মাত্র কয়েকটি ক্লিক বা কথার মাধ্যমে।

তবে এই স্মার্ট টিভির আরাম ও সুবিধার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য বিপদ। কারণ, স্মার্ট টিভি এখন এক পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ডিভাইস, যেখানে থাকে ব্যক্তিগত তথ্য, অ্যাপ অ্যাকাউন্ট, এমনকি পেমেন্ট ডেটা। অর্থাৎ যেভাবে আপনার স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ হ্যাক হতে

পারে, সেভাবেই আপনার টিভিও হতে পারে সাইবার অপরাধীদের নতুন টার্গেট। সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাইবার সিকিউরিটি রিপোর্টে দেখা গেছে, স্মার্ট টিভির মাধ্যমে ম্যালওয়্যার, ডেটা লিক বা হ্যাকিংয়ের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে।

অনলাইন মার্কেটিং এর নামে বাজার-ভ্রমণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ এবং নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।' (মুসলিম)

অনলাইনে কেনাবেচা করা মৌলিকভাবে আপত্তিকর না। কিন্তু এখানে বড় একটা সমস্যা হলো, এক-একটা অনলাইন শপের ওয়েবসাইটে ঢুকলে বের হওয়াই মুশকিল। প্রতিটি প্রোডাক্টই মনে হবে জরুরি, সস্তা ও আকর্ষণীয়। প্রতারণার বিষয়টা বাদ দিলেও এতে বড় সমস্যা হলো, বেহুদা জিনিসও মানুষ জরুরি ভেবে কিনছে। বিপুল সম্ভারের কারণে মানুষ দরকারের বাইরের পণ্যও কিনতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এখানে থাকলে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মে। আর বেপর্দা পরিবেশ তো আছেই। বিজ্ঞাপন ও পণ্যের বিন্যাসের কারণে মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হচ্ছে। এমন বস্তুকেও নিজের জন্য জরুরি ভাবছে, যা বাস্তবে কখনোই তার লাগবে না এভাবে কেনাকাটা করে মানুষের অপচয়ের হাত বড় হবে। বাড়তি খরচ প্রাজেনা আর অসৎ ইনকামের দিকে নিয়ে যাবে।

সময়ের অপচয় অনলাইন মার্কেটে একটা অনালোচিত বিষয়। ঘণ্টার ব্যার ঘন্টা এখানে ব্যয় হয়ে যায়। একেকটা পণ্য দেখা, মূল্য যাচাই করা, একই গানের আর কী আছে তা দেখা, একই মূল্যের এরচেয়ে ভালো কী পাওয়া বিশ্লেষণ। এসবে প্রতিদিন অগণিত মূল্যবান সময় খরচ হয়ে যায়। সময়-যা হব তা খোঁজা। এক ওয়েব-মার্কেটের সাথে অন্যটার দামের তুলনামূলক ছিল এই দুনিয়াবি জীবনের মূল পুজি, যা হারিয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে পাওয়া যাবে না, যার ক্ষতি কখনো পূরণ করা যায় না।

লজ্জা হ্রাস পাওয়া

যারা নিয়মিত টিভি-সিনেমা দেখে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে লজ্জা কমতে কমতে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ভয়ংকর অশ্লীল দৃশ্যও পরিবারের সবাই একসাথে দেখতে পারে। এসব খারাপি থেকে দ্বীনদার লোকজন অন্তত নিরাপদ। কমপক্ষে এটুকু লজ্জাবোধ একজন দ্বীনদার মানুষের থেকেই থাকে। কিন্তু ইন্টারনেটের বিস্তার এখন দ্বীনদারদের মাঝেও লজ্জাহীনতা তৈরি করছে।

অনিচ্ছাকৃত চোখে পড়া অশ্লীলতা চোখকে অভ্যস্ত করে তুলছে। একসময় অপরাধবোধ আর খারাপ লাগার অনুভূতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবাধে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাতায়াতের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে; এমন-সব ওয়েবসাইট, যেখানে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ রয়েছে।

অভ্যস্ততা এমন এক খারাপ ব্যাপার, যার মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা মনুষও নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে গুনাহের সাথে আপস করে ফেলে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। মেনে নেওয়া হয়। অথচ একই ব্যক্তি হয়তো একসময় কঠোরভাবে নজরের হেফাজত করত। আজ অভ্যস্ততার মারপ্যাঁচে টিস সেই তাকওয়াপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না।

আরেকটা দিক হলো পর্দানশীন নারীদের স্বামীরা পশ্চিমা নারী ও বেহায়া পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে নিজ স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। অবাধে ইন্টারনেট চালালে এসব চিত্র সামনে আসবেই। দিনে দিনে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। কখনো কখনো নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এতে মশগুলও হয়ে পড়বে। এটাই স্বাভাবিক। নিয়মিত এসব বেপর্দা পরিবেশে থাকার যে প্রভাব অন্তরে পড়বে, তা অকল্পনীয়। উলামায়ে কেরাম বলেন, বান্দা এসব গুনাহের কারণে অনেক আমলের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

শায়খ আলী তানতাভী রহ. এর কথা ভাবি, তিনি তো ৫০-৬০ বছর আগে থেকে অবিবাহিতদের চরিত্র হেফাজতের জন্য লিখেছেন। তখন স্মার্টফোন ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না, রাস্তার নারীদের বেহায়াপনা এখনকার মতো ছিল না। হায়, আজকের অবস্থা তিনি যদি দেখতেন! আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরানী করুন। আমীন।

বেহুদা কাজ

উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ একসময় দ্বীনের স্বার্থে অনলাইনে পা রেখেছিলেন। যদিও সবার নিয়ত এক ছিল না, কিন্তু একটা প্রল্লেখযোগ্য অংশ দ্বীনের দাওয়াতের প্রয়োজনেই এতে যুক্ত হয়েছিলেন। যুক্ত হয়েছিলেন চলমান বিশ্ব সম্পর্কে খোঁজখবর রাখাকে একটা জরুরত মনে করে। আর একটা পর্যায় পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট।

কিন্তু গত বছরগুলোতে আমাদের নিয়তের ওপর আমরা কতটা টিকে থাকতে পেরেছি তা ভাবার বিষয়। শুরুটা বা শুরুর বছরটা হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই তথ্যের মহাসম্ভার ও উত্তাল তরঙ্গ গ্রাস করে নিয়েছে বেশির ভাগ মানুষের নিয়ত। এখন বরং আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। আগে আমরা মোবাইল ফোন চালাতাম, এখন মোবাইল ফোন আমাদের চালাচ্ছে। অজানা মোহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি। সময়ের যেন কোনো মূল্য নেই। এ যেন অফুরন্ত জান্নাতী সময়। এটা যেন সেই সময় না, যা কখনো ফিরে আসবে না।

ফেসবুকে ও ইউটিউবে ব্যস্ত থাকা একটা সাধারণ ব্যস্ততা হয়ে পাঁড়িয়েছে। এর কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এর কোনো গন্তব্য নেই। এর কোনো শেষ নেই। এই সফরের উদ্দেশ্য হলো শুধু চলা এবং নিরন্তর চলতেই থাকা।

হ্যাঁ, এই ব্যস্ততা এখন বেশির ভাগ মানুষের জন্য আর দ্বীনী ব্যস্ততা নয়; এটি এখন সময় কাটানোর একটা নিরেট দুনিয়াবি মাধ্যম। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এর সাথে অন্যান্য বিনোদন-ব্যবস্থার পার্থক্য খুব বেশি নয়।

যারা সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে এসব অ্যাপ ব্যবহার করছেন, তাদের জন্য এটা নিতান্ত বেহুদা কাজ। নির্দোষ বেহুদা কাজ নয়; বরং এতে আছে গুনাহের প্রচুর সম্ভাবনা। একজন মুত্তাকী মানুষ নিশ্চয় এটা উপলব্ধি করবেন।

এই উপলব্ধি থেকেই অনেক মানুষ এই চক্র থেকে বের হতে সচেষ্ট হন। একজন দ্বীনদার মানুষ দেখেন, তার মূল্যবান সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে। তিনি তিলাওয়াতের সময় পাচ্ছেন না, বইপত্র পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন না, যিকির-আযকারের ফুরসত মিলছে না। তার অবচেতন মন তাকে সতর্ক করতে থাকে। কেউ কেউ এসব ত্যাগ করতে সফল হন, আবার কারও পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় বড্ড কঠিন।

নবীদের পবিত্র জীবনীর বিকৃত উপস্থাপনঃ প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এখন ঈমানী দায়িত্ব!

প্রতিটি নবী মাসুম তথা নিষ্পাপ। যুগে যুগে নবী রাসূলদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাঠিয়েছিলেন জাতির হেদায়াতের বার্তাবাহক হিসেবে। নবীদের জীবনীতে রয়েছে উম্মতের জন্য হেদায়াত ও জান্নাতপ্রাপ্তির পথ। পবিত্র কুরআন তা'ই তার পাতায় পাতায় পূর্ববর্তী নবীদের বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছে।

কিন্তু মজার বিষয় হল, কুরআন জীবনী বলার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতার সাথে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো বাদ দিয়ে শুধু মূল বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছে। যা প্রমাণ করে অপ্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থাপন করা মাকসাদে এলাহী নয়। মানুষের হেদায়াতের জন্য যা উপকারী, তা পেশ করাই মহান রবের উদ্দেশ্য। কাহিনীর বাঁকে বাঁকে বিনোদনের খোরাক জোগানো রব্বে কারীমের উদ্দিষ্ট ছিল না।

হাদীসের মাঝেও কিছু প্রয়োজনীয় ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এছাড়া গ্রহণযোগ্য কিছু তারীখ ও সীরাতের কিতাবে এ সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। সেখানেও মাকসাদ বিনোদন নয়। বিষয়টির পূর্ণ অনুধাবনই উদ্দেশ্য।

নবীদের কাহিনীর নামে বাংলা ভাষায় অনেক বই রচিত হয়েছে। যা বাজারে রাস্তায়, ফুটপাথে বিভিন্ন যায়গায় কিনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যার অধিকাংশই বিকৃত ও মনগড়া কাহিনী। বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী, অনির্ভরযোগ্য সূত্রের বর্ণনা একত্রিত করে চটকদার শিরোনামে বিক্রি চলছে ইউসুফ জুলেখা, বিবি হাজেরা, নবী সুলাইমান, আইউব নবীর কিচ্ছা, বাবা আদম, বিবি আছিয়া ইত্যাদি বই।

উলামাদের বয়ান ও লিখনীর মাধ্যমে এসব বইয়ের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। যদিও যতোটা প্রয়োজন ছিল ততোটা হয়ে উঠেনি।

কিন্তু উক্ত বিষয়টি আরো ভয়াবহ রূপে এখন আবির্ভূত হয়েছে ফিল্মের সূরতে। কোন নবীর নামে গুগুলে বা ইউটিউবে সার্চ দিলেই পাওয়া যাচ্ছে তাদের নামে নির্মিত বিভিন্ন ছায়াছবি। যাতে অশালীন পোশাকে উপস্থিত বিভিন্ন অভিনেত্রী অভিনেতাদের মাধ্যমে চিত্রায়িত নবীদের পবিত্র জীবন। যার অধিকাংশই বিকৃত ও কল্পনাপ্রসূত কাহিনীতে ভরপুর।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল আরো ভয়াবহ তথ্য। এসব ফিল্ম ডিরেক্টর হয়তো খৃষ্টান নতুবা ইরানী শিয়া কাফির। অমুসলিমদের হাতে নির্মিত মুসলিমদের কিতাব কুরআনে বর্ণিত নবীদের কাহিনী কিভাবে অবিকৃত থাকতে পারে? একি সম্ভব?

আমাদের পর্যবেক্ষণে যা উঠে এসেছেঃ

১

এসব ফিল্ম দ্বারা কিছু ফাসিক অভিনেতাদের নবীদের নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হচ্ছে। অথচ উক্ত ফাসিকের চেহারায় সেই শ্রেষ্ঠ নবীদের চেহারার ছিটেফোঁটা ও নেই।

এর মানে এরকম ফাসিক ও কথিত সুন্দর চেহারার লোকটির নোংরা চেহারাকে নবীর চেহারা সাব্যস্ত করে মাসুম নবীদের কলংকিত করা হচ্ছে।

২

সমস্ত নবীগণ নিষ্পাপ মাসূম ছিলেন। তাদের সেই পূত পবিত্র ব্যক্তিসত্বার চরিত্র রূপদান করছে কতিপয় ফাসিক অভিনেতা। যাদের ব্যক্তিজীবন পাপ ও গোনাহে পূর্ণ। এসব ফাসিক ব্যক্তিরা অভিনয়ের প্রয়োজনে সাজছে নবী। কি জঘন্য ও ভয়াবহ ধৃষ্টতা। একজন ফাসিক পাপিষ্ঠ অভিনেতা নিষ্পাপ নবীদের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে চরমভাবে নবীদের শানে গোস্তাখী করছে।

৩

যারা আবু জাহাল ও আবু লাহাবের ভূমিকায় অভিনয় করবে, তারা গল্পের প্রয়োজনে আল্লাহ, নবীও সাহাবীদের গালাগাল করবে, দোষ বলবে, যা কোন মুসলমানের জন্য বলা জায়েজ নয়। যা সুস্পষ্ট কুফরী।

৪

ইহুদী ও খৃষ্টানদের বা ইরানী শিয়াদের নির্মিত এসব ফিল্ম অধিকাংশই বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। কাল্পনিক কাহিনী ফেঁদে প্রকৃত ইতিহাসকে পাল্টে দেবারও ঘৃণ্য কর্ম পরিচালিত হচ্ছে এসব ছায়াছবির মাধ্যমে।

এছাড়া ইসলামের মহান বীর সৈনিকদের আদর্শিক জীবনীকে বিকৃত করে যৌন লিপ্সু চরিত্রে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিছু কিছু ড্রামা সিরিজে।

অবাক হবার বিষয় হল, এসব বিকৃত ও অনেক ক্ষেত্রেই অশালীন ফিল্মগুলো আমাদের দেশীয় কিছু টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে অবলীলায় সম্প্রচারিত হচ্ছে। কোন বাঁধা ও প্রতিবাদ ছাড়াই দিনের পর দিন চলছে অনুষ্ঠানগুলো। আসহাবে কাহাফ, ইউসুফ জুলেখা, ইত্যাদি নামে চলছে প্রোগ্রাম। ইউরোপ বিজয়ী মুসলিম বিজেতা, উসমানী খিলাফতের বীর সিপাহসালার সুলতান সুলাইমানকে নারীলোভী হিসেবে দেখানো হচ্ছে "সুলতান সুলেমান" নামক সিরিয়ালে। সিডির বাজার সয়লাব নবীদের বিকৃত ইতিহাস নির্ভর খৃষ্টান ও ইরানী শিয়া নির্মিত মুভিতে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে। সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করতে এটি একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে নবীদের জীবনীকে এভাবে জঘন্যভাবে উপস্থাপন করা, ফাসিক অভিনেতাদের দিয়ে নবীদের পবিত্র জীবনীকে রূপদান করা অমার্জনীয় অপরাধ। সুস্পষ্ট ধর্ম অবমাননা।

দায়িত্বশীল উলামাগণকে এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ নেবার জন্য আহবান করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে।

বর্হিরাষ্ট্রে নির্মিত এসব বিকৃত মুভি বাংলাদেশে কিভাবে প্রবেশ করছে?

আমদানী রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কি?

নবীদের জীবনীর মত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যাচাই ছাড়াই একটি মুসলিম প্রধান দেশে কিভাবে সম্প্রচারের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে?

ধর্ম বিকৃতি ও অবমাননার অভিযোগে দ্রুত এসব ফিল্ম সম্প্রচার বন্ধ করা হোক। রুখে দেয়া হোক এসব মুভির আমদানী।

প্রতিটি সচেতন মুসলিমের উচিত এ বিষয়ে আওয়াজ তোলার। প্রতিবাদী হওয়া। লিখনী বয়ান, বক্তৃতা, আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মাবমাননার এ জঘন্য কর্মের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করা। রুখে দেয়া এসব ফিল্মের সম্প্রচার।

সংবাদ-মাধ্যমের রূপরেখা : ইসলামী কাঠামো

কয়েকবছর আগের কথা, ভারতের একজন খ্যাতিমান ইসলামী পণ্ডিত ও লেখকের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য 'টাইম ম্যাগাজিন'-এর একজন ভারতীয় রিপোর্টার আসলেন। সাক্ষাৎকারের মূল বিষয় ছিল, ইসলামে নারীর মর্যাদা। সচরাচর যেসব কথা জানতে চাওয়া হয়, রিপোর্টার ভদ্রমহিলা সেইসব প্রশ্নই উত্থাপন করলেন এবং মাওলানার প্রতিটি বক্তব্য রেকর্ড করে নিলেন। কয়েকসপ্তাহ পর পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার অছিলায় ভদ্রমহিলা আবার এলেন; এবং সেই একই প্রশ্ন অনেকটা বক্র ও বিকৃতভাবে মাওলানার কাছে তুলে ধরলেন। এটাই শেষ নয়, মহিলা আবারও আসলেন। মাওলানা এবার বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপার কী?' মহিলা কিছুটা গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আমরা আসলে কোনোরূপ ভুল রাখতে চাই না'। এই জবাবে মাওলানা এতবেশি মুগ্ধ ও অভিভূত হন যে, তিনি সত্যানুসন্ধানে নিখুঁত ও নিষ্পাপ পেশাদারিত্বের উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনার কথা মুসলমানদের কাছে প্রায়ই বর্ণনা করতেন। অবশ্য, ইসলামে নারীর কী অবস্থান, এ সম্পর্কে লেখাটি যখন প্রকাশিত হল, দেখা গেল, ইসলামের বিরুদ্ধে নারী-বিষয়ক সকল অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক শ্রম স্বীকার করে রিপোর্টার যে জবাবগুলি একজন মুসলিম পণ্ডিতের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তার কোনো একটি কথাও লেখাটির মধ্যে নেই।

আসলে 'টাইম ম্যাগাজিন'টি প্রপাগান্ডার সেই চিরাচরিত নীতিই অনুসরণ করেছে : প্রথমে সত্যগুলিকে পুরোপুরি জানো, তারপর যতটা সম্ভব ইচ্ছামত বিকৃত করো। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক। বর্তমান বিশ্বে কতিপয় সফলতম সাময়িকীর অন্যতম হল 'টাইম ম্যাগাজিন'। যদিও এই ম্যাগাজিন ইসলামবিরোধী প্রচার-প্রচারণা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারা বিশ্বে, এমনকি মুসলিম দেশসমূহেও তাকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এখানে প্রকাশিত কোনো বিশেষ পরিচ্ছেদ অথবা নির্দিষ্ট প্রবন্ধ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কখনো কখনো বিবাদ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তারপরও তাদের কাছে এই ম্যাগাজিন সাংবাদিকতার সার্বিক আদর্শস্বরূপ।

প্রশ্ন না উঠে পারে না, আসলে কীভাবে কী চলছে?

এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে শিল্পবিপ্লব-উদ্ভ~ত সমাজমানস ও সেইসমাজ থেকে সাংবাদিকতার বিবর্তনের মধ্যে। দু'টি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলস্বরূপ আধুনিক সাংবাদিকতার শুরু ও বিকাশ: একটি হলো মুদ্রণব্যবস্থা এবং অপরটি টেলিগ্রাফ। এই দুইয়ের সম্মিলনে মুদ্রিত তথ্যসমূহ অসম্ভব দ্রুতগতিতে দূরে-দূরান্তরে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়ে উঠল।

প্রথমটির সূত্রপাত জার্মানীতে এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নেইল পোস্টম্যান তাঁর ÔAmusing ourselves to DeathÕ (১৯৮৫) বইটিতে বর্ণনা করেন, এটা মার্কিন অগ্রগতি ও উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত; যা সারা পৃথিবী থেকে প্রসঙ্গ-বিবর্জিত তথ্য আহরণ করে দৈনিকসংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যাকে অভাবনীয় পর্যায়ে নিয়ে গেল এবং এটাই হয়ে উঠল প্রাত্যহিক সংবাদ `The news of the day'। পোস্টম্যান-এর যুক্তি, 'টেলিগ্রাফই অপ্রাসঙ্গিক ও অসত্য তথ্যকে এক ধরণের বৈধতা দান করল; অর্থাৎ এমন ধারণাকে প্রবল করে তুলল যে, তথ্যের যে মূল্যমান, তার সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা সিদ্ধান্তের কোনো সংযোগ রক্ষার প্রয়োজন পড়ে না; তাকে শুধু অভিনবত্ব ও আগ্রহ ও কৌতহল সৃষ্টি করতে হবে।

টেলিগ্রাফ এমন এক সমাজে বিকাশ লাভ করল, যেখানে তার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণরূপে অবাধ; যাকে গালগল্প, অসার-কথাবার্তা, মিথ্যা-কলঙ্কলেপন, অপবাদ-পরনিন্দা ইত্যাদি নিয়ে কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং এই সব নিয়েই শোষণের এক বিশাল বাজার গড়ে উঠল। এক্ষেত্রে সমাজ যেরকম চেয়েছিল, টেলিগ্রাফ তাকেই সহজ করে তুলল। এই বাজার স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম উদ্যোক্তারাই দখল করে তুললো; যাদের মধ্যে একজন ছিলেন জোসেফ পুলিৎজার। 'পুলিৎজার' পুরস্কার আজ একজন সাংবাদিকের জন্য আমেরিকার সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক স্বীকৃতি। এই পুলিৎজার দায়িত্বগ্রহণের পর 'New york world-এর প্রচারসংখ্যা মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৫ হাজার থেকে আড়াইলাখে উন্নীত করেছিলেন, যা ছিল তৎকালীন বিশ্বে সর্বোচ্চ।

কিন্তু কীভাবে তার পক্ষে এটা সম্ভব হল? ব্রিটানিকা বলছে,চমক সৃষ্টি এবং ধারাবাহিক উদ্দেশ্যমূলক অভিযানকে অবলম্বন করে পুলিৎজার আবেগ ও আদর্শের সমন্বয়ে এতদিনের প্রতিষ্ঠিত রীতি ও নিয়মে নতুন প্রাণশক্তি জাগিয়ে দিলেন"। এক্ষেত্রে অন্য একজন সফল পথিকৃৎ উইলিয়াম হার্স্ট। ব্রিটানিকার মতে,তিনি যে কোনো মূল্যে প্রচারসংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে ছিলেন সংকল্পবদ্ধ, এমনকি এজন্য সংবাদের মোড়কে মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

'পেনি প্রেস'এবং ট্যাবলয়েডও বিস্ময়কর বাণিজ্যিক সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে একই নীতি ও কৌশল অবলম্বন করে। এবং এইভাবেই আধুনিক প্রচারযন্ত্রের বিকাশ সাধিত হয়, যেখানে উত্তেজনাকর আবেগপ্রবণতা এবং বিনোদনই মুখ্য হয়ে ওঠে; পক্ষান্তরে মানুষের উপযোগী কর্মপ্রবাহের জন্য যে সকল তথ্য আবশ্যক, সেই বিষয়টি মারাত্মকভাবে স্তিমিত হয়ে আসে। পোস্টম্যান লিখেছে, 'আমাদের অধিকাংশ প্রাত্যহিক সংবাদই জড় ও নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির, সেখানে এমনসব তথ্যের সমাবেশ ঘটে যা শুধু অর্থহীন কথা সৃষ্টি করে, কিন্তু কোনোরূপ তাৎপর্যময় কর্মপ্রবাহের দিকে পরিচালিত করে না"।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির একটি শক্তিশালী ভ‚মিকা ও কার্যক্রম বিদ্যমান। অনেকটা যেন বিমানবালাদের (Airhostess) মত, মুসলিম দেশে দেশে যাদের আনাগোনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, কোনো প্রশ্নও ওঠে না। সংবাদপত্রও এইরকমই, যাকে তার অন্ধ ও আগ্রহী অনুসারীদের দ্বারা অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন লাভ করতে কোনো প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতে হয় না।

বৃটিশ-ভারতে সংবাদ সরবরাহের ক্ষেত্রে 'পেনি প্রেস'-এর একটি প্রেরণাদায়ক ভ‚মিকা ছিল। তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কোথাও না ছিল ছাপাখানা, না ছিল টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা (আর অন্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির তো কোনো কথাই ওঠে না)। কিন্তু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে নাম ও দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম থেকে ঠিকই

গৃহীত হয়েছে। আরো বড় কথা, পশ্চিমাদের নিকট থেকে সংবাদ-এর সংজ্ঞাও (Definition) মুসলমান গ্রহণ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, পাশ্চাত্যে সংবাদ-এর সংজ্ঞা বহুলাংশে অদ্ভ‚ত ও অভিনবত্বের সঙ্গে যুক্ত (মানুষ কুকুরকে কামড়ে দিয়েছে); আর যুক্ত ছিল কৌতূহলের সঙ্গে (আজকে আমরা যা জানি, গতকাল তা জানতাম না)।

এই নিশ্চিত বক্তব্য যে কত সত্য, সেটা পরীক্ষা করার জন্য মুসলিম বিশ্বে প্রকাশিত অদ্যকার যে কোনো সংবাদপত্র এবং সংবাদ সাময়িকীর প্রতি শুধু একবার দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট। অবশ্যই এটা সত্য যে, মাঝে মধ্যে আমরা কিছু ধর্মীয় প্রবন্ধ এবং কিছু রাজনৈতিক মতামতও দেখতে পাই; কিন্তু সেটা নিতান্তই আমাদের মুসলমানিত্বের শ্লাঘা রক্ষার্থে। কিন্তু আমাদের তো গভীরভাবে এই চিন্তা ও বিবেচনাও করা আবশ্যক যে, সাংবাদিকতার লক্ষ্য, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? এবং সাংবাদিকতার গঠন-কাঠামো কেমন হওয়া উচিত? নিশ্চয়ই এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদ ও সাংবাদিকতা একটি প্রতিষ্ঠান সদৃশ; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বস্তু ও আত্মিক মান কী? এবং কী কারণে এই প্রতিষ্ঠান শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়? সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? কোনো বিষয়ে ইসলামী পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর অবস্থান কোথায়? লেখা ও লেখা ছাপানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? সংবাদ যে সংবাদ, এটা কীভাবে নিরূপিত হয়? মুদ্রণের যোগ্য কি অযোগ্য এটাই বা কীভাবে নির্ধারিত হয়, এবং তার সঠিক মাপকাঠি কী? মুসলিম সমাজে একজন সাংবাদিকের প্রকৃত অধিকার ও দায়িত্ব কতখানি? সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

৫০ বছরেরও অধিককাল পূর্বে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (পাকিস্তানের মুফতি) 'আদাবুল-আখবার' (The News Protocol) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা ও পঠনকাঠামো সম্পর্কে প্রবন্ধটি ছিল একটি বিরল ও মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ। তৎকালীন সময়ে মুসলিম সাংবাদিকদের যে আবেগ ও সংবেদনশীলতা সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'এমন অনেকে আছেন যারা এটাকে (সাংবাদিকতা) হারাম বা নিষিদ্ধ

বিবেচনা করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উচিত এই পেশার হালাল ও হারাম অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ উভয় দিক নিয়েই উদ্বিগ্ন হওয়া'।

যারা এ বিষয়ে যথার্থই উদ্বিগ্ন, তারা এই শক্তিশালী পেশা সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ.-এর প্রবন্ধ থেকে উপযুক্ত পথনির্দেশনা লাভ করতে পারেন, যা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী গঠন কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হতে পারে। মুফতী মুহাম্মাদ শাফী রাহ. দুটি হাদীস উল্লেখ করেন, যা থেকে সাংবাদিকতায় ইসলামী রূপরেখার একটি ভিত্তি তৈরী করা সম্ভব। উদ্ধ,,ত প্রথমাংশটি তিরমিযী শরীফ-এর একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে গৃহীত, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম-এর প্রাত্যহিক কর্মসূচীর কথা বর্ণিত হয়েছে। একজন সাহাবী রা.-এর উক্তি থেকে বর্ণিত, 'আমি জানতে চাইলাম, গৃহের বাইরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম-এর ব্যবহার ও কার্যকলাপ কেমন ছিল? হিন্দ বিন হালা জবাবে বললেন, 'উপকারী ও প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তিনি সর্বদা নীরবই থাকতেন। এবং তিনি তাঁর অনুসারী-সঙ্গীসাথীদের খোঁজখবর নিতেন। আর জনগণের মধ্যে কোথায় কী ঘটেছে, সে বিষয়েও জানতে চাইতেন। সবকিছু জানার পর কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে বিষয়ে মন্তব্য করতেন।

দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম যখন কোনো সাহাবীকে পরপর তিনদিন দেখতে না পেতেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে খবর নিতেন। সেই সাহাবী যদি দূরবর্তী কোনো সফরে থাকতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তার জন্য দুআ করতেন; আর যদি শহরেই থাকতেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন। যদি দেখতেন যে, তিনি অসুস্থ তাহলে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চাইতেন'। (-কানযুল উম্মাল, হাদীস ১৮৪৮৩)

এই দুটি হাদীসের আলোকে মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. বলেন, মুসলিম উম্মাহর অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত ওয়াকিফহাল থাকা সুন্নত। আজকের দিনে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের ওপর বিশেষভাবে এই দায়িত্ব এসে পড়েছে। অধিকন্তু সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ তুলে ধরা, মুসলমানদের দাবি ও অধিকারসমূহ উত্থাপন করা এবং ইসলামের পয়গামকে জনসমক্ষে পৌঁছে দেয়াও সংবাদপত্রের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আসলে যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করা আবশ্যক তা হল, শুধু পেশা নয়, সাংবাদিকতা একটি দায়িত্ব। আর এই দায়িত্বপালনে নির্যাতিতের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা, দুর্বল ও দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করা, এবং পীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো একজন সাংবাদিকের অপরিহার্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এসব কোনো কিছুই যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত বিপদাপন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিত। এ থেকে বোঝা যায়, সংবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মের মধ্যে একটি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ আনুপাতিক সমন্বয় বিদ্যমান থাকা জরুরি

ও সমীচীন। অথচ বর্তমান যে প্রচারজগৎ, সেখানে প্রচার ও কর্মের সম্পর্ক একেবারে শূন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু চমক ও চোখ ঝলসানো নব নব প্রযুক্তির কারণে এই কঠিন বিভেদ ও শূণ্যতার দিকে আমরা খুব কমই দৃষ্টিপাত করি। মুফতী মুহাম্মাদ শফী ইসলামের মৌলিক নীতির কথাও বর্ণনা করেছেন, যা সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট যেকোনো সমস্যা ও আলোচনার জন্য ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারে : লিখিত বক্তব্যও মৌখিক কথাবার্তার মত একই নিয়মের অধীন। এবং সাধারণত মৌখিক বা লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই একই নির্দেশ, সে সাংবাদিকই হোক আর যে-ই হোক। কোনো কিছু যদি পুণ্যকর্ম হয়, সেটা লিখিত বা মৌখিক উভয়ত, একইরকম পুণ্যকর্ম। আর যা হারাম বা নিষিদ্ধ তা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অবশ্য লিখিত বক্তব্য যেহেতু অধিকতর স্থায়ী এবং তার বিস্তৃতির মাত্রাও অধিক, অতএব তার ভালোমন্দের স্থায়িত্ব এবং বিস্তৃতিও বাস্তবক্ষেত্রে অধিক। অর্থাৎ 'ভাল' হলে খুবই ভালো। আর নিকৃষ্ট হলে খুবই নিকৃষ্ট। আর এক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাস্তির মাত্রাও আনুপাতিকভাবে অধিক।

স্বাভাবিক নীতি ও আচরণ, যা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেখানে সাংবাদিকদের জন্য ইসলামী শরীআহ কিছুটা শৈথিল্য বা অব্যাহতির অবকাশ রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণভাবে কারো অসাক্ষাতে নিন্দা সবার জন্যই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; কিন্তু সাংবাদিকরা এ-ক্ষেত্রে কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত। কতটা এবং কীভাবে মুক্ত সে কথায় পরে আসছি। কারণ সর্বাগ্রে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল মুসলমানের বাক্যালাপ ও কথাবার্তা কী নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, সে বিষয়ে ইসলামী শরীয়াহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাউকে উপহাস বা বিদ্রyপ করা আল কুরআনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে:

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। কারণ, হতে পারে দ্বিতীয় ব্যক্তি (যাকে উপহাস করা হচ্ছে) প্রথম ব্যক্তির তুলনায় উত্তম। কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে বিদ্রyপ করবে না; হতে পারে দ্বিতীয় জন প্রথম জন অপেক্ষা উত্তম। কারো দুর্নাম করো না এবং কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রyপ করা থেকে বিরত থাকবে; এবং একে অপরকে নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক নামে সম্বোধন করবে না'। (-সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১)

এটা সাধারণভাবে অনুসরণীয় আবশ্যকীয় নীতি; যা থেকে সংবাদপত্রের কোনো কলামিস্ট তার নিজস্ব কোনো গুণ বা দক্ষতা প্রদর্শনের অছিলায় নিজেকে মুক্ত ভাবতে পারে না। অধিকন্তু, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এমন একটি পবিত্র মানবাধিকার, যা কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না, সাংবাদিক হলেও পারে না। আল্লাহর বিধান সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য; সে রাজপুত্রই হোক আর দুঃস্থ অনাথই হোক। কারণ আলকুরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে : 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো গৃহে অনুমতি ছাড়া এবং সালাম

না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে করে তোমরা মনে রাখতে পারো'। (-সুরা আননূর :২৭)

একইভাবে কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ একটি পাপ, যা সাধারণ মানুষের জন্য যেমন সত্য, লেখকদের জন্যও সত্য। আরেকটি কথা, অন্যের দোষ ও পাপকে আড়াল করা সবারই অবশ্যকর্তব্য। রিপোর্টার বা সংবাদপত্রের কোনো প্রতিবেদকের কাছে মুসলমান ভাইয়ের কোনো দোষ গোপন করার এই বিষয়টি আরো বেশি গুরত্বের সঙ্গে গৃহীত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজ এই কথাটি বিশেষভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে; যদিও ইসলামী শরীআহ বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। একটি হাদীস বলছে : 'হে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা, তোমরা ঈমানের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছো, কিন্তু যাদের অন্তরে ঈমান এখনো প্রবেশ করেনি, তারা যেন কোনো মুসলমান ভাইয়ের পশ্চাতে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে, কারো দোষ অনুসন্ধান না করে। কারণ কেউ যদি অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যদি কারো দোষ অনুসন্ধান করেন তাহলে তিনি (আল্লাহ) তাকে তার নিজ গৃহেই অসম্মানিত করবেন'। (-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৩৬)

এই একটি হাদীসই যথেষ্ট যা সমস্ত ট্যাবলয়েড-সাংবাদিকতার ভিত্তি ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে। এখানে একটি মাত্র ব্যতিক্রম, এবং তা হল কোনো ব্যক্তির আপত্তিকর আচরণ যদি অন্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে; এই ধরণের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে সতর্ক করা শুধু অনুমোদনযোগ্য নয় রীতিমত প্রয়োজনীয়।

'আদাবুল আখবার'-এ আরো কতিপয় দিকনির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম যে-ই হোক কাউকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। আর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এই অধিকার আছে যে, সে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য-জনসমক্ষে অভিযোগ তুলে ধরতে পারে। আল কুরআনও এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুমোদন করেছে। বলা হচ্ছে : 'আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যভাবে মন্দকথা বলা পছন্দ করেন না; তবে যে ব্যক্তির উপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা। আল্লাহ তাআলা ভালোভাবেই শোনেন ও জানেন'। (-সুরা আন নিসা ৪ : ১৪৮)

অতএব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য-প্রতিবাদে কোনো বাধা নেই; এবং এটা যদি অত্যাচারিত ব্যক্তির জন্য সহায়ক হয়, তাহলে তা করা সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কোনো রিপোর্ট বা প্রতিবেদন যদি সত্যও হয়, তাহলেও তা প্রকাশ করা উচিত নয়, যদি তা সমাজ ও সামাজিক স্বার্থে আঘাত করে। এমন কোনো বস্তু বা কাজের বিজ্ঞাপন প্রচার করা ঠিক নয়, যা শরীআহর বিবেচনায় উক্ত বস্তু বা বিষয় নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অপরাধ সংক্রান্ত রিপোর্ট, যা বর্তমান সংবাদপত্রের একটি সরস অংশ, মুফতী শফী রাহ. এ বিষয়ে অন্যত্র ঘোষণা করেন যে, এই ধরণের রিপোর্ট চলতি রীতিতে প্রকাশ করা আদৌ অনুমোদনযোগ্য নয়। কারণ অপরাধ কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অপরাধ-

প্রবণতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। অপরাধ সংক্রান্ত রিপোর্ট বা প্রতিবেদন এমনভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাতে সমাজ অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং অপরাধকর্ম দমিত ও নিরুৎসাহিত হয়।

সাংবাদিকতার জন্য একটি কার্যকর ইসলামী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। মুসলমানদের প্রশ্নে টাইম (The time) এবং অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়ার কার্যক্রমে যে নীতি অনুসৃত হয় তা হল 'প্রীতি ও বিদ্বেষ' নীতি (Love-hate Relationship)। অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে ভালোবাসা দেখাও কিন্তু ভেতরে ভেতরে পোষণ করো বিদ্বেষ। এ থেকে সম্যক অনুধাবন করা যায় আসলেই পশ্চিমা সাংবাদিকতার লক্ষ্য ও আদর্শের কী স্বরূপ! মুসলমানদের উপর যখন এই অনুচিত নীতি গর্হিতভাবে নেমে আসে তখন তারা শুধু যন্ত্রণাই অনুভব করে; কিন্তু জবাব দেবার মত তাদের তো নিজস্ব কোনো সাংবাদিকতার গঠন কাঠামো নেই, সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজস্ব নিয়ম রীতি ও মানদণ্ডও নেই। এ সব ক্ষেত্রে তারা একেবারে পুরোপুরি পশ্চিম থেকে ধার করা নীতি নিয়ম ও আদর্শের অনুগামী। অবশ্য তারা এটা সততই মর্মে মর্মে অনুভব করে যে, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গুরুতর ভুল হচ্ছে; কিন্তু ধার করা মানদণ্ড ব্যবহারের কারণে ভুলগুলি তারা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে না।

অতএব এমতাবস্থায় বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে বহুমুখী সমস্যা তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে সাংবাদিকতা। উল্লেখ করা আবশ্যক, এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং পেশাজীবী সাংবাদিকদের মিলিত প্রচেষ্টা। আশা করা যায়, যারা ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ' সেই সব উলামা এবং সাংবাদিক নিয়ে ইসলামী সাংবাদিকতার একটা ফলপ্রসূ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং এইভাবেই ইসলামী সাংবাদিকতার গঠন কাঠামো নির্মাণে পণ্ডিত ও পেশাজীবী সাংবাদিকদের মধ্যে ইতিবাচক মতবিনিময়ের কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন মুসলমানরাও অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করবে সত্য কিন্তু যাকে বলে ইসলামী মিডিয়া, সেটা আর হবে না। এবং এতে শুধু মুসলিম উম্মাহ নয় পুরো পৃথিবীকেই বিরাট ক্ষতি ও অনিষ্টের গুরুভার বহন করে যেতে হবে।

ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে বিকাশ ও মোবাইল ব্যাংকিং

দেশে মোবাইল ব্যাংকিং চালু হওয়ার পর থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম জানতে চাচ্ছেন। নিবন্ধে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা একমাত্র তাওফীকদাতা।

শরঈ আলোচনা শুরু করার আগে মোবাইল ব্যাংকিং-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানা যাক।

মোবাইল ব্যাংকিং কী?

এককথায় বলতে গেলে মোবাইল ফোন অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের নামই হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং। শাখা বা অফিসবিহীন এ ব্যাংকিং জনসংখ্যাবহুল বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। প্রথমে ব্র্যাক ব্যাংক ও ডাচ বাংলা ব্যাংক এ কার্যক্রম শুরু করলেও এখন অনেক ব্যাংকই এ ধারায় প্রবেশ করছে। সন্দেহ নেই, মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানির সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

কি কি সেবা দিয়ে থাকে?

এখন পর্যন্ত যে সেবাসমূহ মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো দিচ্ছে তা নিম্নরূপ :

১. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণ।

২. মোবাইল ফোন রিচার্জ।

৩. মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে জমা টাকা এজেন্ট থেকে উত্তোলন।

৪. মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে জমা টাকা ব্যাংকের এটিএম থেকে উত্তোলন।

৫. মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের টাকা ব্যাংক একাউন্টে এবং ব্যাংক একাউন্টের টাকা মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে স্থানান্তর।

৬. নির্ধারিত দোকানপাট ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ সুবিধা।

৭. দেশের বাইরে বসবাসরত আপনজন কর্তৃক প্রেরিত অর্থ (র‍্যামিটেন্স) গ্রহণ।

এছাড়া একাউন্টধারী কর্তৃক নিজ হিসাবের স্থিতি, মিনি স্টেটম্যান্ট দেখার সুবিধাও রয়েছে।

মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হয়?

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘বাংলাদেশ ব্যাংক’ থেকে লাইসেন্স নিয়ে তফসীলী ব্যাংকগুলো এ ব্যবসা করে থাকে। এজন্য তাদেরকে মোবাইল কোম্পানিগুলোর সাথেও চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। মোবাইল অপারেটরদের দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে শাখাবিহীন এ মিনি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ব্যাংকগুলো।

অনেকগুলো পক্ষের সংশ্লিষ্টতায় এ কারবার পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন,

ক) মূল কোম্পানি। যথা, বিকাশ, এমক্যাশ ইত্যাদি।

খ) মোবাইল কোম্পানিগুলো।

গ) ডিস্ট্রিবিউটর।

ঘ) এজেন্ট।

ঙ) গ্রাহক তথা একাউন্ট হোল্ডার। এছাড়াও রয়েছে,

চ) বিভিন্ন পণ্য বিক্রেতা ও সেবা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান যাদেরকে মার্চেন্ট বলা হয়।

ছ) প্রবাসী অর্থ তথা রেমিটেন্স গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে ভিন্ন চুক্তি।

মূলকাজ

মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানিগুলোর ওয়েব সাইটে দেওয়া তথ্যাবলি ও তাদের প্রচারপত্র পড়ে দেখা হয়েছে। কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন এজেন্টদের সাথে এবং উচ্চপদসস্থ মোবাইল ফোন কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্মকর্তার সাথে। সবকিছু দেখে ও শুনে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হল, মূলত গ্রামীণ জনপদে বসবাসকারী লোকদেরকে কিছুটা ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার মানসেই এ কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটেছে। এবং যত সেবাই মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দেওয়া হোক এর মধ্যে সবগুলোর শীর্ষে রয়েছে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে টাকা প্রেরণ ও গ্রহণ। মোবাইল ব্যাংকিং-এর পরিভাষায় যাকে বলা হয় সেন্ড মানি ও ক্যাশ আউট। অর্থাৎ ব্যাংকের টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি) এবং ডাক বিভাগের মানি অর্ডারের সহজ বিকল্প হচ্ছে বর্তমান সময়ের মোবাইল ব্যাংকিং।

শরঈ বিশ্লেষণ

এবার মোবাইল ব্যাংকিং-এর বর্তমান কার্যক্রমকে একে একে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করা যাক।

একাউন্ট খোলা

মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধাগুলো নেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির একটি একাউন্ট থাকতে হয়, যে কোনো ব্যক্তি কোম্পানির এজেন্টদের কাছে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে এ একাউন্ট খুলতে পারে। (যদিও টাকা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য নিজস্ব একাউন্ট না থাকলেও চলে। সেক্ষেত্রে এজেন্টদের মাধ্যমে তা করা যায়।) আমরা বিকাশ, ডাচ-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং, এমক্যাশসহ কয়েকটি কোম্পানির একাউন্ট খোলার ফরম ও নিয়মাবলি পড়ে দেখেছি। সেগুলোতে মৌলিকভাবে শরীয়া পরিপন্থী কোনো শর্ত আছে বলে মনে হয়নি। তবে ভবিষ্যতে নিয়মাবলি পরিবর্তন করার একক অধিকার কোম্পানি বহন করবে এমন শর্ত শরীয়তের 'আলইজারা' নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিতে এমনটি করাই শরীয়তের নিয়ম। বিকাশ এর একাউন্ট ফরমের অপর পৃষ্ঠায় ছাপানো শর্তাবলির ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে'গ্রাহককে কোনো পূর্ব ঘোষণা অথবা বিজ্ঞাপনজারি

ব্যতিরেকে যে কোনো সময়ে যে কোনোভাবে বর্তমান নিয়মাবলি সংশোধন, উন্নয়ন, পরিবর্তন করার ক্ষমতা বিকাশ সংরক্ষণ করে।'ভাবতে অবাক লাগে, এ ধরনের একচ্ছত্র ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন করে কি করে? একটি চুক্তি মানেই হল তাতে একাধিক পক্ষ জড়িত। সেখানে কোনো এক পক্ষের এত নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করা কোনোক্রমেই ইনসাফপূর্ণ নয়। বিষয়টি এমনও হতে পারত যে, কোনো সময় নিয়মাবলি পরিবর্তন, সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ করে এবং গ্রাহকের মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানানো হবে।

তবে যেহেতু একজন একাউন্ট হোল্ডার যে কোনো সময় কোনো খরচ ছাড়াই তার একাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে, তাই উপরোক্ত শর্তের কারণে একাউন্ট খোলা নাজায়েয হবে বলে মনে হয় না।

বিকাশ ফরমের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে, "গ্রাহক হিসাবে জমাকৃত তহবিল নিরাপত্তা জামানত বিবেচিত হবে। বিকাশ এর নিকট কৃত অঙ্গীকার এবং/অথবা দায়িত্ব অগ্রাহ্য অথবা যথাযথ পূরণ না করা হলে কোনো পূর্ব ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে উক্ত তহবিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবহারের অধিকার বিকাশ সংরক্ষণ করে।' এ ধারাটি দেখলে কারো হয়ত ফিকহে ইসলামীর 'রাহান' বলে সন্দেহ হতে পারে। বাস্তবে এটি 'রাহান' নয়। কারণ 'রাহান' হয় কোনো জিম্মা/পাওনার নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি উল্টো। একাউন্ট হোল্ডারের টাকা বরং কোম্পানির কাছে জমা থাকে। কোম্পানি তার কাছে কিছু পাওনা থাকে না। এটি হয়ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফিকহে ইসলামীর 'আযযফার বিল হক'-এর মাসআলার সাথে মিলতে পারে।

বিকাশ এর শর্তাবলির ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, বিকাশ একাউন্ট-এ জমাকৃত টাকার উপর কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা বা না করার যাবতীয় অধিকার বিকাশ সংরক্ষণ করে।বলা নিষ্প্রয়োজন যে, একজন মুসলমানের কোনোক্রমেই সুদ গ্রহণ করার সুযোগ নেই। তাই ভবিষ্যতে কখনো মোবাইল একাউন্টধারীকে সুদ দেওয়া হলে কিছুতেই তা ব্যবহার করবে না-এমন সংকল্প ফরমে দস্তখত করার সময়েই মনে মনে রাখতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকের এমক্যাশ-এর প্রচার পত্রে এজেন্টদের জন্য একটি অতিরিক্ত শর্ত দেখা গেল। তা হচ্ছে, এজেন্টকে ২৫০০০/- টাকা ইসলামী ব্যাংকে এফডিআর করে রাখতে হবে। যার উপর তাকে মুনাফা দেওয়া হবে। এটি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় শর্ত। যেখানে অন্যান্য কোম্পানি কোনো জামানত নিচ্ছে না, সেখানে এমক্যাশ কেন জামানত নিচ্ছে? আর ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়া পরিপালনে এত নিষ্ঠাবানও হয়ে উঠেনি যে, তারা মানুষকে হালাল মুনাফা প্রদানের গ্যারান্টি দিবে। মোটকথা মোবাইল একাউন্টে যেহেতু সামান্য টাকাই জমা রাখার

সুযোগ আছে তাই এর উপর সুদ বা মুনাফা দেওয়ার বিষয়টি জড়িত করার কোনোই দরকার নেই। এ বিষয়ে সামনে আরো কিছু কথা আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ক্যাশইন

মোবাইল একাউন্ট খোলার পর গ্রাহক নিজ একাউন্টে এজেন্টের মাধ্যমে টাকা জমা করতে পারেন, কোনো কোনো মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানি তাদের ব্যাংকে গ্রাহকের একাউন্ট থাকলে সেখান থেকেও মোবাইল একাউন্টে স্থানান্তরের সুবিধা দিয়ে থাকে। এ সুবিধাগুলো বিনামূল্যে বা ন্যূনতম (ফ্ল্যাট রেটে) মাশুলে (৫/১০ টাকা) হয়ে থাকে। অতএব এতে শরয়ী অসুবিধা আছে বলে মনে হয় না।

সেন্ড মানি

একজন মোবাইল একাউন্টধারী তার হিসাব থেকে অন্য একাউন্টধারীর হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণে টাকা পাঠাতে পারে। এটিকে বলা হচ্ছে সেন্ড মানি। ২/৫ টাকার ফ্ল্যাট রেটে এই সুবিধা দেওয়া হয়। এতেও শরয়ী সমস্যা নেই।

ক্যাশ আউট

মোবাইল ব্যাংকিং-এর বহুল ব্যবহৃত সুবিধা এটি। নিজ একাউন্ট থেকে অথবা এজেন্টের কাছে প্রেরিত টাকা উত্তোলনই মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সবচাইতে বেশি হয়ে থাকে। আর দুঃখজনক সত্য হল এ সেবাটির জন্যেই মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানি অনেক বেশি মাশুল নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের চার্জ হচ্ছে ১.৮৫% তথা প্রতি ১০০ টাকায় এক টাকা পঁচাশি পয়সা। আর হাজারে ১৮.৫০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, মোবাইল অপারেটরকে এ টাকা থেকে নির্ধারিত কমিশন প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ কোম্পানি তথা ব্যাংক পেয়ে থাকে।

ফিকহে ইসলামীর দৃষ্টিতে এটি 'আলইজারাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে টাকা জমা/উত্তোলনকারী হচ্ছে শ্রম/সেবা গ্রহীতা বা 'মুসতাজির'। আর এজেন্ট হচ্ছে শ্রম/সেবাদাতা যাকে বলা হয় 'আজীর' (আলোচিত ক্ষেত্রে মূল 'আজীরে'র প্রতিনিধি)। এক সময়ে ডাক বিভাগের মানি অর্ডারকেও তখনকার উলামায়ে কেরাম এভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। 'আলইজারা' এর মৌলিক শর্তগুলো পাওয়া যাওয়ায় বিষয়টিকে জায়েয বলা যায় তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যথা :

১. ক্যাশ আউটের বর্তমান চার্জ সার্বিক বিবেচনায় পরিমাণে বেশি। যেহেতু কোম্পানিকে কোনো পর্যায়েই নিজ থেকে কোনো টাকা দিতে হয় না; বরং বিভিন্ন পর্যায়ে ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্ট ও গ্রাহকের

অনেক অনেক টাকা তাদের কাছে জমা থাকে তাই এ সার্ভিসটির চার্জ আরো কম হওয়া উচিত। জনবহুল বাংলাদেশে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় সামান্য চার্জ

নিলেও তা একত্র হয়ে মোটা অংকের টাকায় পরিণত হবে। সরকারী নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকেরও এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

২. বর্তমান নিয়মে টাকা যত বাড়বে চার্জও একই হারে বাড়বে। এটি সংশোধন করে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ একটি সীমা নির্ধারণ করা দরকার। কারণ টাকার অংক বাড়লেও সার্ভিস তো সমানই হচ্ছে। বর্তমান নিয়মে কোনো প্রবাসী যদি আপনজনের মোবাইল একাউন্টে এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করে তবে সে টাকা ক্যাশ আউট (উত্তোলন) করতে গিয়ে তাকে গুণতে হবে ১৮৫০/- টাকা। যা অবশ্যই জুলুম।

৩. অভিযোগ আছে যে, কোনো কোনো এজেন্ট ক্যাশ আউটের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারের চেয়েও বেশি রাখে। হাজারে ১৮.৫০ টাকার জায়গায় ২০/- টাকা রাখার কথা তো ব্যাপকভাবেই শোনা যায়। কেউ কেউ নাকি তার চেয়েও বেশি নিয়ে থাকে। এটি কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। মনে রাখতে হবে, এজেন্টগণ হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানির নিযুক্ত শ্রম/সেবাদাতা প্রতিনিধি (উকীল)। কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত চার্জের বেশি নেওয়ার অধিকার তাদের নেই। ব্যাংকের কাউন্টারে অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত চার্জের অতিরিক্ত নেওয়া যেমন রিশওয়াত তথা উৎকোচের শামিল হবে এক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনি দাঁড়াবে। কোম্পানিগুলোকে এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার, যেন সাধারণ মানুষ তাদের কোনো এজেন্ট কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৪. কেউ কেউ পার্সোনাল একাউন্ট দ্বারাও ব্যবসা করে থাকে। আইন অনুযায়ী এটি নিষিদ্ধ। এমনটি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. আর এটিএম থেকে ক্যাশ আউটের হার বিকাশ রেখে থাকে হাজারে ২০ টাকা। অথচ এখানে এজেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউটর কারো মধ্যস্থতা নেই।

শুধু এটিএম-এর সাথে মোবাইল ব্যাংকিং সফটওয়্যার এর লিংক স্থাপিত করলেই হল। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে এটিএম থেকে নিজের জমা টাকা উঠাতে ২% চার্জ দেওয়া কতটুকু জুলুম তা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। হয়ত বিকাশ তার এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটরদের সুবিধা দিয়ে ব্যবসা বাড়ানোর মানসেই এ কৌশল নিয়েছে। কিন্তু গ্রাহকদের স্বার্থ কি উপেক্ষিতই থাকবে? এক্ষেত্রে কোনোক্রমেই ৫/১০ টাকার বেশি চার্জ হওয়া উচিত নয়। ডাচ-বাংলা ব্যাংকের চার্জ এক্ষেত্রে বর্তমানে কম ও যুক্তিসঙ্গত।

মোবাইল রিচার্জ

মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো গ্রাহকদের নিজ নিজ একাউন্টের মাধ্যমে মোবাইল ফোন রিচার্জের সুযোগও দিয়ে থাকে। এ জন্য বাড়তি কোনো ফী নেওয়া হয় না। তবে মোবাইল অপারেটরদের থেকে তারা কমিশন পেয়ে থাকে নিশ্চয়ই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে সমস্যা নেই।

রেমিটেন্স গ্রহণ

আরেকটি সেবা দেওয়া হয় বিদেশ থেকে প্রেরিত টাকা মোবাইল একাউন্টে গ্রহণের। প্রেরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা না দিতে হলেও উত্তোলনের ক্ষেত্রে ক্যাশ আউটের পুরো ফী-ই গ্রাহককে প্রদান করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, বর্তমানে তা হাজারে ১৮.৫০ টাকা ও লাখে ১৮৫০ টাকা। মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের উপর এটি অন্যায় হস্তক্ষেপ। তবে কোনো গ্রাহক মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে রেমিটেন্স গ্রহণ করলে তা নাজায়েয হবে না।

পেমেন্ট

মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো বর্তমানে গ্রাহকদেরকে নিজ নিজ একাউন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থান থেকে খরিদকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধেরও সুযোগ দিচ্ছে। এর জন্য গ্রাহক থেকে অতিরিক্ত চার্জ করা হয় না। পণ্য বিক্রয়কারী বা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'মার্চেন্ট।' গ্রাহকের মোবাইল একাউন্ট এবং এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটরের একাউন্টের মতো তাদেরও থাকে মার্চেন্ট একাউন্ট। কোম্পানি মার্চেন্ট থেকে কমিশন পেয়ে থাকে।

এটিকে তুলনা করা যায় ডেবিটকার্ড ও প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের সাথে। মৌলিকভাবে এটি জায়েয। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হচ্ছে, যদিও বাহ্যিকভাবে এসকল সেবার মাধ্যমে মানুষ ক্যাশ টাকা বহন করার ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে কিন্তু ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল একাউন্ট থেকে পেমেন্ট ইত্যাদি সুবিধা ব্যাংকগুলো আবিষ্কার করেছে তাদের লাভের জন্য। এসবের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো মার্চেন্ট তথা ব্যবসায়ীর লাভে ভাগ বসিয়ে থাকে। নিয়ে থাকে বিভিন্ন হারে কমিশন। যা সুস্পষ্ট মধ্যসত্ত্বভোগ। কারণ আধুনিক মার্চেন্টগণ এসব কমিশন ও চার্জের কথা মাথায় রেখেই তাদের পণ্য/সেবার মূল্য বাড়িয়ে ধরে থাকে। যার মাশুল গুণতে হয় সাধারণ ভোক্তাকে। ইসলাম এ ধরনের মধ্যসত্ত্বভোগকে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

মোবাইল একাউন্টধারী একজন গ্রাহক বর্তমানে উপরোল্লেখিত সেবাগুলোই পেয়ে থাকে।

প্রসঙ্গ সুদ

শোনা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানিগুলোকে নির্দেশনা জারি করা হতে পারে যেন গ্রাহক একাউন্টকে সেভিংস একাউন্ট হিসাবে ধরে একাউন্ট ব্যালেন্স এর উপর সুদপ্রদান করা হয়। এমনটি করা হলে তা হবে খুবই দুঃখজনক নিন্দনীয় কাজ। এ কথা অনুধাবন করা দরকার যে, মানুষ টাকা জমা রাখা বা সুদ/মুনাফার জন্য মোবাইল একাউন্ট করে না। এখানে তার টাকা থাকে প্রয়োজনে আপনজনকে প্রেরণ বা দরকারি কাজে লাগানোর জন্য। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান গ্রাহক, এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটর মোবাইল ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত। তাদেরকে সুদের মতো একটি নিকৃষ্ট হারামের সাথে জুড়ে দেওয়া কোনোক্রমেই কাম্য হতে পারে না। (এমনটি করা হলে এমক্যাশ ওয়ালারা হয়ত তাদের

একাউন্টকে মুদারাবা বলে দাবি করে মুনাফা দেওয়ার কথাও বলতে পারে!) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়ত ভাবছে গ্রাহককে সুদপ্রদান করা হলে তারা সেখানে ১০/১৫% হারে ভ্যাট বসাতে পারবে।

এ চিন্তা বাদ দিয়ে তাদেরকে ভাবা দরকার কিভাবে মোবাইল ব্যাংকিং-এর চার্জগুলো, বিশেষত ক্যাশ আউটের চার্জ কমানো যায়। সুদের উপর ভ্যাট বসিয়ে লাভবান না হয়ে তারা বরং নজরদারির জন্য ব্যাংকগুলো থেকে ন্যায়সঙ্গত ফী নিতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, অসংখ্য অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত লোক প্রয়োজনের তাকিদে মোবাইল ব্যাংকিং এর গ্রাহক হয়েছে ও হচ্ছে। তাদের একাউন্টে ১০/২০ টাকা সুদ দেওয়া হলে তাদের তেমন কোনো লাভ হবে না কিন্তু ঐ টাকা হিসাব করে আলাদা করা এবং

তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে। সুতরাং আমরা জোর দিয়েই বলতে চাই, যেন মোবাইল একাউন্টকে সেভিংস একাউন্ট ঘোষণা করা না হয়।

মোটকথা হল, সার্বিক বিবেচনায় (আমাদের জানা তথ্যগুলো অনুযায়ী) বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম জায়েয। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া দরকার। অদ্য ২২/০৯/২০১৩ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানি কোনো নতুন নিয়ম করলে সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোনো আলেম থেকে পুনরায় মাসআলা জেনে নিতে হবে।

ভিডিও গেমস

মাঠে গিয়ে ধুলো কাদা মেখে, ঘেমে নেয়ে, রোজ বিকেলে খেলা শেষে বাড়ি ফেরা- এ দৃশ্য আজকাল যেন হারিয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় খেলার জায়গার অভাব, পড়ার চাপ, যেমন তেমন ছেলে-পিলেদের সাথে মিশে খারাপ হবার ভয়- কত না অভিযোগ অভিভাবকদের! তার পরিবর্তে আমাদের অভিভাবকরা বিনোদনের নামে যা তুলে দিচ্ছেন ছেলে-মেয়েদের হাতে, তার ক্ষতির পরিমাণটা তাদের ধারণারও বাইরে।

পশ্চিমা বিশ্বের মতো আমাদের অনেক পরিবারে বাবা-মা দুজনই কর্মব্যস্ত। উভয়েই ছুটছেন ‘ক্যারিয়ার ও সফলতা’ নামক সোনার হরিণের পিছনে। এদিকে সন্তান বড় হচ্ছে কাজের বুয়ার কাছে। অনেক অপরিণামদর্শী মায়েরাই শিশুকে খাবার খাওয়াতে, তার কান্না থামাতে- টিভি, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমসের অভ্যাস করাচ্ছেন।

অন্যদিকে শহরের ইট, পাথর আর কংক্রিটের আড়ালে আটকা পড়ছে শিশুদের বর্ণিল শৈশব। গ্রামের শিশুরা খেলাধুলার কিছুটা সুযোগ পেলেও শহরের শিশুদের সে সুযোগ কম। বড়দের মতো শিশুদের মধ্যেও ভর করছে শহুরে যান্ত্রিকতা। ফলে তারা খেলাধুলার আনন্দ খুঁজে

ফিরছে মাউসের বাটন টিপে, কম্পিউটারের পর্দায় গেমস খেলে। অনেক সময় তাদের এ আকর্ষণটা চলে যাচ্ছে আসক্তির পর্যায়ে। ধীরে ধীরে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে কম্পিউটার-মোবাইল-ট্যাব গেমসের উপর। এজন্য প্রথমেই বলা যায়, ভিডিও গেমস আমাদের শিশু-কিশোরদের প্রকৃত শৈশব-কৈশোর কেড়ে নিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, অল্পবয়সী অর্থাৎ ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যেই ইন্টারনেটে ডুবে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাজ্যে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৩-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে ভিডিও গেমস, কম্পিউটার, ই-রিডার্স, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য স্ক্রিনভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পিছনে। বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের মধ্যেও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে একটি গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফেসবুক ব্যবহারকারী হিসেবে ঢাকা শহরের নাম উঠে এসেছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, আট বছরের শিশুরাও ব্যবহার করছে ফেসবুক।

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিনোদনের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র পাওয়া গেছে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর এক জরিপে। এতে দেখা যায়, ঢাকায় স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ ভাগ পর্নোগ্রাফি দেখে। প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আলমামুন বলেন, ৮ম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ঢাকার ৫০০ (পাঁচ শ) স্কুলগামী শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ছেলে শিশুরা সবসময় যৌন মনোভাবসম্পন্ন থাকে, যা শিশুর মানসিক বিকৃতির পাশাপাশি বাড়িয়ে দিচ্ছে মারাত্মক যৌন সহিংসতার ঝুঁকি। শিশু কিশোরদের এ অবস্থা এখন বিশ্বব্যাপী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। [সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম (অনলাইন) ২৩-৩-২০১৭ ঈ.]

উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ভিডিও গেমসের আবিষ্কার হয় ১৯৪০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর সত্তর-আশির দশকের মধ্যে এটি জনপ্রিয়তায় পোঁছে। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত আর্কেড টাইপের ভিডিও গেম-এর নাম ছিল কম্পিউটার স্পেস। এরপর আটারি কোম্পানি বাজারে আনে বিখ্যাত গেম পং। তারপর ধীরে ধীরে আটারি, কোলেকো, নিনটেনডো, সেগা ও সনির মতো ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো নানা উদ্ভাবন ও প্রচারণা চালিয়ে কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মানুষের ঘরে পোঁছে দেয় পুঁজিবাদী সভ্যতার এ বিনোদনপণ্য।

২০০০ সনে সনি কোম্পানি জরিপ করে দেখেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চারটি বাড়ির একটিতে একটি করে সনি প্লে স্টেশন আছে। ২০০৯ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শতকরা ৬৮ ভাগ আমেরিকানের বাড়ির সব সদস্যই ভিডিও গেম খেলে।

তারপর সময় বদলেছে। কম্পিউটার এবং ভিডিও গেমস ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম লাভজনক ও দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প ইন্ড্রাস্ট্রি। বিশ্বজুড়ে আজ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও গেম এবং গেমাররা। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রায় ২২০ কোটি মানুষ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ভিডিও গেম খেলে থাকে। যাদের অধিকাংশই হচ্ছে অল্প বয়সী শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী। এদের বদৌলতে গ্লোবাল ভিডিও গেম বাজারের আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৮.৯০ মিলিয়ন ডলার! এর মধ্যে 'মোবাইল গেমিং'ই হচ্ছে সবচে বেশি পয়সা আয় করা সেক্টর। স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে গেমিং প্রতি বছর ১৯শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া; মাসিক সি নিউজ- www.cnewsvoice.com; bengalinews..)

কী থাকে এসব ভিডিও গেমসে?

প্রশ্ন হচ্ছে, কী থাকে এসব ভিডিও গেমসে? কেন তাতে এত আসক্তি? খোঁজ করলে জানা যায়, জনপ্রিয় গেমগুলোর মধ্যে কিছু আছে ক্রিকেট ফুটবলের মতো। নানা রকম দল তৈরি করে এসব খেলা খেলতে হয়। খেলায় হারজিত হয়। এক ম্যাচ খেললে আরেক ম্যাচ খেলতে ইচ্ছে করে। এর কোনও শেষ নেই। ছেলে মেয়েদেরকে কম্পিউটারের সামনে থেকে টেনে তোলা যায় না। এতে চট করে এক ঘেয়েমিও আসে না। পড়াশুনা শিকেয় তুলে ছেলে মেয়েরা একটার পর একটা ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ খেলে যায়। অনলাইনভিত্তিক দাবা এবং তাসও এসবের অন্তর্ভুক্ত। এসব আবার সাধারণত খেলে অবসর বুড়ো খোকারা।

বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়-

এক ধরনের গেম আছে, তাতে প্রচন্ডগতিসম্পন্ন গাড়ি নিয়ে রাস্তা, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ছুটে চলতে হয়। বিপজ্জনক ব্যাপার হল, এই ছুটে চলার পথে অন্য প্রতিযোগীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া, গাড়ির নিচে মানুষ পিষে ফেলা, পথচারীর কাছ থেকে মোটর সাইকেল বা গাড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ফুটপাতে উঠে পড়া, রাস্তার স্থাপনা ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা, পুলিশ ধাওয়া করলে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা- এসব নাকি গেমের সবচে আকর্ষণীয় বিষয়! এ অনৈতিক কাজগুলো করে যে যত পয়েন্ট অর্জন করতে পারে সেই বিজয়ী হয়!

আর এক ধরনের গেম আছে, যার পুরোটা জুড়েই থাকে হিংস্রতা, মারামারি, যুদ্ধ, দখল এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যত বেশি সহিংসতা তত বেশি পয়েন্ট! হিংসার উদ্দাম আনন্দ নিয়ে দুর্গম গিরিপর্বত, নদীনালা, জঙ্গল ও সমুদ্রের উপর দিয়ে শত্রু খুঁজে বেড়ানো। বাংকার খনন করে

ওঁত পেতে থাকা। প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণের টেনশন। আরো দ্রুত চলতে হবে! যত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সম্ভব প্রতিপক্ষকে শেষ করতে হবে!

কোমলমতি শিশু কিশোররা নিজেরাও জানে না, কেন তারা এ মারণখেলা খেলছে! একের পর এক মানুষ খতম করছে। কখনো হাতুড়িপেটা করে মাথা থেতলে দিচ্ছে। মুহূর্তে রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। কখনো গ্রেনেড ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের পা জখম করছে। এরপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পলায়নপর মানুষটির উপর মারছে দ্বিতীয় গ্রেনেড। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার হাত পা। তারপর রক্তমাখা দেহটা লুটিয়ে পড়ছে খেলোয়াড়ের পায়ের উপর!

চোখের সামনে ভাসছে জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র। কানে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারের বাস্তব আওয়াজ। এমনকি আহত শত্রুসেনার রক্তমুখের গর্গর শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে আপনার সন্তান! এতে কিন্তু তার আনন্দ, উৎসাহ এবং উত্তেজনা কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কোনো কোনো খেলায় রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের পকেট এবং ব্যাগ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করতে পারলে পাওয়া যাচ্ছে বাড়তি পয়েন্ট! এমনকি রাস্তায় ড্রাগ বিক্রেতার কাছ থেকে ড্রাগও কেনা যাচ্ছে! এখানে একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। এই গেমগুলিই এখন সবচে জনপ্রিয়। এসব ধ্বংসাত্মক গেমসের মধ্যে এ যাবতকালের পৃথিবীর সবচে জনপ্রিয় গেমটির নাম 'পাবজি'। দক্ষিণ কোরিয়ার ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পিইউবিজি কর্পোরেশন ২০১৭-এর মার্চে এ অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার গেমটি বাজারে আনে।

এর নির্মাতা ব্লু হোয়েল কোম্পানি আর পরিচালক আইরিশ ওয়েব ডিজাইনার ব্রান্ডন গ্রিন। রিলিজের মাত্র তিন দিনের মাথায় 'প্লেয়ার আননউনস ব্যাটেলগ্রাউন্ডস' সংক্ষেপে 'পাবজি' নামক এ গেম প্রায় ১১ মিলিয়ন ডলার আয় করে। আপনি জানলে অবাক হবেন, পাবজি গেম নির্মাণকারী সংস্থা প্রতিদিন ৬,৮৯০০০ ডলার আয় করে থাকে গেমারদের থেকে। প্রথম ৬মাসেই তারা লাভ করেছে ৩৯০ মিলিয়ন ডলার।

রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে এখন প্রতি মাসে প্রায় ২২৭ মিলিয়ন মানুষ এ গেম খেলে। আর প্রতিদিন খেলে প্রায় ৮৭ মিলিয়ন লোক। লাখো গরিবের দেশ বাংলাদেশেও প্রতিদিন এ গেম খেলছেন ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ! [সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন (অনলাইন) ১৫-৩-২০১৯ঈ.; প্রবাস সংবাদ নিউজ পেইজ ২০-৩-১৯ঈ.)

অনলাইনভিত্তিক এই ভিডিও গেমটিতে একসাথে ১০০জন মানুষ একটি পরিত্যাক্ত দ্বীপে থাকে। খেলোয়াড়কে প্রথমে প্যারাসুটের মাধ্যমে সেখানে নামিয়ে দেয়া হয়। সেখানে একে অপরকে হত্যা করে টিকে থাকতে হয়। ভয়ংকর সব গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে খতম করতে হয় একে একে সবাইকে। এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতারও আশ্রয় নেয়া হয়। চলে হত্যার ষড়যন্ত্র-পরিকল্পনা। অনলাইনে বন্ধুরা পরস্পরে কথাবার্তা বলে এ হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে শলা-পরামর্শ করে। কয় পয়েন্ট পাওয়া গেল, কতজন নিহত হল, বাকিদেরকে কীভাবে হত্যা

করা যায়- এসবই এ ভয়ংকর গেমের বিষয়। হত্যাযজ্ঞ শেষে যে ব্যক্তি বা যে গ্রুপ বেঁচে থাকে, তারাই হয় বিজয়ী।

সব মিলিয়ে মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় কিশোর-তরুণেরা 'পাবজি'তে এতটাই মগ্ন থাকছে যে, বাস্তব পৃথিবী ভুলে তারা এক বিপজ্জনক নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ভিডিও গেমসের এ নিধনযজ্ঞ অনেক বাস্তব অনুভব হচ্ছে তাদের কাছে।

গেমিং রোগ

সারাদেশে এখন এসএসসি পরীক্ষার বিরতি চলছে। দিনরাত এক করে মোবাইল-কম্পিউটারে মুখ গুঁজে এ সহিংস গেম খেলছে শিশু কিশোররা। পাবজি নিয়ে মাতামাতি এখন অধিকাংশ ছেলে মেয়ের। এ গেমের নেশা এতটাই চরম যে, কিছুদিন পূর্বে ভারতের মহারাষ্ট্রে পাবজি খেলায় মত্ত দুই তরুণকে চলন্ত ট্রেন এসে পিষে দিয়েছিল। স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত দুই যুবক নাগেশ গোরে (২৪) এবং স্বপ্নিল অন্নপূর্ণে (২২) রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়েই পাবজি খেলছিল। চলন্ত ট্রেন আসার খেয়ালও হয়নি তাদের। যার ফলে হায়দারাবাদ-আজমের দূরপাল্লার ট্রেনটির নিচে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায় তারা। (দ্যা ওয়াল নিউজ পোর্টাল)

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের এক যুবক নিজের বাড়িতে পাবজি খেলতে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, চোখ সরিয়ে দেখার সময়টুকু পাননি যে কী পান করছেন তিনি! পানির পরিবর্তে তিনি ভুল করে এ্যাসিড পান করে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার অন্ত্রে অপারেশন করতে হয়। (বাংলা লাইন ২৪ ডট কম ৭-৩-২০১৯ঈ.)

মন দিয়ে পাবজি খেলতে পারছেন না- এ অভিযোগ তুলে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। পাবজি খেলার জন্য দামি ফোন কিনে না দেয়ায় মুম্বাইয়ের এক কিশোরের আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদও এসেছিল সামনে।

ভারতীয় গণমাধ্যম জিনিউজের খবরে বলা হয়, জম্মুর এক যুবক দশদিন পাবজি খেলে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। তিনি নিজেই নিজেকে নানাভাবে আঘাত করতে থাকেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের সূত্র জানিয়েছে, যুবকের অবস্থা স্থিতিশীল নয়। পাবজি গেমের প্রভাবে আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা তাকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তার জন্য একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, এ নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে পাবজি খেলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ৬জন ভর্তি হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আরো অনেকে এ সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু তাদের পরিবার এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। (বাংলা নিউজ অনলাইন পেইজ ১২-১-১৯ঈ.; খবর মেদিনীপুর)

বিশেষজ্ঞদের মতে এ গেম যারা খেলে, তারা চরম নেশায় আক্রান্ত হয়। হিংস্র মনোভাবাপন্ন একটা প্রবণতা পেয়ে বসে তাদের। মনোরোগ চিকিৎসকরা বলেন, মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ধ্বংসাত্মক মনোভাবকে টেনে বের করে আনে এ গেম। খেলার ছলে প্রশ্রয় দেয় রক্ত, মৃত্যু, খুন এবং জয়।

সম্প্রতি গত ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের আননূর মসজিদে আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে এক খ্রিস্টান সন্ত্রাসীর হত্যাযজ্ঞের ঘটনার পর আবারো আলোচনায় এসেছে পাবজি গেম। প্রায় তিন মিনিটের এ হামলায় শাহাদাত বরণ করেন অর্ধশত মুসল্লি। এ নির্মম হামলার ভিডিওটির সঙ্গে সহিংস পাবজি গেমের ভয়ানক সাদৃশ্য বেরিয়ে এসেছে।

ঐ মসজিদে হামলাকারী সন্ত্রাসী তার মাথায় লাগানো ক্যামেরা দিয়ে নৃশংস হত্যাকা- নিজেই সম্প্রচার করেছে। সেই ভিডিও ফুটেজ দেখলে পাবজি গেম বলে ভ্রম হবে। হত্যাকারী গাড়ি থেকে অস্ত্র বের করে গুলি ছুঁড়ছে। গুলি ফুরিয়ে গেলে ভরে নিচ্ছে ম্যাগাজিন। মসজিদের দরজা, বারান্দা পেরিয়ে মুসল্লিদের হত্যা করে এগিয়ে যাচ্ছে। শহরে হেঁটে হেঁটে, রাস্তায় গাড়িতে বসে গুলি ছুঁড়ে একের পর এক অস্ত্র পাল্টে মানুষ হত্যার এ বীভৎস ভিডিওকে কেবল পাবজি গেম বলে বিভ্রম হতে পারে।

এসবের প্রেক্ষিতে জোর দাবি উঠেছে এ ধ্বংসাত্মক গেমটি নিষিদ্ধ করার জন্য। ইতিপূর্বে ভারতের গুজরাটসহ কয়েকটি রাজ্যে পাবজি গেম নিষিদ্ধ করা হয়। চীন দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে নেয়া হয় নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের প্রশাসনের কেউ কেউ এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

বিশ্বব্যাপী গেমসের প্রতি তীব্র নেশা যে পাবজি গেম থেকে শুরু হয়েছে তা নয়। ইতিপূর্বে ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান, মনস্টার হান্টার ওয়ার্ল্ড, ডটা টু, ভাইস সিটি এবং হাঙ্গারগেমসহ নাম না জানা অসংখ্য গেমে মানুষের ভীষণ আসক্তি ছিল। 'কল্পনার জগতে গিয়ে গেমের প্রিয় চরিত্রের নায়কের সাক্ষাতলাভের জন্য ২৪তলা ভবনের ছাদ থেকে কিশোরের লাফিয়ে আত্মহত্যা করা; অতিরিক্ত গেম খেলায় বাবার বকুনি খেয়ে অভিমানী তাইওয়ানী কিশোরের নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া; একটানা ২৪ ঘণ্টার লাইভ ভিডিও গেম খেলতে খেলতে ২২ ঘণ্টার মাথায় যুবকের মৃত্যুবরণ; অনলাইন ভিডিও গেমের জন্য টাকা জোগাড় করতে ১৩ বছরের ভিয়েতনামী কিশোরের ৮১ বছরের বৃদ্ধাকে রাস্তায় শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার মানিব্যাগ চুরি এবং লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলা; চায়না দম্পতির কম্পিউটার গেমের অর্থের জন্য নিজেদের তিন সন্তানকে ৯হাজার ডলারে বেচে দেয়া'- এরূপ হৃদয়বিদারক গেমাসক্তির ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচুর ঘটেছে।

এর বাইরে গেমসের কারণে বিশ্বব্যাপী বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকুরী হারানো, মারমুখী ক্ষ্যাপাটে আচরণ, বাবা-মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, অল্পতেই ধৈর্যহারা হয়ে পড়া, ইন্টারনেট না থাকলে অথবা মোবাইল বা কম্পিউটারের চার্জ ফুরিয়ে গেলে অস্থির-আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ার ঘটনা তো অহরহই ঘটছে।

এসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নেশা মানেই শুধু মদ বা মাদক নয়। নেশা বা মাদকাসক্তি কেবল মদ-গাঁজা, আফিম-হেরোইন ও বিড়ি-সিগারেটের সেকেলে পরিসরে আবদ্ধ নেই। কালের পরিক্রমায় প্রযুক্তির কল্যাণে (?) এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার বদান্যতায় (!) নেশার পতিত অঙ্গনেও লেগেছে ডিজিটালের ছোঁয়া! ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও ধ্বংসাত্মক ভিডিও গেমসে বুঁদ হয়ে থাকার ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষ এমন নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে, যা থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ঘটিত এ আসক্তিকে মনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'ডিজিটাল মাদক'! সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) ভিডিও গেমসের প্রতি তীব্র আসক্তিকে বিশেষ এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ অসুখের নাম দেয়া হয়েছে 'গেমিং ডিসঅর্ডার' বা 'গেমিং রোগ'। সংস্থার খসড়া একটি নথিতে ভিডিও গেমে আসক্তিকে একটি আচরণগত সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ আচরণে আসক্তির সব লক্ষণ রয়েছে অর্থাৎ, বারবার এ খেলার প্রবণতা দেখা দেয় এবং এ থেকে সরে আসা কঠিন বলেও দেখা যায়। এছাড়াও জীবনের অন্য সব কিছু ছাপিয়ে প্রাধান্য পায় এ গেমিং-এর নেশা। [সূত্র : বিবিসি বাংলা (অনলাইন) ৩-১-২০১৮ঈ.]

উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন বৃটেন, জার্মানি এবং চীনে ভিডিও গেমের আসক্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য আলাদা চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে এধরনের আসক্তদেরকে মানসিক রোগীর মতোই চিকিৎসা দেয়া হয়। থেরাপিসহ বিভিন্ন চিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে যাচ্ছে, তাতে আল্লাহ না করুন, সকল দেশেই এরূপ চিকিৎসাকেন্দ্র খুলতে হতে পারে। কারণ, এধরনের আসক্ত মানুষের সংখ্যা সব দেশেই বেড়ে চলেছে।

শারীরিক ক্ষতি

অনেক সরলমনা অভিভাবক হয়ত ভাবতে পারছেন না যে, এই তুচ্ছ বিনোদনটি এত মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। বস্তুত এ হচ্ছে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিনোদন। যা শুধু টাকার বিনিময়ে কথিত আনন্দ দিয়েই ছাড়ে না। উপরি পাওনা স্বরূপ কেড়ে নেয় সময়, সম্পদ, মেধা, সুস্থতাসহ অনেক কিছু! এখানে তার সামান্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

আজকাল ছোটদের অনেকের চোখেই পাওয়ারি চশমা ঝুলতে দেখা যায়। চশমা ছাড়া শিশুরা চোখে ঝাপসা দেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ হল ডিজিটাল মাদকাসক্তি। দিনরাতের একটা দীর্ঘ সময় স্মার্টফোন, ট্যাব ও কম্পিউটারের স্ক্রীনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্ষীণ দৃষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। চিকিৎসকদের ভাষায় এ রোগের নাম 'মায়োপিয়া'। ২-৩ বছরের শিশুরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. খায়ের আহমেদ চৌধুরী দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, এ প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে আমরা ২৫০ জন রোগী দেখি। এর মধ্যে ক্ষীণ দৃষ্টি বা মায়োপিয়ার আক্রান্ত শিশু আসে গড়ে ৫০জন। (দৈনিক নেত্রকোণা নিউজ ডেস্ক ২৬-১- ২০১৯ঈ.)

ঢাকার ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের শিশু বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ৮-১৪ বছরের শিশুদের চোখের সমস্যা বাড়ছে। ডাক্তারের পরীক্ষা, রোগী ও অভিভাবকদের কথায় জানা গেছে, মোবাইল-কম্পিউটারে অতিরিক্ত গেমস খেলা এবং টিভি দেখার কারণে শিশুর চোখের সমস্যার সৃষ্টি হয়। বেশ কয়েকজন অভিভাবক ও শিশুদের দেয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, তারা গড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ডিজিটাল ডিভাইসের পেছনে ব্যয় করে, যার বড় অংশই একাডেমিক বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের বাইরে। [দৈনিক সংগ্রাম (অনলাইন) ২৩-৩-১৭ঈ.]

বাংলাদেশ আই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রতিদিন চিকিৎসা নিতে আসা শিশুদের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিশু মায়োপিয়া সমস্যায় ভুগছে। তাদের এখনই রোধ করা না গেলে ৫ বছরের নিচে শিশুদের দূরদৃষ্টিজনিত সমস্যা বেড়ে যাবে এবং তা ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত হবে। যা গোটা জাতির জন্য এক ভয়াবহ বার্তা বহন করছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনেরা। [দৈনিক ইত্তেফাক (অনলাইন) ২৯-৫-১৭ঈ.]

ভিডিও গেমসের কারণে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বর্তমান বিশ্বে ভিডিও গেমসের সবচে বড় বাজার হচ্ছে চীন। গেম উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণেও প্রথম সারিতে দেশটি। কিন্তু ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, ১০০ কোটি মানুষের দেশ চীনের অর্ধেক মানে ৫০ কোটির বেশি মানুষ ভুগছে চোখের সমস্যায়! যেকারণে দোটানায় পড়ে গেছে চায়না সরকার। একদিকে গেমিং ব্যবসা অন্যদিকে মানুষের চোখ! এজন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বয়সের ভিত্তিতে কে কতক্ষণ ভিডিও গেম খেলতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। অন্যদিকে আবার সরকারি এ নতুন সিদ্ধান্তের ফলে চায়না পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত গেমস কোম্পানির দর কমে গেছে। চীনের মোবাইল ভিডিও গেমস বাজারের ৪২ শতাংশের বেশি অংশের মালিক 'টেনসেন্ট' কোম্পানিকে এ কারণে কয়েকশ' কোটি ডলারের ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। (নয়া দিগন্ত অনলাইন ২-৯-২০১৮ঈ.)

যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটায়, তাদের মস্তিষ্কে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রেডিওলজি'র অধ্যাপক ইয়ুং সুক-এর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল কিশোর কিশোরীদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছেন। (সূত্র ডি ডাব্লিউ ডট কম)

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫০০ জনের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে, যেসব শিশু দিনে সাত ঘণ্টারও বেশি সময় স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও ভিডিও গেমস খেলে, তাদের মস্তিষ্কের শ্বেত পদার্থের বহিরাবরণ পাতলা হয়ে যায়। (women news24.com ১৩-১২-১৮ঈ.)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, বিরতীহীনভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিশুদের চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ পড়ে। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না। তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (Hawkerbd.com)

রাতে ঘুমানোর সময় একটা ডিভাইস হাতে নিয়ে শুতে গিয়ে অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ঘুমায়। এ অভ্যাস আস্তে আস্তে ঘুম না আসার কারণে পরিণত হচ্ছে। এখন তো রাতের ঢাকার চিত্রই বদলে গেছে। অসংখ্য পরিবারে গভীর রাত অবধি জেগে থেকে সকাল দশটা এগারটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকাটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কোন মুসলিম জনপদের চিত্র হওয়া তো দূরে থাক, কোন স্বাস্থ্য সচেতন নগরীরও চিত্র হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, এ আসক্তির কারণে ছেলে মেয়েরা ঠিকমতো ঘুম, খাওয়া-দাওয়া করতে চাইছে না।

শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে বড়দের মতো মুটিয়ে যাচ্ছে শিশুরাও। অল্প বয়সে তারা হাঁটু ও কোমর ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছে। শারীরিক অনুশীলন ও খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক শরীর গঠন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাদের। জরিপে দেখা যায়, ভীষণ মোটা বা স্থ'ূলকায় শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩০% শিশুর আয়ু কম হয়। ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও হৃদরোগেও আক্রান্ত হতে পারে তারা। এছাড়া মাথাব্যথাসহ আরো কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। (champs21.com ২৬-৪-২০১৫ঈ.)

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হল মোবাইল ব্যবহার। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও অনেকে তা দিব্যি করে চলেছেন। দেখা যাচ্ছে, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন যারা বেশি ব্যবহার করছে, তাদের ছয় ভাগ বেশি দুর্ঘটনা হচ্ছে। (এন টিভি অনলাইন ২৭-৮-১৭ঈ.)

এছাড়াও চিকিৎসকদের মতে, মোবাইল ফোন পকেটে রাখলে ভ্রুণের কোয়ালিটি কমে যাওয়া, বুক পকেটে রাখলে হার্টের সমস্যা দেখা দেয়া, আঙ্গুলে ও ঘাড়ে ব্যথা, কানে কম

শোনা এবং ডিসপ্লে থেকে জিবাণু ব্যাকটরিয়ার সংক্রমণসহ অসংখ্য শারীরিক ঝুঁকির আশংকা রয়েছে।

মানসিক ও আচরণগত সমস্যা

এ প্রজন্মের শিশু কিশোররা আগের মতো বাইরে খেলাধুলা করে না। গল্পের বই পড়ে না। এমনকি কারো সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তাও তেমন বলে না। এ দৃশ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাদিন দরজা বন্ধ করে কম্পিউটার ও স্মার্টফোন নিয়ে পড়ে থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই নিজের একটা জগত তৈরি করে নেয়। ফলে মা বাবা আত্মীয়-স্বজন থেকে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভীষণ একাকীত্বের শিকার হয়ে পড়ছে তারা। দেখা যায়, সবার মাঝে থেকেও সে একা। তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রকেন্দ্রিক।

এ ধরনের ছেলে মেয়েরা বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিজিটাল এক কল্পজগতে বাস করতে শুরু করে। বদলে যায় তাদের মানসিক গঠন। তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যেও যান্ত্রিকতার একটা ছাপ দেখা যায়। কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের মাঝেই তারা জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা ও সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ায়। ফলে তাদের সঠিক মানসিক বিকাশ হয় না। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও সহমর্মিতার অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে তাদের দুর্বল হতে থাকে। নিজেকে ছাড়া কারো প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ জাগে না। নিজের অজান্তেই স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় আক্রান্ত হয় তারা।

অনুকরণপ্রিয় স্বভাবের কারণে ছোটরা যা-ই দেখে, তা-ই অনুকরণ করতে পছন্দ করে। দেখা যায়, গেমের সুপারম্যান চরিত্র দেখে সে ছাদ থেকে লাফ দেয়ার চেষ্টা করে। কারো উপর রাগ হলে হাতকেই বন্দুক বানিয়ে গুলি করা শুরু করে। সারাদিন বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক খেলা খেলতে খেলতে তাদের আচরণও ক্রমশ আক্রমণাত্মক ও মারমুখী হয়ে উঠে। দিনের একটা বড় সময় এসব খেলায় কাটানোর ফলে তাদের কাছে ঐ জগতটাই বাস্তব বলে মনে হয়। সাম্প্রতিককালে ব্লু হোয়েলসহ বিভিন্ন গেম খেলে বহু কম বয়সী শিশু কিশোরের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। ভিডিও গেমসে বিদ্যমান রক্তাক্ত হামলা, সহিংসতা, চুরি, যৌনতা ও প্রতারণা শিশুদেরকে অন্যায় ও অপরাধকর্মে মারাত্মকভাবে উৎসাহিত করছে।

ভিডিও গেমসের মধ্যে শিশুরা এতই সময় ব্যয় করছে যে, তাদের পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া সবই শিকেয় উঠেছে। বর্তমানে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর পড়াশুনায় ধ্বস নেমেছে পাবজি খেলায় আসক্তির কারণে। শিক্ষক অভিভাবকরা এ নিয়ে এখন পেরেশান। সম্প্রতি ভারতের এক মন্ত্রী এ গেমকে 'ঘরে ঘরে শয়তান' হিসেবে আখ্যা দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশে এ ব্যাপারে তেমন সচেতনতা দেখা যাচ্ছে না। খুব কম মানুষই বর্তমানে গেমিং রোগের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত।

ভিডিও গেমসের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে রঙ-বেরঙের দৃশ্যপট পরিবর্তন, সারাক্ষণ অবিশ্বাস্য গতিতে ছোটাছুটি, জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে থাকা- এসব শিশুদের মানসিকতায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। দেখা যাচ্ছে, কোন কিছুতেই তাদের স্থিরতা থাকছে না। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তারা তাড়াহুড়ো করছে। অযথা সন্দেহ-অবিশ্বাস তাদের মধ্যে জেঁকে বসছে। ইসলামের চিরন্তন আকীদা-বিশ্বাস তাদের নিকট সেকেলে ও আধুনিকতা বিরোধী মনে হচ্ছে। অল্পতেই তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে। বাস্তব জীবনেও নিজের পরাজয়কে তারা মেনে নিতে পারছে না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামের এক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যে কোনো অনর্থক কাজকে বর্জন করা। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে, যা কিছু অনর্থক তা বর্জন করা। (-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২২৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৮)

ভিডিও গেমসগুলো আক্ষরিক অর্থেই অর্থহীন কাজ। লক্ষ্য করলে দেখবেন, এগুলো আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের কোন উপকারেই আসে না। বরং বাস্তবতা তো হচ্ছে, এগুলো অর্থহীন হয়েই শেষ নয়। দুনিয়া-আখেরাতে আমাদের অসংখ্য ক্ষতিও টেনে আনছে।

সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, এসব খেলা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করছে। দেখা যায়, গেমের নেশায় জামাত ছেড়ে দিচ্ছে। নামাযও কাযা করছে অবলীলায়। জরুরি কাজ ছেড়ে পড়ে থাকছে এ নেশা নিয়ে। মা বাবার অবাধ্যতা, স্ত্রী সন্তানের প্রতি অবহেলা- এসব তো অহরহই ঘটছে।

এদেশে এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, অসুস্থ মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ছেলে চলে গেছে কয়েক মাইল দূরে গেম খেলতে। তাহলে কীভাবে ইসলামে এ জিনিস বৈধ হতে পারে? পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.

কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব কথা খরিদ করে, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। -সূরা লোকমান (৩১) : ৬

দ্বিতীয়ত, এ গেমগুলো চোখের ক্ষতি করছে। ব্রেনের ক্ষতি করছে। স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অস্থির, অশান্ত ও নেশাগ্রস্ত করে তুলছে। মানুষকে পাগল ও পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিপুল পরিমাণে সময় ও কর্মশক্তির অপচয় করছে। কল্পনাতীত অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করছে। মানুষকে নির্মমতা ও পাশবিকতা শেখাচ্ছে। সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের পাঠ দিচ্ছে। অন্যকে মেরে নিজে জেতার হিংস্র মনোভাব শিক্ষা দিচ্ছে। ইসলাম কেমন করে এমন ধ্বংসাত্মক বিনোদন অনুমোদন করতে পারে?

প্রতিটি গেমসে গান-বাজনা বা মিউজিক্যাল সাউন্ড থাকে, যা সম্পূর্ণ হারাম। অসংখ্য ভিডিও গেমসে নগ্নতা ও অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি থাকে, যার জঘন্যতা খুলে বলার প্রয়োজন নেই। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক- কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। -সূরা নূর (২৪) : ২৯

দেখা যাচ্ছে, মুসলিম শিশুরা এসব গান-বাজনা ও বেহায়াপনা ভর্তি গেম খেলে শৈশব থেকেই এ কবীরা গুনাহগুলোকে হালকা মনে করছে। অনেকে তো এসবকে হারামই ভাবছে না; বরং এই ইসলামী বিধানসমূহের ব্যাপারে বিদ্রোহের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। বলাবাহুল্য, কারো ঈমান ধ্বংসের জন্য এ মনোভাবই যথেষ্ট।

অনেক গেমসে সরাসরি কুফুরি আকীদা শিক্ষা দেয়া হয়। শিশু কিশোরদের অন্তরে শিরকী প্রতীকের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা এবং ইসলামী বেশভূষার প্রতি বিদ্বেষ ঢালা হয়। যেমন, গেম খেলতে খেলতে পথের মাঝে ক্রুশ চিহ্ন বা মূর্তি চলে আসে, আর তাতে ক্লিক করলে পাওয়া যায় লাইক এবং বাড়তি জীবনীশক্তি। বিভিন্ন গেমসে দেখা যায়, মূর্তি ভয় দেখাচ্ছে। আর গেমার ভয় ও সম্ভ্রমের সাথে দাঁড়িয়ে থাকছে। ভারত থেকে নির্মিত কোন কোন গেমের ভেতর মৃত্যুর পর মূর্তির স্পর্শে গেমার পুনর্জীবন লাভ করছে। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম মানসে বিশেষত শিশুদের অন্তরে সঞ্চারিত হচ্ছে পুনর্জন্ম, মূর্তিপূজা এবং মূর্তির ক্ষমতা থাকার মতো শিরকি বিশ্বাস।

এভাবে গেমের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কুফর-শিরকের প্রতি মুসলিম মানসে শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তাওহীদের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে ফেলা হচ্ছে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের এটাই লক্ষ্য। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.

ইহুদী খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। -সূরা বাকারা (২) : ১২০

কিছু কিছু গেমসে পরিকল্পিতভাবে প্রতিপক্ষের বেশভূষা রাখা হয় সম্পূর্ণ ইসলামী। দাড়ি, টুপি, আরবি রুমাল এবং জোব্বা পরিহিত মানুষদেরকে শত্রু বানিয়ে ইচ্ছামতো তাদেরকে মারার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিছু ভিডিও গেমের দৃশ্যপট দেখলে চোখে ধন্দ লেগে যায়। অবিকল সিরিয়া ফিলিস্তিনের মতো এলাকা। সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম বসতবাড়ি! সেই পরিত্যক্ত মরুঅঞ্চল! রাস্তাঘাট ও দোকানপাটের নামগুলিও পর্যন্ত আরবিতে লেখা। সেখানে ঘুরে ঘুরে আপনার সন্তান শত্রু মারার খেলা খেলছে।

ইসরাইলে তো এ ধরনের প্রায়-বাস্তব অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা দিতে একাধিক থিম পার্কই গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে টিকিট কেটে হত্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে আরব অথবা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী(!)। পর্যটকদের আনন্দ দিতে নাকি এ ব্যবস্থা। এসব পার্কে খুঁজে খুঁজে মুসলিম বেশভূষার ছবি বা ডামিকে মারা, বসতিতে জ্বালাও-পোড়াও করার খেলায় মেতে উঠে পর্যটকরা।

একজন কলামিস্টের ভাষায়-

(ইসরায়েলি বিনোদন : টিকিট কাটুন, 'ফিলিস্তিনি' মারুন! নামক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন,) "...ওয়েস্টওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইসরায়েলি বিনোদনকেন্দ্রের মিলটা বাস্তবতায় নয়, গুণে নয়, কেবল লক্ষণে। রোবটের বদলে তারা ব্যবহার করে মানুষের ছবি বা ডামি; যাদের গায়ে পরানো থাকে ফিলিস্তিনি কেফায়াহ কিংবা আরবদের গলায় পরার স্কার্ফ-ইয়াসির আরাফাত যেমনটা পরতেন। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম আন্তর্জাতিক আইনে ইসরায়েলের দখলীকৃত এলাকা। ওই জমিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডো ও অফিসাররা সন্ত্রাস দমনের টার্গেট হিসেবে যাদের নকল বা ছবি সাজিয়েছে, তারাই ওই জমির ঐতিহাসিক ও আইনসংগত মালিক। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য একটা বিনোদন পার্কও চালানো হয়। সেখানে সাজানো পরিস্থিতিতে আপনি আরব অথবা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী (!) 'হত্যা' করতে পারবেন। ...আপনাকে এমন একটি রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানকার আরব অধিবাসীদের মধ্যে আপনি সন্ত্রাসী খুঁজবেন। শিশুরাও সব খেলায় অংশ নিতে পারলেও সত্যিকার বন্দুক তাদের দেওয়া হয় না।

ইসরায়েলজুড়ে এ রকম ছয়টি বিনোদনকেন্দ্র আছে, নতুন আরেকটি খোলা হচ্ছে আমেরিকায়।

ইসরায়েলের বিনোদন পার্কের খবর পড়ে আশ্বাস ভেঙে গিয়ে আতঙ্ক জেগেছে। মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, ভিডিও গেমের আদলে এই ধরনের প্রায়-বাস্তব অ্যাডভেঞ্চার কি মানুষের মধ্যে বিকৃত ভোগ ও খুনপিপাসা জাগায় না?

ইসরায়েলি বিনোদনকেন্দ্রে আরব ও ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী হিসেবে দেখা এবং তাদের হত্যায় মন মজানো কেউ যদি বন্দুক হাতে আরব পোশাক পরা মানুষ হত্যায় নেমে পড়ে, তার দায়

কি এই ইসরায়েলিরা নেবে? মোদ্দাকথা, এটা কতটা বিনোদন পার্ক আর কতটা ঘৃণার কারখানা?

শিশুদের এমন বিনোদনে মাতানোই-বা কতটা সুস্থ কাজ? কিন্তু বর্ণবাদীদের কাছে এসবই স্বাভাবিক।" [দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন), ১৯ জুলাই, ২০১৭]

ক্যালিবার থ্রি নামের এ বিনোদনকেন্দ্র প্রতি বছর ২২ থেকে ২৫ হাজার পর্যটককে এরূপ বিকৃত বিনোদন সরবরাহ করে থাকে। এভাবে তারা টাকার বিনিময়ে মানুষের মধ্যে বিকৃত ভোগ, খুনপিপাসা ও কল্পনার শয়তানি সাধ মেটাবার আয়োজন করে জাগিয়ে তুলছে তার শয়তানি প্রবৃত্তিকে। তারপরও তারা নাকি সভ্য, প্রগতিশীল ও বিশ্বশান্তির অগ্রদূত!

ভাবুন তাহলে, কীসের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে আপনার সন্তান! একদিকে বছরের পর বছর ইহুদী-খ্রিস্টান শক্তি সিরিয়া-ফিলিস্তিনে মুসলমানদের জীবন নিয়ে খেলছে। অন্যদিকে তারাই বিশ্বব্যাপী মুসলিম প্রজন্মকে খেলার ছলে তাদের মানসিকতায় গড়ে তুলছে। (তা-ও বিনা পয়সায় নয়, রীতিমতো মোটা অংকের টাকা নিয়ে।) আমাদের অভিভাবকরা সন্তানকে এসব ক্রুসেড খেলা খেলতেও দিচ্ছেন নিশ্চিন্তে। এ

যেন ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের খুনের মহড়া চলছে ঘরে ঘরে। চোখের সামনে ঘটলেও আমরা তা ধরতে পারছি না বা গুরুত্ব দিচ্ছি না।

আভিভাবকদের প্রতি

সবশেষে অভিভাবকদের প্রতি প্রশ্ন, আমরা তাহলে কোন প্রজন্ম গড়ে তুলছি? কোন চেতনায় বেড়ে ওঠছে আমাদের সন্তানেরা? কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের কতটুকু ভালো, কতটুকু মন্দ, খেলাধুলা ও বিনোদনের জায়েয-নাজায়েযের সীমারেখা কী- সে আলোচনার আগে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সন্তানের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে, চোখ ও মস্তিষ্ক নষ্ট করে, শারীরিক ও মানসিক অসংখ্য রোগের পথ খুলে দিয়ে আমরা কোন্ বিনোদনের ব্যবস্থা করছি তাদের জন্য? শিশু কিশোরদের হাতে এসব যান্ত্রিক বিনোদন তুলে দিয়ে আমরা একটি অপরিনামদর্শী প্রজন্ম তৈরি করছি না তো?

যারা একথা বলে যে, 'ভিডিও গেমস মানসিক চাপ কমায়। ইতিবাচক চিন্তা জন্মায়। একাগ্রতা, দ্রুততা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা তৈরি করে'- তাদের কাছে জানতে চাই, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, অপচয়, নগ্নতা, হিংস্রতা, হত্যা ও রক্তারক্তি শিখিয়ে কোন্ ইতিবাচক চিন্তা জন্মানো আর কোন্ মানসিক চাপ কমানোর কথা বলছেন আপনারা? শিশুদের পড়াশুনার বারোটা বাজিয়ে, তাদেরকে অস্থির-অসহিষ্ণু বানিয়ে কোন একাগ্রতা ও দ্রুততার পাঠ দিতে চাইছেন?

যে মানুষগুলো আজকে গেম খেলতে খেলতে মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে, বাবা -মার সঙ্গে রাগারাগি করছে, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে একসময় আত্মঘাতী পর্যন্ত হয়ে উঠছে, তাদেরকে আর কোন্ সমস্যার সমাধান শেখাবেন গেম খেলিয়ে?

এ জীবন, সময়, সম্পদ এবং সন্তান কোনোটিরই আমরা মালিক নই। এর প্রত্যেকটিই আল্লাহপ্রদত্ত মূল্যবান আমানত, যার হেফাযত ও সদ্ব্যবহার না করা হলে আমাদেরকে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানের জীবন তো কখনো এমন হবে না যে, তার সময়কে কাটানোর প্রশ্ন আসবে! জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান। আমাদের কি এতই উদ্বৃত্ত সময় থাকে যে তাকে কাজে লাগানোর খাত খুঁজে না পেয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল-কম্পিউটারে উড়িয়ে দিচ্ছি! দেশের পাঁচ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সবাই কি জরুরি কাজে তা ব্যবহার করছে?

আমাদের অর্থ-সম্পদ কি এতই হয়ে গেছে যে, ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ প্রতিদিন পরিশ্রম করে পাবজি খেলে পশ্চিমাদের পকেট ভারি করছি! আজও এদেশে অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন না খেয়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা কক্সবাজারে ক্ষুধা, কষ্ট ও দারিদ্র্যের মাঝে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

বিনোদনের নামে সম্পদের এত বিপুল অপচয়ের সময় কি আমাদের তাদের কথা একটুও মনে পড়ে না? আমরা আমাদের সময় ব্যয় করছি, সম্পদ ব্যয় করছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটুনি করে পশ্চিমাদের আরো আরো অর্থের যোগান দিচ্ছি। বিনিময়ে কী পাচ্ছি? ক্ষণিকের সস্তা বিনোদন আর শরীর ও মনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি!

আজ থেকে দশ পনের বছর পূর্বেও শিশুদের খেলাধুলা ছিল স্বাস্থ্যকর ও প্রকৃতিবান্ধব। সেখানে ধ্বংসাত্মক ও ঈমানবিরোধী বিনোদনের কোন অস্তিত্বই ছিল না বলতে গেলে। কিন্তু এখন বিনোদন মানেই শুধু পিস্তল, মারামারি, অশ্লীলতা ইত্যাদি! এসব খেলে আপনার সন্তান শুধুই যে মজা পাচ্ছে তা নয়, তার মগজও ধোলাই হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। ফলে এ প্রজন্ম বেড়ে ওঠছে হিংসা, বেহায়াপনা, নির্মমতা ও বস্তুবাদের ভয়ংকর মানসিকতা নিয়ে।

বর্তমানে যেসকল বুদ্ধিজীবী দাড়ি, টুপি, মাদরাসা ও ইসলামী পোষাকের ভেতর জঙ্গিবাদের গন্ধ খুঁজে বেড়ান, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, এখন ঘরে ঘরে কীসের প্রশিক্ষণ চলছে? যুদ্ধ, রক্তপাত, সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক ভিডিও গেম খেলে কোমলমতি শিশুরা কোন্ মানসিকতায় বেড়ে উঠছে? পুঁজিবাদী পশ্চিমের যান্ত্রিক উৎকর্ষের কল্যাণে কীসের মহড়া চলছে শিশু-কিশোরদের হৃদয় ও মনে? কেন এত যুদ্ধ? কেন এত রক্ত? কেন এত নির্মমতার পাঠদান ভিডিও গেমসে? কোন্ অতলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম? একটু ভেবে দেখব কি!

চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার তরুণ প্রজন্ম : সুরক্ষায় করণীয়

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি শিশু স্বভাবজাত সুন্দর মানসিকতা তথা ইসলামী আদর্শের ওপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে তার পিতা-মাতা তাকে খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায় বা ইয়াহুদী বানায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৫৮) হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বলা যায়, আমাদের আজকের তরুণ-যুবকেরাও ইসলামী স্বভাব ও সুন্দর মন-মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের হৃদয়ও ছিল নিষ্কলুষ-পবিত্র। তাদের মধ্যেও ছিল ঈমান, সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা। তারাও নিজ নিজ মানসে ধারণ করতো বিনয়, ন¤্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতার গুণ। আত্মত্যাগ, পরোপকার, উন্নত নৈতিকতা, মানবকল্যাণ, ও দেশপ্রেমসহ সকল সৎ গুণাবলী তাদেরও কাক্সিক্ষত ছিল। কিন্তু আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে তারুণ্যের সঙ্কট প্রচÐ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ, সংসার, মানবিকতা বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। চারিদিকে কপটতা, মিথ্যা, হীনতা ও প্রবঞ্চনা। প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হতাশা ও অস্থিরতার শিকার পুরো তরুণ সমাজ। মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল, আফিম, পেথিড্রিন ও মরণনেশা ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তারা। ফলে সমাজে খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, আত্মসাৎ, বেহায়াপনা, অশ্লীলতার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দিন যতই যাচ্ছে ততই নৈতিকতার অবক্ষয়ের মাত্রা বেড়েই চলছে আর তরুণ যুবসমাজও তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুধু অভাব, দারিদ্র বা বেকারত্বই নয়; প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তরুণদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে অতৃপ্তি ও চরম শূন্যতা। মোটকথা, তারুণ্যের নৈতিক অবক্ষয়, পদস্খলন ও অধঃপতন জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার এ বিপর্যয় দেশের আবহমান সামাজিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকেও সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। যা নিয়ে গোটা দেশ ও জাতি অস্থির, চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।

তরুণ ও যুব সমাজের অবক্ষয়, পদস্খলন ও এ অধপতনের কারণ অনেক। তবে মারাত্মক কিছু অবক্ষয়ের কারণ ও তার পরিণতির কথা উল্লেখ করবো।

ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী না হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী হওয়া

ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে যদিও বুঝানো হয় কিছু নির্দিষ্ট প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে রেখে পরিচালনা করা। কিন্তু উপমহাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ মূলত ইসলাম ধর্মে নেই এমন ত্রুটি বের করে মানুষকে ইসলাম বিমুখ করার প্রচেষ্টাকেই বুঝায়। এ মতবাদ অনুযায়ী ‘সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকেই বিশেষ কোন মর্যাদা বা সুবিধা প্রদান করবে না’ বলা হলেও সর্বদাই দেখা যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে

মানুষকে ইসলামী অনুশাসন পালনে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিধি বিধান পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও ইসলামী অনুশাসন যারা মানতে চায় তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে কোণঠাসা করে রাখা হয়। বিশেষ করে ধর্মহীন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকুরীর ক্ষেত্রে আইনী বাঁধার সৃষ্টি করে তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। যার ফলে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার লোভে একশ্রেণীর অসাধু সমাজপতি বুদ্ধিজীবি, শিক্ষিত পন্ডিতরা নিজ পরিমন্ডলে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, ছাত্র ও তরুণ সমাজে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে। আর ছাত্র ও তরুণ সমাজ খোদাভীতি, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে রিপু আর প্রবৃত্তির অসৎ চাহিদাগুলো পূরণ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করছে। এটাই স্বাভাবিক যারা পাপ-পূণ্য, ইহকালীন-পরকালীন জবাবদিহিতার চিন্তা থেকে মুক্ত দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে বিশ্বাস করে তাদের দ্বারা সমাজের অবক্ষয় ও অধ:পতন অনিবার্য তা সহজেই অনুমেয়। যার দরুণ আমাদের এ তরুণ সমাজ আজ অধ:পতন ও অবক্ষয়ের নির্মম শিকার। তাই শিশু-কিশোরদের বর্তমান যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ঐশী তথা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন। তাদের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে না পারলে এই অধপতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

সর্বনাশা মাদক ও নেশার সয়লাব

তরুণ ও যুব সমাজের সংকট-সমস্যার অন্যতম কারণ মাদক ও নেশার সয়লাব। ইসলামে সর্বপ্রকার মাদক নিষিদ্ধ হলেও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে যুব সমাজ মাদকের মরণ নেশায় মেতে উঠছে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ যুবক মাদকাসক্ত হয়ে অবলীলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মাদক এতো ভয়ানক আকার ধারণ করছে যার ভয়ানক প্রভাব ও বিস্তার লক্ষ্য করা যায় আমাদের মানুষ গড়ার আঙ্গিনা শিক্ষাঙ্গনগুলোতেও। যা যুব সমাজের জন্য এক ভয়ানক পরিণতি ও অশনি সংকেত।

কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনের জরিপে দেখা গেছে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিশুদের শতকরা নব্বই জনই মাদকসেবী। ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন ও ইয়াবার মতো মরণ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে তারা। প্রতিনিয়ত শিশু, মহিলা, কিশোরীরাও মাদক বহন, সেবন করে জড়িয়ে পড়ছে অনৈতিক কার্যকলাপে। অর্থ ও রোমাঞ্চের মোহে প্রতিদিন ১০/১২ বছরের শিশু-কিশোর, সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েরা লেখা-পড়া বাদ দিয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি জীবন ধ্বংসকারী মাদক বহন এবং সেবনের সাথে। পত্রিকায় এসেছে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন ১৪ লাখ ইয়াবার চাহিদা, চট্টগ্রাম মহানগরতীতে ৮ লাখ আর কক্সবাজারে ৪ লাখ ইয়াবার চাহিদা। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রতি ওয়ার্ডে ২০০ এর বেশি ইয়াবা ব্যবসায়ী রয়েছে।

দৈনিক ঢাকা রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী শুধুমাত্র ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ১,২৯,৬৪৪টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে ৩৫০জন আসামীর বিরুদ্ধে ২৩৩টি মামলা হয়েছিল। সেখানে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮,২১,৫২৮টি ট্যাবলেট উদ্ধার করে ২,২৫৯জন আসামীর বিরুদ্ধে ১,৬৫৪টি মামলা হয়েছে। ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৮১২৭১৬, ১০৭৬১২৫ ও ২১৩৪৩৯৫টি ট্যাবলেট উদ্ধার করে ৯৫১, ২৩৯৪ ও ২৯৫৮জন আসামীর বিরুদ্ধে ৬২৯, ১৬৪৪ ও ২০৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় সহজেই বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে মাদকের কি সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণেই আমাদের সোনালী ভবিষ্যত তরুণ প্রজন্ম মাদকের এ সয়লাবে বানের পানির মত ভেসে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে পরিবেশ পরিস্থিতি। মাদকাসক্ত ভাই খুন করছে ভাইকে, নিরাপদ নয় ভাইয়ের হাতে বোন, স্বামীর হাতে খুন হচ্ছে নিরাপরাধ স্ত্রী, কন্যা জবাই করছে মা-বাবাকে। ভেঙ্গে পড়ছে সামাজিক শৃঙ্খলা, প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক স্থিতিশীলতার উপর। শ্লথ হয়ে আসছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তো এ পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য এক কথায় ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার কোনই বিকল্প নেই।

অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট, ফেসবুক ও টুইটারের অপব্যবহার

ইন্টারনেট মানেই অনলাইন। সভ্যতার এ যাত্রাকে আমরা 'ডিজিটাল বাংলা' বলে চিত্রিত করেছি। নিউজ বিডির তথ্যানুসারে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের হিসেব মতে তখন পৃথিবীর ২৪০ কোটি ৫৫ লাখ ১৮ হাজার ৩৭৬ জন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতো। এর শতকরা ৪৪ ভাগই এশিয়ার। বাংলাদেশের অবস্থাও দুনিয়ার অন্যান্য দেশ হতে ভিন্ন নয়। এ দেশে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রæয়ারী মাসে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬১ লাখ ২৮ হাজার ৫৯২, যার সিংহভাগই তরুণ-তরুণী। আর ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রতিটি মানুষই প্রায় কমবেশি অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে থাকে। বিশ্বে সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে অন্যতম আলোচিত বিষয় এখন ফেসবুক। যাকে সময়ের যাদুকরী প্রযুক্তিরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ফেসবুক ব্যবহার প্রথম দিকে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে নির্বিশেষে সব বয়সের নারী-পুরুষের মধ্যে দ্রæত বিস্তার লাভ করছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে ২০১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২ লাখ। বর্তমানে ২ কোটি ছাড়িয়ে।

জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হলেও বর্তমানে ফেসবুক সমাজ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। তরুণ প্রজন্মের কাজে ফেসবুক আজ ইয়াবা আর আফিমের স্থান দখল করে নিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে ক্রমেই বাড়ছে এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। ইন্টারনেট,

কম্পিউটার, ল্যাপটপ সুবিধা আছে কিন্তু ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই এমনটা এখন বিরল। তরুণ-তরুণী এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুশ্চিন্তার-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন অভিভাবকগণ।

পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী এর মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক গড়ছে এবং মিথ্যার রাজত্ব কায়েম করছে। বন্ধুত্বের নামে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি, প্রেম, পরকীয়া, বহুগামিতা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অবিশ্বাস-সন্দেহ সৃষ্টি ও ফাটল ধরানো এবং পারিবারিক বন্ধন ভাঙনের পেছনে বিজ্ঞজন এ ফেসবুককে দায়ী করছেন। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরা বিয়ের আগেই জড়িয়ে পড়ছে একাধিক অবৈধ সম্পর্কে। কখনো স্বামী কখনো স্ত্রী কখনো বা দুজনেই একসাথে একাধিক সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ছে পর্নোগ্রাফি। পর্নোছবি, ভিডিও এবং অশ্লীল লেখা সমন্বয়ে অসংখ্য অ্যাকাউন্ট এবং পেজ খোলা হচ্ছে। অনেকে নামে বেনামে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট খুলে অনবরত অশ্লীল ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করে যাচ্ছে যা ফেসবুক ব্যবহারকারী সকলের ওয়ালে চলে আসছে। যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বিষয়টি এখন রীতিমত বিশ্বের সকলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ ফেসবুকের জনক উন্নত বিশ্বেও ফেসবুকের ভয়ঙ্কর এসব প্রভাব নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একাধিক সমীক্ষা ও প্রতিবেদন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, কিছু সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করলেও মনের অগোচরেই ব্যবহারকারীদের ক্রমেই নেশাগ্রস্থ করে তুলছে সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেসবুক, টুইটার এবং গুগলের মতো অনলাইন মাধ্যমগুলো। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ রয়েছে, অনলাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ফেসবুক, টুইটার এবং গুগলের মতো সাইট পরিদর্শকদের মধ্যে গড়ে ৫৩জন বিচলিত হয়ে পড়ে। একই কারণে একাকিত্ব যাতনায় ভোগে শতকরা ৪০জন। ব্রিটিশ আইনি সংস্থা 'ডিভোর্স অনলাইন' গত বছর পাঁচ হাজার বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেয়েছে, বিয়ে বিচ্ছেদের অন্যতম ভূমিকা পালন করছে ফেসবুক। আমেরিকান একাডেমি অব ম্যান্টিমোনিয়াল ল ইয়ার্স তাদের তথ্যে উল্লেখ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ শতাংশ বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য ফেসবুকই দায়ী। ফেব্রæয়ারী '১৫ইং জাতীয় দৈনিক নয়া দিগন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তথ্য মতে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ৭১৫৩টি। যাতে পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি আগ্রহী। প্রাসঙ্গিক এক জরিপে দেখা যায়, ৮৭ শতাংশ নারীই দাম্পত্য জটিলতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ফলে নিজেরাই দায়ী।

তাছাড়া সুইডেন ভিত্তিক আরেক গবেষণায় দেখা যায়, বেশি সময় যারা ফেসবুক ব্যবহার করেন তাদের প্রায় অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী। এ গবেষণা বলছে, ব্যবহারকারী অধিকাংশ মেয়ের স্বামী নেই, যাদের আছে তারা হয় প্রবাসী নয়তো নিজেরাই একে অপর থেকে পৃথক বসবাস করেন। দেশ বিদেশ অনলাইন পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে

উল্লেখ করেন, ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক চ্যানেলগুলো বিশেষ করে ফেসবুক অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে। নিউইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক চেলসি বিয়ান এক গবেষণার পর জানিয়েছেন, মাত্রাতিরিক্ত ফেসবুকের ব্যবহার মানুষের মধ্যে জটিল মানসিকতা সৃষ্টি করে। এর ফলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের মানসিক অপরিপক্কতা। যেমন অসামাজিক আচরণ, তীব্র টেনশন বা উত্তেজনা সৃষ্টি, কিশোর ও কিশোরীদের সহিংস আচরণ প্রভৃতি। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু ও বয়স্কসহ ফেসবুকের বহু গ্রাহক মানসিক রোগের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করছে।

তাছাড়া তরুণ সমাজে খুবই দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ও দোস্ত কালচার। পর্নোগ্রাফীর বিস্তার ও সংস্পর্শে আসার কারণে লজ্জা এবং নৈতিকতার বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে ছড়িয়ে পড়ছে লজ্জাহীনতা, খোলামেলা ও অবাধ মেলামেশার পরিবেশ। এক সময় মা-বাবার উদ্বেগ ছিল ছেলে-মেয়েদের মোবাইলে কথা বলা এবং এসএমএস বিনিময়ে সময় ব্যয় করা নিয়ে। কিন্তু এখন ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্কাইপ, ওয়েবক্যামের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি অবারিত হয়েছে। এসবের সয়লাবে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ চালু হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগজনক চিত্রের কথা জানিয়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষকেরা। শিক্ষার্থীদের নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াতের খবরও বের হচ্ছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর দৌলতদিয়া নিষিদ্ধ পল্লিতে খুন হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছরের এক শিক্ষার্থী। রাজধানীর পুরান ঢাকায় পর্নো ভিডিওতে অভিনয়ের সময় ধরা পড়ে দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলাপকালে তারা জানান, অনেক সময় ক্লাস ফাকি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোথাও গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। কোন কোন এলাকার রেস্টুরেন্ট ঘুরলে যে চিত্র এখন

দেখা যায় তা কয়েক বছর আগে চিন্তা করতেও পারতেন না অভিভাবকরা। এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেক অভিভাবক। কোন কোন অভিভাবক আবার অন্য অভিভাবকদের দায়ী করে বলছেন, অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার বিষয়ে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করে না এবং এটা তাদের কোন দুশ্চিন্তারও কারণ মনে হয় না। এদের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হচ্ছে অন্যরাও। যার মূলে ছিল মূলত ফেসবুক, টুইটার এ জাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অন্যায় ব্যবহার।

মোটকথা, কেমন যেন আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে এসব অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আফিমের চেয়েও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এসব বিপর্যয়ের দরুণ ফেসবুকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই ইতোমধ্যে ফেসবুক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের

জোর প্রচেষ্টা চলছে। আরব বিশ্বসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের বিজ্ঞ সচেতন মুফতীয়ানে কেরাম, ফাতাওয়া বোর্ডও ফেসবুক ব্যবহার নাজায়েয প্রসঙ্গে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

ইন্টারনেট থেকে পিডিএফ বই ডাউনলোড করে পড়া জায়েয হবে কি?

ইন্টারনেটে থাকা পিডিএফ কিতাবগুলো ডাউনলোড করে পাঠ করা কিংবা প্রয়োজনীয় অংশ প্রিন্ট করে উপকৃত হতে কোন আপত্তি নেই। কেননা এ কিতাবগুলো দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। যথা:

১. কিতাবগুলো মালিকের বা লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে ইন্টারনেটে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিতাবের মালিক বা লেখকের ইলমের প্রচার-প্রসার ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় কিতাব অনলাইনে প্রকাশ করে থাকেন। (ফতোয়া দারুল উলুম দেওবন্দ)

২. অথবা প্রকাশনী বা মালিকের অনুমতি ছাড়াই ইন্টারনেটে আপলোড করা হয়েছে। তার পরেও সেগুলো ডাউনলোড করে পাঠ করা কিংবা ব্যক্তিগত উপকৃত হওয়া দোষনীয় নয়। তবে সেগুলো ব্যবসায়িক কাজে লাগানো যাবে না। কেননা এতে প্রকাশনী বা মালিকের ক্ষতি হয়ে যাবে। (ফতোয়া বানুরী টাউন)

লেখক/প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এরকম বই নিজ ব্যবহারের জন্য পিডিএফ বা ফটোকপি করা জায়েয হবে কি?

কোনো বইয়ের স্বত্ব লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্য হল, ঐ বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনার সকল অধিকার লেখক বা প্রকাশকের। এভাবে স্বত্ব সংরক্ষণ করা জায়েয। এক্ষেত্রে লেখক বা প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া উক্ত বইয়ের মুদ্রণ ও বাজারজাত করা জায়েয নেই। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া নিজ ব্যবহারের জন্য পিডিএফ বা ফটোকপি করা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাসিক আলকাউসার)

আলোকচিত্র\ফটোগ্রাফি

প্রথমত: সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে আলোকচিত্রের বিধান সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কিছু আলেম যারা মনে করেন যে এটি জায়েজ এবং হারাম নয়, তারা এর জন্য শর্ত নির্ধারণ করেছেন:

১- ছবির উদ্দেশ্য জায়েজ হওয়া উচিত, যেমন পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি।

২-ছবিতে কোনও পরিবর্তন বা উন্নতি আলোকচিত্রীর দ্বারা করা উচিত নয়।

৩-এটি হারাম ছবি হওয়া উচিত নয় যেমন মেকআপ পরা মহিলার ছবি ইত্যাদি।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এই ক্যামেরাগুলি তাৎক্ষণিকভাবে একটি ছবি তৈরি করে এবং ব্যক্তির এই ছবির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, সে সম্পর্কে আমরা মনে করি যে এটি ছবি তৈরির শিরোনামে আসে না, বরং এটি এমন একটি ছবি প্রেরণের শিরোনামে আসে যা আল্লাহ এই মেশিনের মাধ্যমে তৈরি করেছেন। এটি একটি প্রতিফলনের মতো এবং ব্যক্তির ছবিটি তৈরির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। হাদিসগুলি বরং এমন ছবি তৈরির কথা বলে যা মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণে করে। এটি এমন যখন একজন ব্যক্তি একটি চিঠি লেখেন এবং তার একটি ফটোকপি তৈরি করেন। যে ছবিটি বেরিয়ে আসে তা মেশিনটি পরিচালনাকারীর দ্বারা করা হয়নি; সম্ভবত যিনি মেশিনটি পরিচালনা করেন তিনি লিখতেও জানেন না। লোকেরা জানবে যে এটি প্রথম ব্যক্তি লিখেছিলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির এর সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যদি সে এই ফটোগ্রাফিক ছবিটি হারাম উদ্দেশ্যে তৈরি করে, তবে এটি হারাম কারণ হারাম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার উপায়গুলিও হারাম।

ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি হল এমন একটি বিশেষ ধরনের ফটোগ্রাফি যেখানে বন্যপ্রাণীদের তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে, যেমন বনে বা পানির নিচে, ছবি তোলা হয়। এই ধরনের ছবি সাধারণত প্রাণীদের বিভিন্ন কাজ যেমন খাওয়া, লড়াই করা বা ওড়াউড়ির মতো মুহূর্তগুলো ধারণ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে একান্ত জরুরি দরকার ছাড়া মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ সব ছবি-ভিডিও করা, ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা কোনটাই জায়েজ নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

"(কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সব থেকে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি তৈরি করে।" [মুসলিম ৩৭/২৬, হাঃ ২১০৯, আহমাদ ৩৫৫৮] আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪১৩)

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَوَّرَ صُورةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) متفقٌ عليه(

"যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করে, তাকে কিয়ামতের দিন তাতে জীবন দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে কিন্তু সে সক্ষম হবে না।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে: “তোমরা যা বানিয়েছিলে তাতে জীবন দাও।” [৭৫৫৮; মুসলিম ৩৭/২৬, হাঃ ২১০৮] আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪১৪)

অনলাইন ক্লাস: প্রযুক্তির অপব্যবহারে ফাঁদে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা

বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রকোপে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের শিক্ষাখাত। অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় সবকিছু স্বাভাবিক হলেও ১৪ মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কবে খুলবে তারও নেই সঠিক নিশ্চয়তা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচালে শিক্ষার্থীরা ও তাদের অভিভাবকরা।

তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অনলাইন ক্লাস চলছে। কিন্তু তাতেও নেই আশানুরূপ সাফল্য। সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন বেসরকারি গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে।শুরুর দিকে অনলাইন ক্লাস শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকলেও সময় গড়াতেই তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। পড়াশোনা বিমুখ অধিকাংশ স্কুল শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসের নামে প্রযুক্তির অপব্যবহার করে সময় কাটাচ্ছে।

দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ফলে একঘেয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। একদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ অন্যদিকে বন্ধ কোচিং সেন্টার। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের সময় কাটাচ্ছে ঘরবন্দি থেকে। এতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও তৈরি হয়েছে এক ধরণের শঙ্কা। করোনায় ঘরবন্দি এসব শিক্ষার্থীদের উপর প্রযুক্তিগত নেতিবাচক প্রভাব দিন দিন বাড়ছে।

করোনায় অনলাইন ক্লাসের নামে পরিণত বয়সের আগেই স্মার্টফোন হাতে পেয়েছে অনেক স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী। কিন্তু অনলাইন ক্লাসেরর নামে এখন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরাই ইন্টারনেটের অপব্যবহারে লিপ্ত। করোনার আগে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা, পরীক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও করোনার প্রকোপে ঘরবন্দি অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা এখন প্রযুক্তির নেতিবাচক আসক্তিতে মগ্ন।

তথ্য মতে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রাখতে নিয়মিত এসাইনমেন্ট দেয়া হলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা এসব তার উত্তর গুগল থেকে বের করে কিংবা ইউটিউবের ভিডিও দেখে দেখে লিখছে। এছাড়া অনলাইন ক্লাসের নামে স্মার্টফোনে বুঁদ হয়ে আছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। দিনের অধিকাংশ সময় ফেসবুক, গেমিংয়ের পেছনে ব্যয় করছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বলছে, প্রযুক্তি যতটুকু না পড়াশোনার জন্য ব্যয় করছে তার চেয়ে অন্য কাজে বেশি ব্যয় করেছে শিক্ষার্থীরা। প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে খেলাধুলা বিমুখ শিক্ষার্থীরাদের মানসিক স্বাস্থ্য এখন চরম হুমকির মুখে।

এ প্রসঙ্গে এক স্কুল শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ফলে সন্তানদের নেই পড়াশোনা ও পরীক্ষার চাপ। ফলে অনলাইন ক্লাস দিয়েও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার স্বাভাবিক গতি ফিরছে না। বিপরীতে হাতের কাছে স্মার্টফোন পেয়ে ছেলেমেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময় ইন্টারনেটে ব্যয় করছে। বন্ধুদের সাথে চ্যাট, ইউটিউব, ফেসবুক, গেমিংসহ প্রযুক্তির নানান দিকে আসক্ত হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে ব্যপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সন্তানদের প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে রক্ষা করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরেক অভিভাবক বলেন, করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের পর থেকে সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীরা। সন্তানদের আবদার মেটাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাতে তুলে দিতে হচ্ছে স্মার্টফোন। স্মার্টফোন ব্যবহার করেই অধিকাংশ সময় পার করছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ যদি আরো দীর্ঘ হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে ।

আরেক স্কুল শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, প্রযুক্তির ভালো খারাপ উভয় দিক আছে। করোনাকালে শিক্ষাজীবন প্রযুক্তিগত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির ভালো দিক ও খারাপ সম্পর্কে বুঝাতে হবে। অনলাইন ক্লাসের নামে প্রযুক্তির অপব্যবহারে শিক্ষার্থীরা যেন সাইবার অপরাধসহ প্রযুক্তিগত বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সব অভিভাবকদের সুদৃষ্টি দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ড. আনোয়ারা আলম দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, যেহেতু কোভিড একটি বৈশ্বিক সমস্যা। সেক্ষত্রে পুরো বিশ্ব জুড়েই এখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ

করছে। দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভেতর এক ধরণের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তবে করোনার এমন দুঃসময়ে শিক্ষার্থীদের ধারার রাখতে অভিভাবকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন পড়াশোনার বাইরে প্রযুক্তিগত নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পরে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতিতেও অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে।

নজরদারি

চীনের পশ্চিমাঞ্চল-পূর্ব তুর্কিস্তান। সুবিশাল মরুভূমি, পর্বত, উপত্যকা, গ্রাম আর শহরের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যাটেলাইট। একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর বেইস স্টেশনে ছবি পাঠাচ্ছে। এমনই একটা ছবিতে দেখা গেল, বিশাল ধূসর বালিময় প্রান্তর। খাঁ খাঁ করছে। জনবসতি বা প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। মঙ্গল গ্রহ বা চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি যেন। একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। দিনটা ছিল জুলাইয়ের ১২ তারিখ। ২০১৫ সাল। তিন বছর পর, ২০১৮ সালের ২২ এপ্রিলে বেইস স্টেশনে ঠিক একই জায়গার ছবি পাঠাল স্যাটেলাইট। এবারের ছবিটা আগের মতো বৈশিষ্ট্যহীন নয়। উল্লেখযোগ্য অনেক কিছুই চোখে পড়ল।

ধু ধু প্রান্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বিল্ডিং। ২ কিলোমিটার দীর্ঘ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ১, ২, ৩... মোট ১৬টি ওয়াচ টাওয়ার। নিরাপত্তার বহর দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে ভেতরে গোপন কিছু চলছে। কিছু আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গুগল আর্থ সফটওয়্যারের সাহায্যে এ রকম অসংখ্য স্থাপনার খোঁজ পাওয়া গেল পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে।

এগুলো কী?

কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

নিরাপত্তার এত কড়াকড়ি কেন?

আগস্টে জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস প্যানেল দাবি করল এগুলো আসলে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পাস।। চীন সরকার পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে শত শত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করেছে। প্রায় ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে এসব ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জাতিসংঘের Elimination of Racial Discrimination কমিটির সদস্য ম্যাকডোগালের মতে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। ২০ লাখের মতো। আবার অনেকেই দাবি করেছেন এই সংখ্যা ৩০ লাখ।

১৯৪৯ সালের দিকে একটি বই প্রকাশিত হয়। লেখক জর্জ অরওয়েল। বইয়ের নাম '১৯৮৪' (Nineteen Eighty-Four: A Novel)। এই বইয়ে বলা হয় ভবিষ্যতের এক সর্বগ্রাসী পুলিশি রাষ্ট্রের কথা-BIG BROTHER.

BIG BROTHER সার্বক্ষণিক নজরদারি চালায়। সব কথা শোনার, সবকিছু দেখার চেষ্টা করে। কেউ BIG BROTHER-এর মতের বিরুদ্ধে গেলেই আযাব নেমে আসে তার ওপর।

অরওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তবে ১৯৮৪ সালে না; ২০২০ সালে। চীনে। শুনতে হয়তো সায়েন্স ফিকশনের মতো লাগবে, কিছুটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে। কিন্তু এর পুরোটাই সত্যি!

নিরাপত্তার চাদরে একেবারে মুড়ে ফেলা হয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তানকে। তাদের অগোচরে একটা পাখিও যেন এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে চায় চীনের কমিউনিস্ট সরকার।

পূর্ব তুর্কিস্তানে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে বিস্তৃত ক্যামেরা সারভেইলেন্স বা নজরদারি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে চীন। বিবিসির ভাষায় পূর্ব তুর্কিস্তানে চীন এক 'All seeing State' তৈরি করেছে। পুরো পূর্ব তুর্কিস্তান জুড়ে লাগানো হয়েছে ফেসিয়াল রিকগনিশন ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭ কোটি সিসিটিভি ক্যামেরা! অফিশিয়াল ডাটা বলছে ২০২০ সালে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের পর্যবেক্ষণ করার কাজে চীন ব্যবহার করতে চলেছে প্রায় ৬৩ কোটি সিসি ক্যামেরা! চিন্তা করতে পারেন একবার! যেখনে উইঘুর কাযাখদের জনসংখ্যা আড়াই কোটির কাছাকাছি সেখানে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা ৬৩ কোটি! কী একটা অবস্থা!

এই সিসি ক্যামেরাগুলো যে কী করতে পারে না সেটাই এক রহস্য! সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রত্যেক পথচারীর চেহারা চিহ্নিত করে ফেলতে পারে। আরও কম সময়ে বলে দিতে পারে এই পথচারীর আইডি নম্বর, নাম। কার সাথে চেহারার মিল আছে, কোন গোত্রের, ধর্ম কী, আত্মীয় কারা, কাদের সাথে ওঠাবসা করে, গত এক সপ্তাহে কোথায় কোথায় তাকে দেখা গেছে, এখন সে ঠিক কোন জায়গায় আছে-বলে দিতে পারে নাড়িনক্ষত্র সব।

যদি কোনো পথচারী জোরে হাঁটে বা আস্তে হাঁটে, যদি কারও চেহারার এক্সপ্রেশন স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন কিছু হয়, যদি কোনো পথচারী ভুল জায়গায় চলে যায়, কারও গতিবিধি একটু যদি অস্বাভাবিক মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বরত পুলিশের কাছে তথ্য চলে যাবে। ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে ভেসে উঠবে সেই পথচারীর চেহারা-খুঁটিনাটি সব তথ্যসহ। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হতভাগাকে ঘিরে ধরবে পুলিশ।

সবগুলো গাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে জিপিএস ইন্সটল করিয়েছে পুলিশ। ক্যামেরার পুরো কন্ট্রোল পুলিশের হাতে, চাইলেই তারা ক্যামেরা চালু কিংবা বন্ধ করতে পারে। ইচ্ছেমতো ঘোরাতে পারে চারিদিকে। রাস্তায় বসানো ডিপ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-সমৃদ্ধ সিসি ক্যামেরা চাওয়ামাত্র জানিয়ে দেবে ড্রাইভারের নাম-পরিচয়, কত স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে, হুটহাট করে গতি কমবেশি করছে কি না, নো পারকিং জোনে পারকিং করছে কি না... সব।

শুধু তাই না, ক্যামেরার সাহায্যে যেকোনো জায়গায় ভার্চুয়াল ফেন্স তৈরি করা যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কেউ ভার্চুয়াল বেড়ায় ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। ফনা তোলা সাপের মতো ছুটে আসবে পুলিশ। রেফারেন্সের ভিডিওগুলো দেখলে পরিষ্কার ধারণা পাবেন, চীন সরকার কী ব্যাপকমাত্রায় নজরদারি করছে সিসিটিভি দিয়ে:

চীন: "বিশ্বের বৃহত্তম ক্যামেরা নজরদারি নেটওয়ার্ক" - বিবিসি নিউজ- https://tinyurl.com/y86ff6ne
চীনা রাস্তার নজরদারি। বস্তু/মুখ শনাক্তকরণ-https://tinyurl. com/y85sg47b
চীনের সম্পূর্ণ নজরদারি অবস্থার অভ্যন্তরে জীবন - https://tinyurl.com/y7rvnpvn
এমন এক নজরদারি রাষ্ট্র যা বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায়নি - https://tinyurl.com/tevpymk
যত ধরনের নতুন প্রযুক্তি আছে সবকিছু পূর্ব তুর্কিস্তানে নিয়ে এসে পরীক্ষা করছে চীন। টাকা খরচ করছে জলের মতো।
পূর্ব তুর্কিস্তানে গেলে মনে হবে পথ ভুল করে বোধহয় কোনো যুদ্ধের ফ্রন্টে চলে এসেছেন। একটু পরপরই দেখবেন গম্ভীর ভঙ্গিতে রাস্তায় বিশ্রাম নিচ্ছে চাইনিয 'টাইপ ৯৯ এ' ট্যাংক। আর্মার্ড কার, পুলিশ ভেহিকলের সাইরেনে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে এলাকা। ওপরের ফাঁকা জায়গাতে শিল্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে মাল্টি ব্যারেল মেশিনগানের ট্রিগারে হাত রেখে কড়া চোখে পথচারীদের মাপছে মিলিটারি! পুলিশ, সোয়াট, মিলিটারি, প্যারামিলিটারিতে একেবারে গিজগিজ করছে। পা ফেলার জায়গা যেন নেই। আগাগোড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকে ওরা- রায়ট গিয়ার, ফুল ইউনিফর্ম, হেলমেট, চেস্টগার্ড, হাতে ট্রেডমার্ক এসাল্ট রাইফেল QBZ-95! ২০১৫ সালের চাইতে ৬ গুণ বেশি পুলিশ নামানো হয়েছে এখন। পূর্ব তুর্কিস্তান বিশেষজ্ঞ আদ্রিয়ান যেনয জানাচ্ছেন, 'আগের ৭ বছর ধরে যত অফিসার নিয়েছিল পূর্ব তুর্কিস্তান পুলিশ, তার দ্বিগুণ অফিসার নিয়েছে এই দুই বছরে!'
'পুলিশি রাষ্ট্রের' একদম পারফেক্ট উদাহরণ হলো চীন। হিটলারের পতনের আগে জার্মানিজুড়ে এমনই পুলিশি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল নাৎসিরা। কিন্তু নজরদারির দিক থেকে অতীত-বর্তমানের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে চীন। নতুন সহস্রাব্দে চীন নতুন মাত্রা দিয়েছে ফ্যাসিজমকে।
রাস্তায় প্রতি ১০০ মিটার পরপর রোডব্লক তৈরি করে রেখেছে পুলিশ। চেকপয়েন্টগুলোতে হাত এবং বডি স্ক্যানার দিয়ে তল্লাশি করা হয় আপাদমস্তক। আইডি কার্ড স্ক্যান করা হয়, বাদ যায় না আইরিসও (চোখের মণি)।
পাবলিক ফ্যাসিলিটিতে (যেমন: হাসপাতাল, ব্যাংক, পার্ক, শপিংমল) ঢোকার আগে কিংবা মটর সাইকেল বা গাড়িতে তেল নেয়ার সময়ও উইঘুর, কাযাখদের মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দুটো আলাদা চেক পয়েন্টে ওদের তল্লাশি করা হয়। পুরো ব্যাপারটা সমন্বয় করা হয় IJOP (Integrated Joint Operations Platform) নামের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার দিয়ে।
২০১৭ সাল থেকে ১২-৬৫ বছরের সব মুসলিমের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ডিএনএ টেস্ট। চেহারা এবং শরীরের ছবি তোলা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাংগেল

থেকে। রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে, করা হয়েছে রেটিনা স্ক্যান। বাদ যায়নি চুল এবং ভয়েস রেকর্ডিং স্যাম্পল নেয়াও।

প্রত্যেকটা চেক পয়েন্টে এআই সিস্টেম থ্রিডি ছবি তোলে, আইডি স্ক্যান করে, স্ক্যান করে ব্যক্তির সাথে থাকা সব জিনিসপত্র। খুঁটিনাটি সকল তথ্য যাচাই-বাছাই করার পর ফলাফল দেখায় ডিসপ্লেতে-'এ ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নিরাপদ, একে যেতে দেয়া হোক', অথবা 'এ ব্যক্তি ঝুঁকিপূর্ণ'। ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করে পুলিশকে বলে দেয়া হয় কী করতে হবে- তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদ, আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ইন্টারোগেশন রুমে নিয়ে যাওয়া, নাকি গ্রেফতার করে একেবারে কারাগারে পাঠানো।

সব মুসলিম নাগরিককেই বাধ্যতামূলকভাবে তাদের স্মার্টফোনে জিংওয়াং নামের একটা অ্যাপ ইন্সটল করতে হয়েছে। ব্যবহারকারীদের সকল তথ্য (কন্ট্যাক্ট লিস্ট, ফোনে কী কী পড়া হলো, কী কী লেখা হলো, কোথায় কোথায় ফোন করা হলো, ব্যবহারকারীর অবস্থান কোথায় ইত্যাদি) সংগ্রহ করে IJOP সফটওয়্যারে পাঠিয়ে দেয় এই অ্যাপ। এই অ্যাপ ছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অ্যাপ আনইন্সটল বা স্লিপ মোডে রেখে দেয়া বা অন্য কারও মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩৬টা কাজকে সন্দেহজনক লেবেল দিয়ে কোড করা হয়েছে এই অ্যাপে। সেই 'সন্দেহজনক' কাজগুলোর কিছু নমুনা শুনবেন?

খুব বেশি বই পড়া, বেশি বেশি খাবারের অর্ডার করা, সাধারণের তুলনায় বেশি ইলেকট্রিক বিল আসা ইত্যাদি! যখন তখন বাসে বা ট্রেনে উঠে কিংবা রাস্তায় উইঘুর ও কাযাখদের থামিয়ে মোবাইল চেক করে স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ, প্যারামিলিটারি বা মিলিটারির সদস্যরা। মোবাইলে জিংওয়াং অ্যাপ না থাকলে ধরে নিয়ে যায়। সেই সাথে ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ভিপিএন টাইপের কোনো অ্যাপস আছে কি না চেক করে। এগুলো থাকলে কোনো কথা ছাড়াই চালান করে দেয় কারাগারে। চীনে শুধু উইচ্যাট ব্যবহার করার অনুমতি আছে। উইচ্যাটে কেউ পলিটিক্স বা ইসলাম নিয়ে কিছু লিখেছে কি না সেটাও চেক করা হয়। চেক করা হয় ফোনে ইসলামী কন্টেন্ট, নারী আত্মীয়ের হিজাব পরা ছবি, বিদেশি কারও ফোন নম্বর সেইভ করা আছে কি না। কোন কোন সাইটে ভিজিট করা হয়েছে দেখা হয় সেটাও।

উইঘুরদের বাসার ভেতরেও সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে চীন সরকার। পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট এলাকায় রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়েছে প্রত্যেক উইঘুরদের। এর বাইরে কোথাও যেতে হলে অবশ্যই পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। নির্ধারিত এলাকার বাইরে কেবল ৩০০ মিটার গেলেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। উইঘুরদের জন্য ২৭টি মুসলিম দেশে ভ্রমণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ!

জীবনযাত্রা একেবারে গতি হারিয়েছে। সারাক্ষণ অজানা এক ভয় ও অস্বস্তিতে ভোগে প্রত্যেক উইঘুর।
নিরাপত্তার এই কড়া ব্যবস্থায় হাঁপিয়ে উঠেছে খোদ হান চাইনিযরাও; যাদের হাতে উইঘুররা নির্যাতিত হচ্ছে বলে দাবি করছে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীরা।
মদের দোকানদার লি কিয়াং মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলছিল, 'এখানকার অবস্থা আসলেই খুব টাইট। কারোরই কোনো কিছু করার আগ্রহ নেই। পুলিশ এতবার আমার আইডি চেক করে যে, আমি বাইরে বের হতেই চাই না। বাজার করা বাদ দিয়ে দিয়েছি।'

মদের গন্ধভরা নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরোল লি কিয়াং এর বুক থেকে। ঝরে পড়ল খানিক অবসাদ।
হান চাইনিযদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে কাযাখ ও উইঘুর মুসলিমদের কী অবস্থা হতে পারে ভাবুন একবার!
একদম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে উইঘুরদের! জর্জ অরওয়েলের সেই উপন্যাসের মতোই- বড় ভাই তোমাকে দেখছে!
এই বেঁধে ফেলা যে কতটা ব্যাপক, কতটা সর্বগ্রাসী তা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকবে পাঠকের কাছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা প্রতিটি জীবের মধ্যে থাকা জিনগুলিকে পরিবর্তন করে। সমস্ত জীবের কোষে এমন কিছু জিন থাকে যা এই রাসায়নিক তথ্য বহন করে যা ব্যক্তির গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। (আল-মাওসুআহ আল-আরাবিয়াহ আল-আলামিয়্যাহ)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অনুমোদিত ব্যবহার

মানব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এমন কিছু যা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে উপকারী এবং অনুমোদিত, যেমন বংশগত রোগ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার জন্য অথবা এর প্রভাব কমাতে এর ব্যবহার, জিন সার্জারির মাধ্যমে যা একটি জিনকে অন্য জিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, অথবা রোগীর কোষে একটি জিন প্রবেশ করায়, অথবা অন্য জীবের মধ্যে একটি জিন প্রবেশ করায় যাতে সেই জিনটি আরও বেশি সংখ্যায় প্রতিলিপি করা যায় যাতে এটি কিছু রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিষিদ্ধ প্রয়োগ

আর কিছু ধরণের মানব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষতিকারক বা নিষিদ্ধ, যেমন ইউজেনিক্স নামে পরিচিত উদ্দেশ্যে জিনগত কাঠামো পরিবর্তন করার জন্য এটি ব্যবহার করা, অথবা একজন ব্যক্তির চরিত্র এবং অন্যান্য গুণাবলীকে প্রভাবিত করার জন্য জিনের সাথে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা, অথবা ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা, অথবা বিনোদন বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের উদ্দেশ্যে হাইব্রিড জীব তৈরির জন্য এটি ব্যবহার করা।



জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের জন্য ইসলামিক নির্দেশিকা

কুয়েতে ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর মেডিকেল সায়েন্সেসের এক সিম্পোজিয়ামে "বংশগতি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মানব জিনোম এবং জেনেটিক মেডিসিন: একটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ" শিরোনামে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। জেদ্দায় ইসলামিক ফিকাহ কাউন্সিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয় এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জন্য ইসলামিক অর্গানাইজেশনের অংশগ্রহণে ২৩-২৫ জুমাদা আল-আখিরা ১৪১৯ হিজরি/১৩-১৫ অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে এই সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিম্পোজিয়ামে বেশ কয়েকজন সিনিয়র আইনবিদ, ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, জৈবিক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ এবং মানবিক বিভাগের পণ্ডিতরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ছিল:

সিম্পোজিয়ামে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় এবং ১৯৭০-এর দশকে এর সূচনা থেকে এটি যে আপত্তি এবং ভয়ের সাথে ঘিরে রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কারণ যদি এটি

কোনও নির্দেশিকা বা বিধিনিষেধ ছাড়াই অনুশীলন করা হয়, তবে এটি একটি দ্বিধার তলোয়ার যা ভালো বা খারাপ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে।

সিম্পোজিয়াম মনে করে যে রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা বা প্রশমনের জন্য এটি ব্যবহার করা জায়েজ, তা জিন সার্জারির মাধ্যমেই হোক যা এক জিনকে অন্য জিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, অথবা রোগীর কোষে একটি জিন প্রবেশ করায়, অথবা অন্য জীবের মধ্যে একটি জিন প্রবেশ করায় যাতে সেই জিনটি আরও বেশি সংখ্যায় প্রতিলিপি তৈরি করা যায় যাতে এটি কিছু রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। তবে, প্রজনন কোষের উপর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার প্রতিরোধ করা উচিত, কারণ এটি সম্পর্কে শরীয়াহর আপত্তি রয়েছে।

এই সিম্পোজিয়ামটি রাষ্ট্রগুলির তাদের সীমিত আয়ের নাগরিকদের জন্য এই ধরনের পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, যাদের এটির প্রয়োজন, কারণ এটি প্রদান করা খুবই ব্যয়বহুল।

সিম্পোজিয়ামটি মনে করে যে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বাইরে হাইব্রিড প্রাণী তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জেনেটিক বাধা অতিক্রম করা অনুমোদিত নয়।

ইউজেনিক্স

ইউজেনিক্স, যাকে 'Good Birth' অথবা 'Good Creation'-ও বলা হয়। কিংবা মর্জিমাফিক চাহিদা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নবজাতক জন্ম দেয়া বা জিনোম সম্পাদনার মাধ্যমে নতুন প্রাণী তৈরি করা। একইভাবে, সিম্পোজিয়ামটি মনে করে যে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে ইউজেনিক্স নামে পরিচিত উদ্দেশ্যে জিনগত কাঠামো পরিবর্তনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা, অথবা মানুষের জিনগত গঠনের সাথে কোনও হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা, অথবা কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা অনুমোদিত নয়। এই সমস্ত বিষয় ইসলামী শিক্ষা অনুসারে নিষিদ্ধ।

এই সিম্পোজিয়াম মনে করে না যে কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও ভুল আছে, তবে সিম্পোজিয়াম সেইসব কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করতে পারে না যারা সম্প্রতি মানুষ, প্রাণী, কৃষি বা পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং এটি মনে করে যে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ উৎপাদিত খাদ্য উৎপাদনকারী কোম্পানি এবং কারখানাগুলিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (অথবা জেনেটিক পরিবর্তন - GMO) এর মাধ্যমে উৎপাদিত যেকোনো পণ্য বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা উচিত, যাতে ক্রেতা কী কিনছেন সে সম্পর্কে সচেতন থাকে। সিম্পোজিয়াম খাদ্যের জেনেটিক পরিবর্তনের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করারও সুপারিশ করে এবং তাদের বিশেষ করে

মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির পরামর্শ এবং সুপারিশ অনুসরণ করা উচিত।

এই সিম্পোজিয়ামে মুসলিম বিশ্বের ভোক্তাদের সুরক্ষা এবং শিক্ষিত করার জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশে বলা হয়েছে:

১. মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতদের বংশগতি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজ করে বই লেখা উচিত, যাতে এই বিষয়ে সচেতনতা এবং সমর্থন ছড়িয়ে পড়ে।

2. মুসলিম দেশগুলোর উচিত বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপর মনোযোগ দেওয়া ।" (মাজাল্লাত মাজমা` আল-ফিকহ আল-ইসলামী, সংখ্যা নং ১১, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৩৩)

এর ভিত্তিতে, মানব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করা এবং এটিকে কেবল উপকারী এবং অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করায় কোনও ভুল নেই।

টেষ্ট টিউবের মাধ্যমে প্রজনন এবং এতদসংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধান

টেষ্টটিউব পদ্ধতিটি জায়েজ না নাজায়েজ ! যেহেতু বিষয়টি নব উদ্ভুত বিষয়, তাই এ ব্যাপারে সরাসরি কোন বক্তব্য ফিক্বহের কিতাবে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই এ বিষয়ে অধমের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে নিজের পক্ষ থেকে লিখা নিরাপদ মনে হয়নি। তাই খুঁজছিলাম বিজ্ঞ আলেমদের কোন সমৃদ্ধ লিখা। আল্লাহর রহমতে ভারতের হায়দারাবাদের দারুল উলুম সাবিলুস সালামের পরিচালক বিজ্ঞ আলেম মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী সাহেবের একটি লিখা দেখতে পাই তাঁর প্রণীত “জাদিদ ফিক্বহী মাসায়েলে”। উক্ত লিখাটিই বাংলায় অনূদিত করাটাকে উপকারী হিসেবে মনে হওয়ায় তা সরল বাংলায় অনুদিত করতে চেষ্টা করেছি। বাকি অযোগ্যতার কারণে অনুবাদে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আশা করি পাঠকদের উপকারে আসবে এ অনুবাদটি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করুন। আমীন। (অনুবাদকঃ শাঈখ লুৎফুর রহমান ফরায়েজী)

টেষ্ট টিউবের মাধ্যমে প্রজনন

ডাক্তারী বিষয়ে প্রযুক্তিগত উন্নতী যেসব নতুন ফিক্বহী মাসআলার উদ্ভব করেছে তার মাঝে অন্যতম একটি মাসআলা হল “টেষ্টটিউবের মাধ্যমে প্রজনন”। এই উদ্ভাবন অনেক নোংরামীর দরজাকে খুলে দিয়েছে। অন্যদিকে সন্তান বঞ্চিত লোকদের জন্য এটি শুনাচ্ছে আশার বাণী। সচেতন নাগরীক হিসেবে আমাদের এ সকল বিষয়ে নোংরামী এবং খারাবীর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সাথে সাথে সত্যান্বেষী হিসেবে এটিরও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, যদি এর

কোন জায়েজ সুরত থাকে, সেটিকে অযথা না জায়েজ বলা থেকে বিরত থাকা। সেই সাথে কোন সুরত যদি জায়েজ হয়, তাহলে তৎসংশ্লিষ্ট ফিক্বহী হুকুম ও তার প্রভাবের ব্যাপারেও রাখতে হবে তীক্ষ্ণ নজর।

স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলার ডিম্বানু সংমিশ্রণ

মৌলিকভাবে টেষ্টটিউবের মাধ্যমে প্রজননের দু'টি পদ্ধতি। একটি হল-অপরিচিতা মহিলা ও পুরুষের ডিম্বানু ও শুক্রানো মিশ্রণ করে প্রজনন করা। চাই এ দুই অপরিচিত উৎসগিরি [ডিম্বানু ও শুক্রানু] কোন টিউবে একত্র করা হোক, বা সেই মহিলার জরায়ুতে বা অন্য কোন মহিলার জরায়ুতে হোক। অথবা সেই পুরুষের নিয়মসিদ্ধ ও শরয়ীতসিদ্ধ স্ত্রীর জরায়ুতে তা ফিট করা হোক।

এ পদ্ধতিটি একদমই না জায়েজ। কেননা এতে করে প্রজননে সংমিশ্রণ ঘটে। আর ব্যভিচারের মূল নিষিদ্ধতা এ কারণেই। এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা আছে-রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন-

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّى لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ » لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

(سنن ابى داود-كتاب النكاح، باب فِى وَطْءِ السَّبَايَ، رقم الحدي 2160-)

অনুবাদ-হযরত রুয়াইফি বিন সাবিত আনসারী রাঃ একদা খুতবাদানকালে বলেন-আমি কি তোমাদের বলব না যা আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি হুনাইন যুদ্ধের দিন? তিনি বলেছেন-আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে তার পানি [বীর্য] দিয়ে অন্য কারো জমি [জরায়ু] প্রবাহিত করবে। {সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২১৬০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬৯৯০, মুসন্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৭৭৪৯, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৪৪৮২}

এ মিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্যই বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালনকে আবশ্যক করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহঃ লিখেন-

منها معرفة براءة رحمها من مائه ، لئلا تختلط الأنساب ، فان النسب أحد ما يتشاح به ، ويطلبه العقلاء ، وهو من خواص نوع الانسان ، ومما امتاز به من سائر الحيوان ،) حجة الله البالغة، كتاب النكاح، باب العدة(2/13-

অনুবাদ-ইদ্দত পালনের উপকারিতার মাঝে এটাও একটা যে, এর দ্বারা মহিলার জরায়ু পূর্ব স্বামীর উৎসগিরি [ডিম্বানু] থেকে মুক্ত হওয়া বুঝা যায়। যেন বংশে সংমিশ্রণ সৃষ্টি না হয়। কেননা বংশ এটি এমন বিষয় যার কামনা করা হয়। আর জ্ঞানীরা যার অনুসন্ধানী। যা মানুষের বিশেষত্ব। এর মাধ্যমে মানুষ অন্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্টমন্ডিত। {হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-২/১৩}

সুতরাং পুরুষ ও নারীর উৎসগিরির সংমিশ্রণের সকল পদ্ধতিই গোনাহের কাজ। আর হুকুমের দিক থেকে ব্যভিচার। তবে যেহেতু হদ [শরীয়ত নির্দিষ্ট শাস্তি] সাধারণ সন্দেহর কারণেও বাদ হয়ে যায়, আর এখানে সেই সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা ব্যভিচার হল দুই গায়রে মাহরামের মাঝে না জায়েজ শারিরিক কর্ম অর্থাৎ শারিরিক সম্পর্কের নাম, আর এ পদ্ধতিতে উক্ত বিষয়টি বাহ্যিকভাবে অনুপস্থিত। এছাড়াও ব্যভিচারের মাঝে পুরুষ ও নারী একজন অপরজনের শরীর উপভোগ করে। আর এ প্রকারের যান্ত্রিক কাজে সে ধরণের শারিরিক মজা অনুভূত হয় না, তাই জিনার নির্ধারিত হদ তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর হবে না।

কিন্তু যেহেতু এ কর্মটি মৌলিকত্বের দিক থেকে ব্যভিচারের মতই ক্ষতিকর। তাই বিচারক এ কারণে ন্যায্য শাস্তি প্রয়োগ করবে।

যদি সে মহিলাটি কোন পুরুষের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্য কোন পুরুষের বীর্য দ্বারা অন্তসত্মা হয়,অথবা সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে সে সন্তানের বংশ স্ত্রীর আসল স্বামী থেকেই হবে। কারণ বংশ প্রমাণের অধ্যায় ফিক্বহী মুলনীতি হল-যা রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-

عنأبى هريرة : قال النبي صلى الله عليه و سلم) الولد للفراش وللعاهر الحجر) صحيح البخارى- كتاب الحدود، باب للعاهر الحج، رقم الحديث(6432 -

অনুবাদ-হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-সন্তান হবে তার বিছানা হল যার, আর লম্পটের জন্য হল পাথর নিক্ষেপন। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৪৩২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৬৮৮, তাহাবী শরীফ, হাদীস নং-৪৩১৪}

আর স্ত্রীকে তার স্বামীর বিছানা নির্ধারিত করা হয়েছে [হেদায়া-২/৪৩, বাবু সুবুতিন নাসাব]। এমনকি অবিবাহিত মেয়েও যদি এ পদ্ধতিতে মা হয়, তাহলেও সে পুরুষ থেকে বাচ্চার বংশ প্রমাণিত হবে না, যার বীর্য দ্বারা সে গর্ভ ধারণ করেছে, বরং বংশ সাব্যস্ত হবে জন্মদায়িনী মেয়ের পক্ষ থেকে। যেমন ব্যভিচারের দ্বারা জন্ম নেয়া বাচ্চার হুকুম।

হ্যাঁ, যদি কোন অপরিচিত মেয়ের ডিম্বানু সংগ্রহ করা হয়, তারপর তা কোন পুরুষের শুক্রানুর সাথে টিউবের মাঝে সংমিশ্রণ করা হয়। তারপর পরাগায়িত সংমিশ্রণটি সেই পুরুষের বৈধ স্ত্রীর গর্ভে স্থানান্তর করা হয়। আর তার স্ত্রী তা গর্ভে ধারণ করে, তাহলে এ থেকে জন্ম নেওয়া বাচ্চার মা হবে সে গর্ভধারণকারী মহিলা। কেননা কুরআনে মা সে মহিলাকে বলা হয়েছে যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। {সূরা মুজাদালা-২)

যখন পুরুষটির স্ত্রী মা হল, তখন বাচ্চা তার বিছানা থেকেই হল, এজন্য লোকটি বাচ্চার পিতা সাব্যস্ত হবে। আর গর্ভে ধারণকারী মায়ের স্বামী থেকেই বংশ প্রমাণিত হবে।

থেকে গেল সে মহিলার কথা, যার ডিম্বানু প্রজননের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে মহিলার অবস্থান মা হিসেবে হবে না। কেননা শরীয়তে এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ঠ নয় যে, প্রসূত বাচ্চা

কারো অংশ হওয়া। বরং এটাও জরুরী যে, স্বীয় প্রজননে যে পুরুষ-নারীর অংশ হল সেটা জায়েজ ও হালাল পদ্ধতিতে হতে হবে। এ কারণেই ব্যভিচারের দ্বারা বংশ প্রমাণিত হয় না। অথচ প্রসূত বাচ্চা ব্যভিচারীর অংশ থেকেই হয়েছে। আর দুগ্ধপানের সময়সীমা দুই বছর অতিক্রান্তের পর মহিলার দুধ পান করলে দুধ মায়ের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না, যেহেতু এ দুগ্ধপান শরীয়তসিদ্ধ ও বৈধ পদ্ধতিতে হয়নি। তবে যেহেতু ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর মতে বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাই ব্যভিচারের দ্বারাও বিবাহ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। এ কারণে প্রসূত বাচ্চার জন্য যার শুক্রানু দ্বারা বাচ্চার প্রজনন হল তার সকল খান্দানের সাথে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হয়, তেমনি যে মহিলার ডিম্বানু দ্বারা প্রজনন হল সেই মহিলার খান্দানের সাথে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হবে। ঠিক তেমনি সেই মহিলার খান্দানের সাথেও বিবাহ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে, যার গর্ভে বাচ্চাকে ধারণ করে প্রসবের কষ্ট সহ্য করেছে।

স্বামী স্ত্রীর উৎসগিরি [শুক্রানু ও ডিম্বানু] সংমিশ্রণ

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল-স্বামী ও স্ত্রীর উৎসগিরিকে সংমিশ্রণের মাধ্যমে প্রজনন করা। এর তিনটি পদ্ধতি হতে পারে-

১-স্বামীর শুক্রানু ইনজেকশনের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে পৌঁছানো।

২-স্বামী ও স্ত্রীর উৎসগিরি [শুক্রানু ও ডিম্বানু] সংগ্রহ করে তা টিউবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখা হবে। তারপর সেটি মহিলার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হবে।

৩-স্বামী ও স্ত্রীর উৎসগিরি সংগ্রহ করে সেই স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভে স্থানান্তরিত করে দেয়া হবে। এ কারণে যে, প্রথম স্ত্রী গর্ভ ধারণে সক্ষম না হয় অসুস্থতার কারণে বা অক্ষমতার কারণে।

এ পদ্ধতিগুলোতে একটি প্রশ্ন তো এটি হয় যে, এ পদ্ধতিগুলো কি শুধুমাত্র সন্তানের বাবা-মা হওয়ার আগ্রহ ও মনের প্রশান্তির কারণে জায়েজ হবে?

দ্বিতীয়ত প্রসূত সন্তানের বংশ পিতা-মাতা থেকে প্রমাণিত হবে?

তৃতীয়ত তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রসূত সন্তানের মা কে হবে? যার ডিম্বানু সংগ্রহ করা হয়েছে সে হবে মা? না কি যার গর্ভে লালিত হয়েছে ভ্রুণ এবং যে সন্তান ধারণের কষ্ট সহ্য করেছে সে হবে মা?

প্রথমে আমাদের এটা ভাবতে হবে যে, এমন করা জায়েজ আছে কি না?

যারা এ পদ্ধতিগুলোকে না জায়েজ বলেন এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হল ৩টি। যথা-

১-পুরুষকে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্য বের করার দরকার হবে। আর হস্তমৈথুন করা জায়েজ নয়।

২-পুরুষ ও নারীর সতর খুলতে হবে। বিশেষ করে নারীরতো হবেই। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রয়োজন ছাড়া ডাক্তারের সামনেও সতরহীন হওয়া জায়েজ নয়।

৩-এ পদ্ধতিটি স্বাভাবিক রীতি বিরুদ্ধ কাজ। আর শরীয়তের আম নীতি হল-স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বিষয়কে বাঁধা দেয়।

হস্তমৈথুনের বিষয়টিতো শরীয়ত সুনিশ্চিত নিষিদ্ধ করেছে। আর জমহুর ফুক্বাহারা এটাকে না জায়েজ বলেছেন। কিন্তু যেখানে তীব্র প্রয়োজন হয়, সেখানে এটাকে জায়েজ ও বলেছেন। আব্দুর রশীদ তাহের বুখারী রহঃ লিখেন-

ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان ان قصد قضاء الشهوة وان قصد تسكين الشهوة أرجو أن لا يكون عليه وبال

(خلاصة الفتاوى1/26)

অনুবাদ-এ কর্মটি [হস্তমৈথুন] রমযান ছাড়া অন্য সময়ে [রমযানের মতই] হালাল হবে না, যদি মনের কুপ্রবৃত্তির জন্য এমনটি করে। তবে যদি উন্মদনার প্রাবল্যতা কমাতে এমনটি করে তাহলে আশা করা যায় কোন শাস্তি হবে না। (খুলাসাতুল ফাতওয়া-১/২৬)

আমাদের জমানার ডাক্তারী গবেষণা, ও পরীক্ষার জন্য এর অনুমতি দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

কথা হল-সন্তানের পিতা-মাতা হওয়া একটি স্বভাবজাত আগ্রহ। আর কখনো কখনো এ আগ্রহ এতটাই বেড়ে যায় যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে তা জরুরতের পর্যায়ে উপনীত হয়ে যায়। অন্যান্য ফুক্বাহায়ে কিরাম কিছু এমন কাজকে জায়েজ বলেছেন-যা পরিণতির দিক থেকে একেবার হস্তমৈথুনের মতই। যেমন-আজল করা তথা স্ত্রীর সাথে এমনভাবে সহবাস করা যে, যখন বীর্য স্খলীত হওয়ার সময় হয়ে যাবে, তখন বিশেষ অঙ্গ বের করে বাহিরে বীর্যপাত করা। ভিতরে নয়। হানাফীদের মতে এ পদ্ধতিটি জায়েজ। হস্তমৈথুনে যেমন উত্তেজনা প্রশমিত করা হয়, আর বীর্যকে করা হয় নষ্ট, তেমনি আজল করে উত্তেজনা প্রশমিত করা হয়, আর বীর্যকে নষ্ট করা হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মহিলার শরীর দ্বারা আনন্দ লাভ করার বদলে হস্তমৈথুনে স্বীয় হাতে আনন্দ লাভ করে।

হস্তমৈথুন নিষিদ্ধতার কারণ হল-এভাবে মানুষ প্রাণ সঞ্চারী বীর্যকে মূল কাজে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যহীন ব্যবহার করে এবং অযথা নষ্ট করে। এবার ভেবে দেখুন-যদি বৈজ্ঞানিক প্রজননের জন্য হস্তমৈথুন করা হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্যই পাল্টে যাচ্ছে। এখানে হস্তমৈথুন দ্বারা প্রাণ সঞ্চারী বস্তুকে নষ্ট করা নয়। বরং এটাকে ফলবান ও কার্যকরি করার জন্যই করা হচ্ছে। তাই এ পদ্ধতিটি নিষিদ্ধতার অধীনই নয়।

দ্বিতীয় কারণ তীব্র প্রয়োজন ছাড়া সতরহীন হওয়া জায়েজ নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি একটি শক্তিশালী কারণ, যা তা নিষিদ্ধ হওয়ার উপর দাঁড় করানো যায়। কিন্তু চিন্তা করুন-এক হল সন্তান লাভ করা একটি অনিস্বিকার্য তীব্র আকাংখা হয়। বিশেষ করে

মহিলাদের ক্ষেত্রে। সন্তানহীনতার প্রভাব মহিলাদের অনেক সময় শারিরিক-মানসিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে দেয়। কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর মাঝে এ ব্যাপারটি একটি শক্ত মন কষাকষির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি বিচ্ছেদের মত ঘটনাও ঘটে থাকে। কখনো নাজায়েজ পদ্ধতিতে গর্ভ হওয়ার মত গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বাসনাও মনে জাগরিত করে তোলে।

এ কারণে এ ব্যাপারটি সাধারণ মহিলাদের জন্য এটা বলা যায় যে, এটা জরুরী নয়। কিন্তু কিছু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে তা জরুরতের পর্যায়ভূক্ত হতে পারে।

এবার যখন আমরা ফিক্বহী ইবারত দেখি, তখন স্পষ্ট জানা যায় যে, কিছু এমন সুরতেও সতরহীন হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যেটা মূলত কোন কঠিন অসুখ নয়, কিন্তু সম্ভাবনার সাথে কঠিন অসুখ হতে পারে, যেমন সন্তানহীনতা কখনো কঠিন রোগের কারণ হতে পারে, আল্লামা সারখসী রহঃ লিখেন-

فى المبسوط -وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا كان به هزال فاحش وقيل له أن الحقنة تزيل ما بك من الهزال فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن وهذا صحيح فإن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق والسل) المبسوط السرخسى -كتاب المبسوط – الجزء العاشر-1/156)

অনুবাদ-ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ থেকে বর্ণিত। যদি কারো চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বলতা দেখা দেয়, আর তাকে বলা হয় যে, ইঞ্জেকশন পুশ করার দ্বারা তার দুর্বলতা দূরিভূত হতে পারে, তাহলে তার জন্য কোন সমস্যা নেই ইঞ্জেকশনের জন্য সে স্থান [পায়খানার স্থান] খুলে দেয়াতে। আর সঠিক কথা হল অধিক দুর্বলতাও একটি অসুখ। যার সমাপ্তি চিকন হয়ে যাওয়া বা যক্ষা দ্বারা হয়। {মাবসূতে সারাখসী-১/১৫৬}

এ রায়টিতো কাযী আবু ইউসুফ রহঃ এর।

যৌনশক্তি বৃদ্ধি ফুক্বাহাদের বর্ণানাভঙ্গি দ্বারাতো জরুরতের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত হয় না, যেমন খোদ সারাখসী রহঃ ই তা জরুরতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা অস্বিকার করেছেন। কিন্তু ফিক্বহের এক মহান উদ্ভাবক ইমাম শাফী রহঃ এর নিকট যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্যও ইঞ্জেকশন দেয়া, এবং ইঞ্জেকশনদাতার সামনে আব্রুহীন হওয়া জায়েজ। সারাখসী রহঃ নিজেই বর্ণনা করেন-

وحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا قيل له أن الحقنة تقويك على المجامعة فلا بأس بذلك أيضا) المبسوط السرخسى -كتاب المبسوط – الجزء العاشر(1/156-

অনুবাদ-ইমাম শাফী রহঃ থেকে বর্ণিত। যদি অসুস্থকে বলা হয় যে, তাকে ইঞ্জেকশন দিলে তার ভিতরে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাবে, তাহলে ইঞ্জেকশন দেয়া দেয়া জায়েজ। {মাবসুতে সারখসী-১/১৫৬}

[বিঃদ্রঃ এখানে আরবী ইবারতের হুকনা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চাদ্দেশে অসুধ প্রবিষ্ট করানো। যার অনুবাদ করা হর ইঞ্জেকশন বলে।]

কখনো ফুক্বাহায়ে কিরাম সুন্নাত আদায়ে বা এমন বিষয়ের জন্যও সতরহীন হওয়ার অনুমোদনের কথা বলেছেন যা শুধু মুবাহ বিষয় বা একবার করার যোগ্য।

পুরুষের খতনা করা সুন্নাত। কিন্তু সতরহীন হওয়া হারাম। আর মহিলাদের খাতনা করা জায়েজ, কিন্তু ফুক্বাহায়ে কিরাম একেও প্রয়োজন ও ওজরের সীমারেখায় প্রবিষ্ট করিয়েছেন। আর এজন্য সতরহীন হওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

প্রসিদ্ধ ফক্বীহ আলাউদ্দীন সামারকন্দী যার "তুহফাতুল ফুক্বাহা" গ্রন্থকে আল্লামা কাসানী রহঃ তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "বাদায়েউস সানায়ে" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সাব্যস্ত করেছেন, তিনি বলেন-

ولا يباح النظر والمس الى مابين السرة والركبة الا فى حالة الضرورة بان كانت المرأة ختانة تختن النساء

(تحفة الفقهاء 3/334

অনুবাদ-নাভি ও হাটুর মাঝামাঝি অংশ দেখা এবং স্পর্শ করা জায়েজ নয় প্রয়োজন ছাড়া এবং মহিলাকে খতনা করার সময় খতনাকারী মহিলা ছাড়া। {তুহফাতুল ফুক্বাহা-৩/৩৩৪}

মোটা হওয়া কোন জরুরত? না প্রয়োজন? তবু ফুক্বাহায়ে কিরাম এর অনুমোদন দিয়েছেন। খোলাসাতুল ফাতওয়াতে সংকলক বলেন-

لا بأس بالحقنة لأجل السمن هكذا روى عن ابى يوسف

خلاصة الفتاوى(4/363-

অনুবাদ-মোটা হওয়ার জন্য ইঞ্জেকশন দেয়া জায়েজ, এমনটিই বর্ণিত ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ থেকে। {খুলাসাতুল ফাতওয়া-৪/৩৬৩}

সন্তানের মা-বাবা হওয়ার আকাংখাতো প্রাকৃতিক আকাংখা। ফুক্বাহায়ে কিরাম মহিলাদের এ আকাংখাকেও দৃষ্টিযোগ্য নয় বলে সাব্যস্ত করেন নি। তাইতো স্বামীকে খুশি করতে মোটা হওয়ার জন্যও ইঞ্জেকশন নেয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে এসেছে-

والمرأة اذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به) الفتاوى الهندية، كتاب الأضحية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وقلم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها(5/356-

অনুবাদ-মহিলা যদি নিজের স্বামীর জন্য মোটা হতে চায়, তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। {ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৫৬}

টেষ্ট টিউবের সাহায্য নিয়ে সন্তান ধারণ মূলত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ফুক্বাহায়ে কিরাম মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েলকে ১-জরুরত, ২-হাজাত তথা প্রয়োজন, ৩-সৌন্দর্যবর্ধক এ তিন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেছেন।

আর নিষিদ্ধ বিষয়কে কেবল সে সময় জায়েজ বলেছেন, যখন জরুরত বা হাজাত এটার অনুমোদনকে চায়। কিন্তু ফুক্বাহাদের শাখাগত মাসায়েল দেখলে বুঝা যায়, অসুখ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা একটু বেশিই সুযোগ দিয়েছেন। আর সহজতা ও সহজলভ্যতার সিদ্ধান্ত

দিয়েছেন। যেমন উল্লেখিত মোটা হওয়ার কোন জরুরত নেই, তারপরও আলমগীরীতে বলা হয়েছে-

وسئل ابو مطيع ان إمرأة تأكل القبقبة وأشباه ذلك تلتمس السمن، قال لا بأس به مالم تأكل فوق الشبع واذا اكلت فوق الشبع لا يحل) الفتاوى الهندية، كتاب الأضحية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وقلم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها(5/356-

অনুবাদ-আবু মুতী রহঃ এর কাছে এক মহিলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল যে মোটা হওয়ার জন্য শামুক এবং এ জাতীয় বস্তু খায়, তখন তিনি বললেন-যদি পেট ভরে না খায়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। পেট ভরে খেলে জায়েজ নয়। {ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৫৬}

এ কারণে অধমের ধারণা হল সন্তানহীন মা-বাবার সন্তান লাভ করা একটি প্রাকৃতিক আকাংখা এবং স্বাভাবিক চাহিদা। এ কারণে পুরুষের জন্য পুরুষ ডাক্তারের সামনে আর মহিলার জন্য মহিলা ডাক্তারের সামনে বেআব্রু হওয়া জায়েজ আছে।

আর তৃতীয় বিষয়টি তথা এটি স্বাভাবিক রীতি বিরুদ্ধ বিষয়। এটি নিষিদ্ধতার কোন শক্তিশালী দলিল নেই। একটি প্রাকৃতিক চাহিদা সম্পাদনের জন্য এমন রীতিবিরুদ্ধ সুরত অবলম্বন করা যা নিষিদ্ধতার কোন আয়াত বা হাদীস নেই সেটি জায়েজ হতেই পারে।

অষুধ পৌছানোর পথ হল মুখ এবং খাদ্যনালী দিয়ে। কিন্তু উপকারীতার কারণে ইঞ্জেকশনের তথা পিছনের রাস্তা দিয়ে পৌঁছানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

বাচ্চা প্রসবের আসল রাস্তা হল মহিলাদের লজ্জাস্থান। কিন্তু প্রয়োজনের সময় অপারেশনের অনুমতি আছে। এজন্যই কোন কারণ নেই যে, অপারগতার সময় এ রীতি বিরুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে বাঁধা দেয়া হবে। সুতরাং সন্তানহীন/সন্তানহীনাদের জন্য এ রীতি বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে সন্তান লাভ করা জায়েজ আছে।

টিউব বেবির বংশ কার থেকে ধরা হবে?

এখানে একথাটিতো স্পষ্ট যে, যে পুরুষের শুক্রানু হবে সেই হবে প্রসুত বাচ্চার পিতা। বংশ প্রমানের জন্য স্বামীর শুক্রানু দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী হওয়াই যথেষ্ঠ। এটা জরুরী নয় যে, শারিরিকভাবে তার সাথে সঙ্গম করে।

আর টেষ্ট টিউব পদ্ধতিটি একদমই নতুন পদ্ধতি। এ কারণে এ ব্যাপারে ফিক্বহী কিতাবে সরাসরি হুকুম পাওয়া কঠিন। তবে এমন কিছু ইবারত পাওয়া গেছে যার দ্বারা সঙ্গম ছাড়াও সন্তান ধারণ সম্ভব বলে স্বীকার করা হয়েছে, এবং বংশ প্রমাণিত করা হয়েছে। যেমন-

رجل عالج جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها فعلقت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولد له) الفتاوى الهندية-كتاب الدعوى، الدعوة ثلاثة أنواع(3/347-

অনুবাদ-কোন ব্যক্তি তার বাদির জরায়ুর বাহিরে সঙ্গম করল। বীর্যপাতও করল। তখন বাদি সে শুক্রকে কোন কিছুতে মিলিয়ে নিজের জরায়ুতে প্রবিষ্ট করিয়ে দিল। আর এতে করে সে গর্ভবতী হয়ে যায়। তাহলে ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর মতে প্রসূত বাচ্চাটি মনীবের হবে। আর বাদিটি মনীবের উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী-৩/৩৪৭)

একথাটিতো স্পষ্ট যে, মহিলার ডিম্বানু যদি সে মহিলাই তার গর্ভে ধারণ করে তাহলে সে তার মা গণ্য হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল-যদি এক মহিলার ডিম্বানু আরেক মহিলার গর্ভে ধারণ করে, আর সে গর্ভবতী থেকেই বাচ্চা প্রসব হয়, তাহলে বাচ্চার মা কে হবে? এ ব্যাপারে ফুক্বীহদের মতভিন্নতা পাওয়া যায়। কারো কারো মতে বাচ্চা সে মহিলার হবে যার ডিম্বানু ছিল। আর একদলের মতে মা সে মহিলা হবে যার গর্ভে তা ধারণ করে তা লালিত হয়েছে।

মূল কথা হল-দলিলের হিসেবে এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তো উভয় রায় যৌক্তিক। যে মহিলার ডিম্বানু সংগ্রহ করা হয়েছে সে এজন্য মা, যেহেতু সে বাচ্চাটি তারই অংশ। আর বংশ ও হারাম হওয়ার সম্পর্ক এ অংশ হওয়ার উপরই। হেদায়া প্রণেতা ব্যভিচারের কারণে হুরমতে মুসাহারাত তথা আজীবনের জন্য বিবাহ হারাম হওয়ার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে এ সুক্ষ্ম কথাটি এভাবে এনেছেন

أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما- الهدية-كتاب النكاح، فصل فى بيان المحرمات.

অনুবাদ-সঙ্গম প্রসূতের ক্ষেত্রে অংশ হওয়ার কারণ। এ কারণেই প্রসূতকে স্বামী স্ত্রী উভয়ের দিকেই সম্বোধিত করা হয়। {হেদায়া, বিবাহ অধ্যায়, মুহাররামাত পরিচ্ছেদ)

আরবীতে মাকে "উম্ম" বলা হয় এ দিকে লক্ষ্য করেই। "উম্ম" মূল ও শিকড়কে বলা হয়। উল্লেখিত মহিলার ডিম্বানু যেহেতু তার প্রজনের জন্য মূল এবং ভিত্তি, তাই আবশ্যক হল তাকে "মা" সাব্যস্ত করা।

সাথে সাথে দুগ্ধপানের মাসআলাও এ বিষয়টিকে জোরালো করে। দুগ্ধপানের কারণে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে, মহিলার স্তন থেকেই দুধ পান করতে হবে। বরং অন্যকোনভাবে পান করলেও দুগ্ধপানের কারণে "হুরমতে রিযায়াত" সাব্যস্ত হয়ে যায়। তেমনি মহিলার ডিম্বানু অন্যকোনভাবে প্রজনন হওয়ার মাধ্যমেও মায়ের সম্পর্ক প্রমাণিত করাকে চায়।

যে ফক্বীহরা ঐ মহিলাকে মা সাব্যস্ত করেছেন যে গর্ভধারণ করে, ও যার গর্ভে লালিত হয়, তাদের জন্য সবচে বড় দলিলতো কুরআনে কারীমের আয়াত, যাতে মাকে ওয়ালেদা তথা বাচ্চাকে গর্ভে লালনকারী শব্দে উদ্ধৃত করেছে। তারপর বাচ্চাটি সে সন্তানের অংশ সাব্যস্ত হয়ে যায়।

তাই এ মাসআলাটি আরো বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করার বিষয়। ফিক্বহী কিতাবে দৃষ্টি বুলালে পাওয়া যায়, এক সন্তানের বংশ দুই ব্যক্তি থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন-

وإذا كانت جارية بين اثنين وجاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما) الجوهرة النيرة، كتاب النكاح(2/6-

অনুবাদ-দুই ব্যক্তির এক বাদি। সে বাদি বাচ্চা প্রসব করলে উভয় মালিকই যদি সন্তানের পিতা দাবি করে, তাহলে বংশ উভয় থেকেই সাব্যস্ত হবে। (আল জাওহারাতান নায়্যিরাহ-২/৬)

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহঃ জাহিরিয়্যাহ এর বরাত দিয়ে এ বিষয়টিকে কিছুটা পার্থক্যসহ লিখেছেন-

وفي الظهيرية والجارية بين اثنين إذا جاءت بولد فادعياه حيث يثبت النسب من كل واحد منهما ينفرد كل واحد منهما بالتزويج - البحر الرائق-كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء(3/119-

অনুবাদ-দুই ব্যক্তির মাঝে শরিকানা বাদির যদি সন্তান হয়, আর উভয়ে একে নিজের সন্তান দাবি করে, তাহলে বংশ উভয় থেকেই সাব্যস্ত হবে। উভয়েরই একে বিবাহ করার অধিকার অর্জিত হবে। {আল বাহরুর রায়েক-৩/১১৯}

এ আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, বিবাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় মহিলাকেই বাচ্চার জন্য আসল মা হিসেবে হুকুম আরোপিত হবে। আর লালন পালন ও মিরাসের ক্ষেত্রে ঐ মহিলাকে আসল মা বলা হবে, যার পেটে সন্তান লালিত হয়েছে। অর্থাৎ যে তা প্রসব করেছে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ

অনুবাদ-তার মা সেই যে তাকে পেটে ধারণ করেছে। {সূরা মুযাদালা-৩}

আমরা উপরোল্লিখত আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানতে পারি-

১-ডিম্বানু যদি স্বীয় স্ত্রীর হয়, আর শুক্রানু হয় স্বামীর তাহলে টিউবের মাধ্যমে প্রজনন হলে, বা উক্ত মহিলার গর্ভেই তা লালিত হয়ে প্রসব হলে এ পদ্ধতিটি সন্তানের জন্য দিশেহারা পরিবারের জন্য জায়েজ আছে।

২-অপরিচিত মহিলার ডিম্বানু, বা অপরিচিত পুরুষের শুক্রানু দ্বারা প্রজনন জায়েজ নয়। কারণ এটা জিনা তথা ব্যভিচারের মতই।

৩-এক মহিলার ডিম্বানু আর আরেক মহিলার গর্ভে যদি সে ডিম্বানু দ্বারা বাচ্চা প্রসব করানো হয়, তাহলে ডিম্বানু যার সেও উক্ত বাচ্চার মা হিসেবে হুরমতে মুসাহারাত তথা সে মহিলার পিতা-মাতা তথা তাদের উপরের ব্যক্তিরা এবং তাদের নিচের তথা সন্তানরা সে বাচ্চার জন্য বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হবে।

সেই সাথে যার গর্ভে জন্ম নিল সেও মা হবে।

ইসলামে কি মানুষের ক্লোনিং জায়েয?

মানুষের ক্লোনিং নিষিদ্ধ কারণ এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ করে এবং সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোকে ব্যাহত করতে পারে। তবে, ইসলামী নির্দেশিকা অনুসারে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীবের ক্লোনিং প্রযুক্তি অনুমোদিত।

মানুষের সৃষ্টি: আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঐশ্বরিক সম্মান

আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। আল্লাহ বলেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

{আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে হালাল (হালাল) জিনিসপত্র দিয়ে রিযিক দিয়েছি এবং তাদেরকে আমার সৃষ্টির অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।} [আল-ইসরা' ১৭:৭০]

আল্লাহ তাকে যুক্তি ও দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং পৃথিবীতে জনবহুল ও বিকশিত করার জন্য তাকে খলিফা করেছেন। তিনি মানুষকে তার ফিতরাহ (প্রাকৃতিক অবস্থা) অনুসারে বার্তা প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এটিই ফিতরাহ, যেমন আল্লাহ বলেছেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

{অতএব, তুমি (হে মুহাম্মদ) তোমার মুখমণ্ডল হানীফ ধর্মের দিকে স্থির করো। আল্লাহর ফিতরাহ (অর্থাৎ আল্লাহর ইসলামী একত্ববাদ) যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। খালক্ব-ইল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর ইসলামী একত্ববাদ) কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [আর-রুম ৩০:৩০]

ইসলামের মানব মর্যাদা ও বংশ রক্ষা

ইসলাম মানুষের সঠিক ফিতরাহ সংরক্ষণে আগ্রহী, পাঁচটি সামগ্রিক লক্ষ্য: ধর্ম, জীবন, যুক্তি, বংশ এবং সম্পত্তি সংরক্ষণ করে এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে এমন যেকোনো পরিবর্তন থেকে রক্ষা করে, তা তার কারণ বা প্রভাবের কারণেই হোক। আল-কুরতুবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস কুদসীতে এটি বলা হয়েছে, যা আল-কাদী ইসমাঈলের বর্ণনা থেকে বর্ণিত হয়েছে, [যেখানে আল্লাহ বলেন]: "আমি আমার সকল বান্দাকে হানিফ (বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী) হিসেবে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তানরা তাদের কাছে আসে এবং তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে... এবং তারা তাদের আদেশ দেয় যে তারা আমার সৃষ্টি পরিবর্তন করুক।" (তাফসির আল-কুরতুবী, ৫/৩৮৯)

আল্লাহ মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না, এবং তাকে অনুসন্ধান, পরীক্ষা, চিন্তা ও চিন্তা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি অনেক আয়াতে বলেছেন, যেমন নিম্নলিখিত (অর্থের ব্যাখ্যা):

{তারা কি দেখেনি...} [ত্বা-হা ২০:৮৯]

{তারা কি দেখে না...} [আল-গাশিয়াহ ৮৮:১৭]

{মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে নূতফা (পুরুষ ও নারীর মিশ্র বীর্য) থেকে সৃষ্টি করেছি?} [ইয়া-সিন ৩৬:৭৭]

{নিশ্চয়ই, এই বিষয়গুলিতে চিন্তাশীলদের জন্য আয়াত (প্রমাণ, প্রমাণ, শিক্ষা, নিদর্শন ইত্যাদি) রয়েছে।} [আর-রা'দ ১৩:৩]

{নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।} [আন-নাহল ৬:৬৭]

{নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে।} [আয-যুমার ৩৯:১]

{পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি (সকল কিছু) সৃষ্টি করেছেন।} [আল-আলাক্ব ৯৬:১]

বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর ইসলামী শিক্ষা

ইসলাম বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে না, অথবা এর পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে না, কারণ এটি আল্লাহর সৃষ্টির আইন বোঝার একটি মাধ্যম, কিন্তু ইসলাম আরও শর্ত দেয় যে, শরিয়াহর ছক ভেদ না করে বৈজ্ঞানিক ফলাফল জনসাধারণের কাছে প্রবর্তনের বিষয়ে কোন নির্দেশিকা বা বিধিবিধান ছাড়া এটিকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, যাতে যা অনুমোদিত তা অনুমোদিত হয় এবং যা নিষিদ্ধ তা পাস হতে বাধা দেওয়া হয়।

তাই কেবল এই কারণেই কোন কিছু বাস্তবায়ন করা জায়েজ নয় যে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব, বরং তা হতে হবে উপকারী জ্ঞান যা মানবজাতির স্বার্থে কাজ করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে; এই জ্ঞান মানুষের মর্যাদা এবং আল্লাহ যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য তাকে সৃষ্টি করেছেন তা রক্ষা করতে হবে। তাই মানুষকে পরীক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা উচিত নয়, এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তির অনন্য পরিচয় এবং তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিকে আঘাত করা উচিত নয়, অথবা সামাজিক কাঠামোর ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়, আত্মীয়তা ও বংশের ভিত্তি, অথবা পারিবারিক কাঠামো ভেঙে ফেলা উচিত নয় যা মানব ইতিহাস জুড়ে আল্লাহর আইনের ছায়ায় এবং তাঁর বিধানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ক্লোনিং বোঝা: পদ্ধতি এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আধুনিক যুগে মানুষ যে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে রয়েছে মিডিয়া যা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করে, যা ক্লোনিং নামে পরিচিত। এই বিষয়ে ইসলামের বিধান ব্যাখ্যা করতে হবে, এই ক্ষেত্রের একদল মুসলিম বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞের দেওয়া কিছু বিবরণ উদ্ধ,,ত করার পরI

ক্লোনিংয়ের সংজ্ঞা:

এটা জানা যায় যে, আল্লাহর সৃষ্টির আইন অনুযায়ী, মানুষ দুটি কোষের মিলন থেকে বৃদ্ধি পায়, যার প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে অসংখ্য ক্রোমোজোম থাকে, যা মানবদেহের কোষে থাকা ক্রোমোজোমের অর্ধেক। যখন পিতার (স্বামীর) কোষ, যাকে শুক্রাণু বলা হয়, মায়ের (স্ত্রীর) কোষ, যাকে ডিম্বাণু বলা হয়, সাথে মিলিত হয়, তখন তারা একটি নিষিক্ত কোষে পরিণত হয় যার মধ্যে সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম থাকে এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। যখন এটি মায়ের জরায়ুতে স্থায়ী হয়, তখন এটি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় একটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। এই কোষটি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, তাই এটি দুটি অভিন্ন কোষে পরিণত হয়, তারপর চারটি, তারপর আটটিI তারপর এটি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে যতক্ষণ না এটি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে কোষগুলি একে অপরের থেকে আলাদা হতে শুরু করে এবং বিশেষায়িত হতে শুরু করে।

যদি, কোষগুলি সংখ্যাবৃদ্ধির পর্যায়ে থাকে কিন্তু একটি কোষ অন্যগুলি থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে এর ফলে অভিন্ন যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যেখানে প্রাণীর ভ্রূণ থেকে কোষগুলিকে কৃত্রিমভাবে পৃথক করা হয়েছিল, যার ফলে অভিন্ন যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরণের কিছুই রিপোর্ট করা হয়নি। এটিকে এক ধরণের ক্লোনিং হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি অভিন্ন কপি তৈরি করে, তাই এটিকে ক্লোনিং বলা হয়।

একটি সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিং করার আরেকটি উপায় আছে, যা শরীরের একটি কোষ থেকে সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস আকারে সম্পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমোজোম গ্রহণ করে এবং এটিকে একটি ডিম্বাণু কোষে প্রবেশ করানো হয় যেখান থেকে নিউক্লিয়াসটি সরানো হয়েছে, এইভাবে একটি নিষিক্ত কোষ তৈরি হয় যার মধ্যে সম্পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে এবং একই সাথে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়; যদি এটি মায়ের জরায়ুতে রোপণ করা হয় তবে এটি বিকশিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে এবং একটি সম্পূর্ণ প্রাণী হিসাবে জন্মগ্রহণ করবে, আল্লাহর ইচ্ছায়। এই ধরণের ক্লোনিংকে নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার বলা হয়। "ক্লোনিং" শব্দটি ব্যবহার করার সময় এটিই বোঝা যায় এবং ভেড়া "ডলি" এর ক্ষেত্রেও এটিই ঘটেছিল। কিন্তু এই নতুন প্রাণীটি মূলের হুবহু অনুলিপি নয়, কারণ যে মায়ের ডিম্বাণু থেকে নিউক্লিয়াসটি সরানো হয়েছিল তার মধ্যে এখনও অপসারণ করা নিউক্লিয়াসের চারপাশের উপাদানে নিউক্লিয়াসের কিছু অবশিষ্টাংশ রয়েছে এবং এই অবশিষ্টাংশগুলি শরীরের কোষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে, এবং এটি এখনও মানুষের সাথে করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

সুতরাং ক্লোনিং বলতে বোঝায়, দেহকোষের নিউক্লিয়াসকে এমন একটি ডিম্বাণুতে স্থানান্তর করে যার নিউক্লিয়াস অপসারণ করা হয়েছে, অথবা টিস্যু এবং অঙ্গগুলি পৃথক হওয়ার আগে একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুকে বিভক্ত করে এক বা একাধিক জীবন্ত প্রাণী তৈরি করা।

এটা স্পষ্ট যে এই এবং অনুরূপ পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সৃষ্টির ক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে না। আল্লাহ বলেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

{নাকি তারা কি আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার স্থির করে যারা তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে (তারা যা তৈরি করেছে এবং তাঁর সৃষ্টি) তাদের কাছে একই রকম মনে হয়েছে?" বলুন, 'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা; এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী।'} [আর-রা'দ ১৩:১৬]

{তাহলে তোমরা যে (মানব) বীর্য নির্গত করো, সে সম্পর্কে আমাকে বলো। তোমরা কি তা সৃষ্টি করো (অর্থাৎ এই বীর্যকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করো), নাকি আমরাই স্রষ্টা? আমরা তোমাদের সকলের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছি, এবং আমরা অক্ষম নই, তোমাদের রূপান্তরিত করার জন্য এবং তোমাদের এমন (আকৃতিতে) সৃষ্টি করার জন্য যা তোমরা জানো না। আর তোমরা তো সৃষ্টির প্রথম রূপ (অর্থাৎ আদমের সৃষ্টি) জেনে গেছো, তাহলে কেন তোমরা স্মরণ করো না (অথবা মনোযোগ দাও না)?} [আল-ওয়াকিয়াহ ৫৬:৫৮-৬২]

{মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে নূতফা (পুরুষ ও নারীর মিশ্র যৌন স্রাবের ফোঁটা) থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ সে (একজন প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে) দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের জন্য একটি উপমা পেশ করে এবং নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, 'এই হাড়গুলো পচে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর কে জীবিত করবে?' বলো, 'তিনিই জীবিত করবেন যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন! এবং তিনিই সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বজ্ঞ!' যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন, অতঃপর তোমরা তা দিয়ে জ্বালাও। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই! তিনিই সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। নিশ্চয়ই, তাঁর আদেশ, যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন কেবল এইটুকুই যে, তিনি তা বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়!} [ইয়া-সিন ৩৬:৭৭-৮২]

{আর আমরা মানুষকে (আদমকে) মাটির নির্যাস (জল ও মাটি) থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে (আদমের বংশধরকে) নূতফা (পুরুষ ও মহিলার যৌনাঙ্গের মিশ্রণের ফোঁটা দিয়ে) একটি নিরাপদ স্থানে (নারীর গর্ভে) স্থাপন করেছি। তারপর নূতফাকে জমাট বাঁধা (ঘন রক্তের টুকরো) রূপে পরিণত করেছি, তারপর জমাট বাঁধাকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করেছি, তারপর হাড়গুলিকে মাংস দিয়ে ঢেকেছি, তারপর একে অন্য সৃষ্টিতে পরিণত করেছি। অতএব, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, বরকতময়।} [আল-মু'মিনুন ২৩:১২-১৪]

মানব ক্লোনিং সম্পর্কে ইসলামের বিধান

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

উল্লেখিত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে মানব ক্লোনিং করা, অথবা অন্য কোনও পদ্ধতি যা মানুষের প্রজননের দিকে পরিচালিত করে তা নিষিদ্ধ।

যদি উপরে উল্লিখিত শরীয়াহর হুকুমের কোন লঙ্ঘন হয়ে থাকে, তাহলে সেইসব ক্ষেত্রে শরীয়াহর হুকুম ব্যাখ্যা করার জন্য তার পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

বৈবাহিক সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হতে পারে এমন সমস্ত পরিস্থিতিতেই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা সে গর্ভাশয় (সারোগেসি), ডিম্বাণু, শুক্রাণু বা ক্লোনিংয়ের জন্য কোষই হোক না কেন।

ইসলামে স্বার্থ রক্ষা এবং ক্ষতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে শরীয়তের সীমা এবং নির্দেশিকা অনুসারে জীবাণু এবং অণুবীক্ষণিক প্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্লোনিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা অনুমোদিত।

(মাজমা'আল-ফিকহ আল-ইসলামিয়া, পৃ. 216-220)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)

সৌদি অথরিটি ফর ডেটা অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (SADAI) কর্তৃক AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: এমন সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত উপায় ব্যবহার করে যা তথ্য সংগ্রহ করতে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার পূর্বাভাস দিতে, সুপারিশ দিতে, বা বিভিন্ন স্তরের অটোমেশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেরা পদ্ধতি এবং পদ্ধতি বেছে নিতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) একটি আধুনিক হাতিয়ার যা বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং ইসলামী জ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর। এটি অন্যান্য হাতিয়ারের মতোই একটি হাতিয়ার যা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যায় না এমনভাবে ব্যবহার করা জায়েজ, কারণ মূল নীতি হল জিনিসপত্র অনুমোদিত। ইসলামী শরিয়াহ মানুষকে তাদের জন্য যা ভালো তা অর্জন করতে এবং তা বৃদ্ধি করতে এবং যা খারাপ তা প্রতিরোধ করতে এবং তা সীমিত করতে সহায়তা করে; ইসলামী শিক্ষা এমন কিছুকে বাধা দেয় না যা মানুষের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উভয় স্বার্থে কাজ করতে পারে; বরং এটি এমন কিছুকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে যা তাদের এই পৃথিবী এবং পরকালে ক্ষতি করতে পারে।

অতএব, এমন কার্যকলাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা জায়েজ নয় যা হারাম, অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, দুর্নীতি ও মন্দ ছড়িয়ে দিতে পারে, অথবা প্রতারণা ও প্রতারণার সাথে

জড়িত। এটিকে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা এবং এটি ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়াও জায়েজ নয়।

➡ বৈধ ও প্রশংসনীয়, কারণ এটি ইসলামের প্রচার ও শিক্ষা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

AI দ্বারা অশ্লীলতা বা প্রতারণামূলক কন্টেন্ট তৈরি

হারাম বিনোদন বা Deepfake ভিডিও তৈরি করা।

মানুষকে বিভ্রান্ত করা বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত AI।

➡ পরিষ্কারভাবে হারাম, কারণ এটি ইসলামি নীতির পরিপন্থী।

AI দ্বারা চাকরি হারানোর সম্ভাবনা

AI যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যেখানে লাখ লাখ মানুষ চাকরি হারায়, তাহলে এটি অন্যায় হতে পারে।

তবে, প্রযুক্তির উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী এবং মানুষকে নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

➡ সতর্ক থাকা উচিত, যাতে প্রযুক্তি মানুষকে শোষণ না করে।

ফতোয়া প্রদানে এআই

ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো হুকুম সম্পর্কে জানা, এবং যখন একজন আলেম ফতোয়া দেন তখন তার অর্থ হলো তিনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে হুকুম দিচ্ছেন। আল-মিসবাহ আল-মুনির , ২/৪৬২।

আর-রাগীব আল-আসবাহানি মুফরাদাতুল কুরআনে (পৃষ্ঠা ৬২৫) বলেন: ফতোয়া হলো এমন একটি উত্তর যা হুকুম সম্পর্কে স্পষ্ট নয়। আল-মারদাওয়ী "আল-ইনসাফ" (২৮/৩১৪) গ্রন্থে বলেন : "মুফতি হলেন তিনি যিনি শরীয়তের হুকুম ব্যাখ্যা করেন এবং লোকদের উপর তা চাপিয়ে না দিয়ে তা সম্পর্কে বলেন, আর কাজী (বিচারক) হলেন তিনি যিনি হুকুম ব্যাখ্যা করেন এবং তা চাপিয়ে দেন।"

এআই যাতে ফতোয়া দিতে পারে, সেজন্য তারা এতে ইসলামী শিক্ষা এবং শরীয়াহ সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটির উপর প্রশিক্ষণ দেয়। এই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে এবং বিভিন্ন স্তরের নির্ভুলতার সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল পরিমাণে তথ্য তৈরি করবে। তারপর উত্তর তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি এবং

প্রোগ্রাম অনুসারে সঞ্চিত হবে এবং নির্দিষ্ট অ্যাপগুলিতে জমা দেওয়া প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত এই তথ্য থেকে উত্তর তৈরি করা হবে।

এটা খুবই স্পষ্ট যে ফতোয়া জারি করা ইসলামে একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করার এবং তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর বিধান ব্যাখ্যা করার এবং তাদের মুখোমুখি হওয়া নতুন বিষয়গুলিতে বিধান প্রয়োগ করার মতো। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কারও করা উচিত নয়, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যার কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী রয়েছে এবং এমন কিছু শর্ত পূরণ করেছে যা তাকে এই বিশাল দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য করে তোলে এবং তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের সুযোগ দেয়। এই শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে: মুসলিম হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ মন এবং ভালো চরিত্রের অধিকারী হওয়া, শরিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, এবং বুদ্ধিমান এবং বিধান গ্রহণ করতে এবং জীবনের বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম হওয়া।

ইমাম আশ-শাফাঈ (রহঃ) আল-খতিব আল-বাগদাদী কর্তৃক আল-ফাকিহ ওয়াল-মুতাফাক্কীহ (২/৩৩১) গ্রন্থে তাঁর সনদে বর্ণিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে বলেন: "আল্লাহর কিতাব, কী রহিত করে এবং কী রহিত করা হয়, এর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক আয়াত, এর অর্থ এবং জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কোন আয়াত মক্কী (হিজরতের আগে অবতীর্ণ) এবং কোনটি মাদানী (হিজরতের পরে অবতীর্ণ), এর উদ্দেশ্য এবং অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ছাড়া অন্য কারো জন্য ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নয়।" এরপর, তার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস এবং কী রহিত করে এবং কী রহিত করা হয় সে সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা উচিত; কুরআন সম্পর্কে তার য তটুকু জ্ঞান আছে, তার হাদিস সম্পর্কেও ততটুকু জ্ঞান থাকা উচিত। তার আরবি ভাষা, কবিতা এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা উচিত যা তার জানা প্রয়োজন। অধিকন্তু, তাকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে পরিচিত হতে হবে, বেশি কথা বলতে হবে না, বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তব জীবন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং এর পাশাপাশি, তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকা উচিত।

যদি সে এরকম হয়, তাহলে সে হালাল ও হারাম সম্পর্কে কথা বলতে এবং ফতোয়া দিতে পারে।

কিন্তু যদি সে এমন না হয়, তাহলে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বা ফতোয়া জারি করার তার কোন অধিকার নেই। ইবনে আল-কাইয়িম " আ'লাম আল-মুওয়াক্কি`ইন `আন রাব্বিল-আলামিন " (১/১৮৯) গ্রন্থে বলেছেন: মুফতি এবং বিচারক সঠিক ফতোয়া এবং রায় দিতে পারবেন না যতক্ষণ না তারা দুটি জিনিস বোঝেন:

প্রথমত, তাদের প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে হবে এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে, এবং পরিস্থিতিগত বিবরণ, লক্ষণ এবং ইঙ্গিতের ভিত্তিতে আসলে কী ঘটেছিল তা বের করতে সক্ষম হতে হবে, যতক্ষণ না তারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, তাদের বুঝতে হবে যে এই বাস্তব জীবনে কী করা উচিত, অর্থাৎ আল্লাহর বিধান যা তিনি তাঁর কিতাবে অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা নির্ধারিত, যা এই উপন্যাস সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা বোঝা, তারপর তাকে একটিকে অন্যটির উপর প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুটি বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং প্রচুর প্রচেষ্টা করবে, সে অনিবার্যভাবে দুটি পুরস্কার অথবা একটি পুরস্কার পাবে। আলেম হলেন সেই ব্যক্তি যিনি উপন্যাস সংখ্যার বাস্তবতা বুঝতে এবং এর সাথে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধান কার্যকর করতে সক্ষম হবেন

কিন্তু যে ব্যক্তি এর বাইরে অন্য কোন পথ অনুসরণ করবে, সে অনিবার্যভাবে মানুষের প্রাপ্য ও অধিকার হারানোর কারণ হবে, এবং সে এর জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে যে শরিয়া ও ইসলামী শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার সাথে সম্পর্কিত হবে।

এটা সর্বজনবিদিত যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যতই উন্নত হোক না কেন, এর দ্বারা এই শর্তগুলি পূরণ করা কঠিন। এর উপর বিশ্বাস রাখা এবং এর থেকে ফতোয়া চাওয়ার কোনও গ্রহণযোগ্য শরয়ী যুক্তি নেই। বরং বিষয়গুলি জ্ঞানী ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ এবং ধার্মিকতার জন্য পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো উচিত, যেমন আল্লাহ, তিনি মহিমান্বিত, বলেছেন:

{সুতরাং [হে লোকেরা] যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো} [আন-নাহল ১৬:৪৩]।

যদি কেউ নতুন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, অথবা তার সাথে এমন কিছু ঘটে যা ইসলামী হুকুমের দাবি করে, তাহলে তার জন্য যা আবশ্যক তা হল জ্ঞানী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা। কিন্তু যদি সে এমন কারো কাছ থেকে ফতোয়া চায় যার ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতা নেই, তাহলে সে যা করার তা করবে না, কারণ সে এমন কারো কাছ থেকে ফতোয়া চাইবে যে মুফতির শর্ত পূরণ করে না।

কোন তথ্যের ভিত্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ফতোয়া দিয়েছে তা জানা না থাকায়, অর্থাৎ আমরা বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল সেই তথ্যের ভিত্তিতেই উত্তর দেয় যা এতে সরবরাহ করা হয়েছে। তাই যখন কোনও বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন এটি সমস্ত ওয়েবসাইট, সমস্ত ধরণের লিখিত উপাদান, উপলব্ধ অডিও এবং ভিডিও ক্লিপে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন উৎস থেকে, এমনকি অ-ইসলামিক উৎস থেকে, অথবা বিকৃত বা বিকৃত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসন্ধান করে।

ফতোয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এবং রায় পরিবর্তন করতে পারে এমন বিষয়গুলি বিবেচনায় না নেওয়া, যেমন রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের পার্থক্য, এবং নির্দেশিকা, শর্ত এবং সংরক্ষণগুলি বিবেচনায় নেওয়া নিশ্চিত করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ফতোয়া চাওয়া ব্যক্তিদের পরিস্থিতির তারতম্য বা অব্যাহতি প্রয়োজন এমন বিষয়গুলিকেও বিবেচনা করে না, এবং

এটি বিষয়টির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে না বা বিভিন্ন কর্মের সম্ভাব্য পরিণতি এবং ফলাফলগুলি বিবেচনা করে না, যা একজন অভিজ্ঞ মুফতি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না যিনি ফতোয়া চাওয়া ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া একটি নতুন সমস্যা পরীক্ষা করেন।

এটা সুপরিচিত যে ইসলামী বিধান দুই ধরণের: যেগুলো পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত, কারণ এগুলোর দিকে পরিচালিত করে এবং সেগুলোর উপর প্রভাব ফেলে, এবং যেগুলো স্থির এবং পরিবর্তন করা যায় না।

ইবনুল কাইয়্যিম "ইগাহাত আল-লাহফান " (১/৩৩০) গ্রন্থে বলেন: "আহকাম দুই প্রকার: প্রথম প্রকার পরিবর্তন হয় না এবং স্থান ও সময় নির্বিশেষে সর্বদা একই থাকে এবং এখানে পণ্ডিতদের ইজতিহাদের কোন স্থান নেই। এর মধ্যে রয়েছে এমন বাধ্যতামূলক কর্তব্য যা সর্বদা বাধ্যতামূলক, যেসব বিষয় সর্বদা নিষিদ্ধ, কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ দ্বারা নির্ধারিত হাদ্দ শাস্তি ইত্যাদি। এই ধরণের কোন পরিবর্তন বা ইজতিহাদ নেই যা এটিকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে আলাদা করতে পারে।"

দ্বিতীয় প্রকারটি মানুষের স্বার্থের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে এবং সময়, স্থান এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন অনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক শাস্তি (তা'জির) নির্ধারণ করা এবং তাদের ধরণ এবং বর্ণনা নির্ধারণ করা, কারণ ইসলাম মানুষের স্বার্থের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হুকুমের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যদি সেগুলি অনুপস্থিত থাকে অথবা তাদের মধ্যে একটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে হুকুমগুলি পরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না; বরং সেগুলি স্থির হুকুম হিসাবে বিবেচিত হবে। এই দুটি গুণ হল:

এই রায়টি এমন বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যা ইজতিহাদের আওতাভুক্ত, যেখানে এমন বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ রয়েছে যা বিশুদ্ধতা এবং অর্থ উভয় দিক থেকেই সুনির্দিষ্ট।

ডক্টর মুহাম্মদ আয-জুহাইলি তার "আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ ওয়া তাতবিকাতুহা ফিল-মাযাহিব আল-আরবা'আহ " (১/৩৫৫) বইতে বলেছেন: "যেসব হুকুম সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে এবং মানুষের আচার-আচরণও পরিবর্তিত হতে পারে, সেগুলোই হলো ইজতিহাদের আওতাভুক্ত বিধান যা মানুষের স্বার্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই যদি হুকুম বর্তমান সময়ের সাথে আর উপযুক্ত না হয় এবং মানুষের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সেগুলো পরিবর্তন করা উচিত।"

এগুলো এমন বিধান হওয়া উচিত যা রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, অথবা জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ এবং উপমা (কিয়াস) এর উপর ভিত্তি করে।

শায়খ আহমদ আয-জারকা " শারহুল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ" (পৃষ্ঠা ২২৭) গ্রন্থে বলেন: "সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, অর্থাৎ মানুষের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে হুকুম-আহকাম পরিবর্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি তাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের কারণে মুফতির উপর একটি নির্দিষ্ট হুকুম জারি করার নির্দেশ দেওয়া হত, কিন্তু তারপর রীতিনীতি ও ঐতিহ্য পরিবর্তিত হয়ে যেত, তাহলে হুকুমটিও এমন কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া উচিত যা নতুন রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

ভুল এবং বানোয়াট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যার কোন ভিত্তি নেই যেন সেগুলো সঠিক এবং খাঁটি তথ্য। এর মধ্যে এমন নাম, সংখ্যা এবং পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে বানোয়াট এবং ওয়েবসাইট এবং তথ্যের অন্যান্য উৎসে এর অস্তিত্ব নেই। এগুলোকেই "এআই হ্যালুসিনেশন" বলা হয়!

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রদত্ত মতামত প্রশ্নের কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ পরিবর্তন করে পরিবর্তন করা সম্ভব, যা রায়ের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে এটিকে এমন কিছু বিশ্বাস এবং নীতি গ্রহণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব যা শুরু থেকেই অনিবার্যভাবে পক্ষপাতের দিকে পরিচালিত করবে, যাতে এটি এমন কিছু ধারণা এবং ধারণার পক্ষে থাকবে যা চিন্তাভাবনার অনেক বিষয়, পরিবার, ধর্মবিশ্বাস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার বিপরীত, যা এই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত উত্তরগুলির উপর প্রভাব ফেলবে।

যেহেতু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটি রয়েছে, তাই ফতোয়া এবং শরীয়াহ সংক্রান্ত বিধানের জন্য এর উপর নির্ভর করা যাবে না যার ভিত্তিতে কেউ কাজ করতে পারে এবং জীবনযাপন করতে পারে, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য ফতোয়া জারি করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে না।

এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং ত্রুটিগুলির কারণগুলি দূর করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এর কিছু প্রয়োগের বিকাশের উপর কাজ করা উচিত, একই সাথে প্রয়োজনীয় শর্ত এবং নির্দেশিকাগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ফতোয়া তৈরির জন্য দুই ধরণের মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারে:

প্রথমত, ইসলামী বিষয়ের মুফতি বা গবেষক যিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চান এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামী হুকুম ব্যাখ্যা করতে চান। তাই যদি তিনি একজন বিশেষজ্ঞ হন এবং জ্ঞান রাখেন, তাহলে তিনি ফতোয়া তৈরির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হবেন, যার পরে তিনি নিজেই উত্তরটি তৈরি করতে পারবেন।

ফতোয়া তৈরির কাজে যেটি লাগবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এটি তাকে উৎস এবং তথ্যসূত্র সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে, তারপর সে নিজেই সেই উৎসগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারবে যে তথ্যটি সে খুঁজছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রদত্ত উত্তর যাচাই করতে পারবে। কতবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিছু একাডেমিক বিষয়ে গবেষকদের হতাশার কারণ হয়েছে, এবং তাদের এমন উৎসগুলিতে রেফার করেছে যার সাথে নির্দিষ্ট তথ্যের কোনও সম্পর্ক নেই!

ইসলামী বিষয়ের গবেষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বই, গবেষণাপত্র এবং ক্লিপগুলির সারসংক্ষেপ সংগ্রহ করতে পারেন এবং তাকে যে বিষয়টি মোকাবেলা করছেন তার সাথে সম্পর্কিত অনেক বিষয় এবং অভিনব বিষয় বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। এটা খুবই স্পষ্ট যে এটি তার অনেক সময় এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করবে এবং তার কাজকে সহজ করে তুলবে। সেক্ষেত্রে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা শরীয়তের উদ্দেশ্য অনুসারে, কারণ উপায়গুলি লক্ষ্যের মতো একই বিধানের আওতাধীন। কিন্তু - যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে - সে এটিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারে না বা এটি তার কাছে যা উপস্থাপন করে তার উপর নির্ভর করতে পারে না, কারণ এর সবকিছুতে সঠিকতার অভাব রয়েছে এবং এটি শব্দের মধ্যে মিলের ভিত্তিতে এর অনেক ফলাফল উপস্থাপন করে। এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে AI যে উৎস থেকে তথ্য গ্রহণ করে তা বিকৃত হতে পারে, অথবা এটি প্রসঙ্গে মনোযোগ নাও দিতে পারে বা সময় ও স্থানের পরিবর্তন বিবেচনা করতে সক্ষম নাও হতে পারে। এটি পৃথক মামলা মোকাবেলা করতে, অথবা প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজন দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনা করতে, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে ব্যতিক্রম প্রয়োজন হয় বা রীতিনীতি, মূল্যবোধ এবং আচার-আচরণ বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় তা বিবেচনা করতে অক্ষম হতে পারে। কারণ এটি এমন একটি হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয় যার আউটপুট ইনপুটের উপর ভিত্তি করে।

সেক্ষেত্রে, যখনই একজন গবেষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেন, যখন তিনি তার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং তথ্য সংগ্রহ করেন যা তাকে পরিস্থিতিটি আসলে যেমন আছে তেমন বুঝতে সাহায্য করবে, উপন্যাসের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করবে এবং এটি

সম্পর্কে একটি উপযুক্ত ইসলামী ফতোয়া দেবে, তখন তাকে অবশ্যই সমস্ত তথ্য যাচাই করার জন্য মূল উৎসগুলিতে ফিরে যেতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে উত্তরটি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এবং শর্তাবলী বিবেচনা করে এবং প্রশ্নবিদ্ধ উপন্যাসের বিষয়টির সাথে সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরণের ব্যক্তি যিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারেন তিনি হলেন ফতোয়া খুঁজছেন এবং নিজের জন্য উত্তর খুঁজছেন। তাই তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশ্ন করেন, উত্তর খোঁজার জন্য নয় বরং বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে, অথবা তিনি যে উপন্যাসের মুখোমুখি হচ্ছেন তার কিছু দিক এবং মাত্রা বুঝতে, অথবা সেই উত্তরের উপর নির্ভর না করে সেই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু সাধারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য। তাকে ইসলামী বিষয় সম্পর্কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে উত্তর খোঁজার ছাড় দেওয়া হতে পারে, তবে তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে এবং সঠিকতার অভাব এবং অজানা উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এটি বিভিন্ন ওয়েবসাইট পরীক্ষা করার মতো, কারণ তিনি সাধারণত সেগুলি উল্লেখ করেন, তবে এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং বিকৃতির সম্ভাবনা রয়েছে যার জন্য আরও সতর্কতা এবং যাচাইকরণ প্রয়োজন। এর পাশাপাশি, এই ভয় রয়েছে যে বারবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং দীর্ঘ সময় ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার ফলে একজন ব্যক্তি এটিকে বিশ্বাস করতে এবং এর উপর নির্ভর করতে শুরু করতে পারে।

তবে, আমরা মনে করি না যে এই বিষয়ে এর উত্তরগুলিতে আমাদের খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত, এমনকি যদি গবেষকের অনুসন্ধান এবং ফলাফলগুলি নিজের বা অন্যদের উপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নাও করা হয়। কারণ জ্ঞান আমাদের ঈমানের অংশ, তাই আপনার বিবেচনা করা উচিত যে আপনি কার কাছ থেকে আপনার ধর্ম শিখবেন, যেমন সালাফ (প্রাথমিক প্রজন্ম) বলেছেন।

একজন মুসলিমের যদি তার ধর্ম সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে হয়, এমনকি যদি তা তার জ্ঞান বৃদ্ধি এবং অজ্ঞতা দূর করার জন্যও হয়, তাহলে তাকে যা করতে হবে তা হল, সেই জ্ঞান একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে, পণ্ডিতদের বই থেকে অথবা তাদের সুপরিচিত কথা এবং বক্তৃতা থেকে অর্জন করা। তিনি এর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে পারেন, যার মাধ্যমে তিনি ফতোয়ার উত্তরের রেফারেন্স এবং লিঙ্কগুলি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যাতে ফতোয়া খুঁজছেন এমন ব্যক্তি নিজেই উৎসগুলি পরীক্ষা করতে পারেন। যদি তারা নির্ভরযোগ্য উৎস হয়, তাহলে তিনি তার অনুসন্ধান করা উত্তরটি খুঁজে পেয়েছেন এবং যদি এটি তার পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহলে তিনি সরাসরি তার মূল উৎস থেকে ফতোয়াটি নিতে পারেন। এইভাবে, তিনি বিশ্বস্ত উৎস থেকে উত্তর পেতে একটি বুদ্ধিমান অনুসন্ধান ইঞ্জিন হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছেন।

আর যে ব্যক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে ফতোয়া চায় এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিজস্ব উত্তরের উপর বিশ্বাস করে এবং তার দেওয়া ফতোয়ার উপর কাজ করে, তার জন্য তা করা জায়েজ নয়, কারণ আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে যতটা জানি, কারণ এটি ফতোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শরয়ী শর্ত পূরণ করে না এবং কোন সঠিক নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া তৈরি করা উচিত সেদিকে কোন মনোযোগ দেয় না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে ফতোয়া চাওয়া এবং শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জানার জন্য এর উপর নির্ভর করার বিষয়ে গবেষক এবং সমসাময়িক পণ্ডিতদের দুটি মতামত রয়েছে।

প্রথম মতটি মূল রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা এর কাছ থেকে ফতোয়া চাওয়া নিষিদ্ধ করে এবং বলে যে আমাদের এর উত্তরগুলিতে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে চাওয়া যেতে পারে এমন দুই ধরণের ফতোয়ার মধ্যে আমাদের পার্থক্য করা উচিত:

প্রথম ধরণের ফতোয়া এমন বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যা সকল দায়িত্বশীল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য এবং ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই এবং এর সুবিধা-অসুবিধা, অব্যাহতি

এবং পরিণতি পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই; বরং এর বিধান একই এবং সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, যেমন ওযু বাতিলকারী বিষয়গুলির বিধান, নামাজের ফরজ অংশ, যাকাত প্রদানের অধীন সম্পদের প্রকার, কাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে, রোজা বাতিলকারী কী এবং হজ্জ ও ওমরার ইহরাম অবস্থায় কী নিষিদ্ধ। তাদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই বিষয়গুলিতে ফতোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে:

i.. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপ সমর্থনকারী সংস্থাকে ফতোয়া জারি করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য বলে জানা উচিত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপটি সেই সংস্থার ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত, অন্য কোনও অজানা বা অবিশ্বস্ত উৎস ছাড়াই।

ii. যিনি এটি ব্যবহার করেন তার ফতোয়ায় ব্যবহৃত বাক্যাংশ এবং শব্দের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে।

তার নিশ্চিত করা উচিত যে উত্তরটি নতুন ইস্যুর সাথে মিলে যাচ্ছে, যাতে কোনও অসঙ্গতি না থাকে যা এই ক্ষেত্রে ফতোয়াটিকে অপ্রযোজ্য করে তুলতে পারে।

যদি এই শর্তগুলির মধ্যে কোন একটি পূরণ না হয়, তাহলে তাকে ফতোয়া চাওয়ার মূল পদ্ধতিতে ফিরে যেতে হবে, যা হল জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়া নতুন বিষয়গুলির উপর তাদের ফতোয়া চাওয়া।

দ্বিতীয় ধরণের ফতোয়া হলো ঐতিহ্য ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় এবং এর জন্য বিষয়টির চারপাশের পরিস্থিতি এবং এটি কীভাবে উদ্ভূত হয়েছিল তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন, অথবা প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজন, অব্যাহতি ইত্যাদি বিষয়গুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্রে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা বলা, অথবা এর উত্তরের উপর নির্ভর করা বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করা জায়েজ নয়। বরং ব্যক্তিকে অবশ্যই বিশ্বস্ত পণ্ডিতদের কাছে যেতে হবে যাতে তারা তাকে এমন একটি ফতোয়া দিতে পারে যা তার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেই বিশেষ নতুন বিষয়ের জন্য উপযুক্ত।

আমাদের কাছে যা মনে হচ্ছে তা হল, যারা বলেন যে বর্তমানে বিদ্যমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরের উপর নির্ভর করা নিষিদ্ধ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই শক্তিশালী এবং এটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ফতোয়া জারি করার যোগ্য নয় এবং এর উত্তরগুলিতে কিছু ত্রুটি এবং সমস্যা রয়েছে।

একজন মুসলিমের জন্য যা আবশ্যক তা হলো তার ধর্মের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, এবং বিধান অনুসন্ধানে গাফিল না হওয়া; বরং তার উচিত সঠিক উৎস থেকে তা গ্রহণ করা এবং যোগ্য আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা।

ইসলামিক স্কলারদের মতামত ও ফতোয়া

AI সরাসরি হারাম নয়, তবে ব্যবহার ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল

বিভিন্ন স্কলারদের মতে, AI-র ক্ষেত্রে ইসলামিক নীতিমালার মধ্যে থাকতে হবেI শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার বৈধ। কিছু ইসলামিক স্কলার AI-কে “প্রযুক্তির একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম” হিসেবে বিবেচনা করেন, যা ভালো বা খারাপ হতে পারে ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

হ্যাকিং কি?

হ্যাকিং বলতে এমন কার্যকলাপ বোঝায় যা কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং এমনকি পুরো নেটওয়ার্কের মতো ডিজিটাল ডিভাইসগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। এবং যদিও হ্যাকিং সবসময় উদ্দেশ্যে নাও হতে পারে, আজকাল হ্যাকিংয়ের বেশিরভাগ উল্লেখ এবং হ্যাকাররা এটিকে সাইবার অপরাধীদের দ্বারা বেআইনি কার্যকলাপ হিসাবে চিহ্নিত করে - আর্থিক লাভ, প্রতিবাদ, তথ্য সংগ্রহ (গুপ্তচরবৃত্তি) এবং এমনকি চ্যালেঞ্জের "মজা" করার জন্যও।

ফিশিং

ফোন হ্যাকারদের অনেক কম্পিউটার হ্যাকিং কৌশলের সুবিধা রয়েছে, যা অ্যান্ড্রয়েডের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ। ফিশিং , ব্যক্তি বা সম্পূর্ণ সংস্থার সদস্যদের লক্ষ্য করে সামাজিক প্রকৌশলের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের জন্য প্রলুব্ধ করার অপরাধ, অপরাধীদের জন্য একটি পরীক্ষিত এবং সত্য পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু একটি ফোন একটি পিসির তুলনায় অনেক ছোট ঠিকানা বার প্রদর্শন করে, মোবাইল ইন্টারনেট ব্রাউজারে ফিশিং সম্ভবত একটি আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট জাল করা সহজ করে তোলে যা আপনি ডেস্কটপ ব্রাউজারে দেখতে পারেন এমন সূক্ষ্ম তথ্য (যেমন ইচ্ছাকৃত ভুল বানান) প্রকাশ না করে। সুতরাং আপনি আপনার ব্যাংক থেকে একটি নোট পাবেন যাতে আপনাকে একটি জরুরি সমস্যা সমাধানের জন্য লগ ইন করতে বলা হবে, সুবিধাজনকভাবে প্রদত্ত লিঙ্কে ক্লিক করুন, ফর্মে আপনার শংসাপত্র লিখুন এবং হ্যাকাররা আপনাকে ধরে ফেলবে।

ট্রোজানাইজড অ্যাপস

অনিরাপদ মার্কেটপ্লেস থেকে ডাউনলোড করা ট্রোজানাইজড অ্যাপগুলি অ্যান্ড্রয়েডের জন্য আরেকটি ক্রসওভার হ্যাকার হুমকি। প্রধান অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ স্টোরগুলি (গুগল এবং অ্যামাজন) তৃতীয় পক্ষের অ্যাপগুলির উপর সতর্ক নজর রাখে; তবে এমবেডেড ম্যালওয়্যার মাঝে মাঝে বিশ্বস্ত সাইটগুলি থেকে, অথবা প্রায়শই স্কেচিয়ার সাইটগুলি থেকেও প্রবেশ করতে পারে। এইভাবে আপনার ফোন অ্যাডওয়্যার , স্পাইওয়্যার বা অন্য কোনও ধরণের ম্যালওয়্যার হোস্ট করে।

Bluehacking

"আপনার ফোনটি যখন কোনও অরক্ষিত Bluetooth নেটওয়ার্কে দেখা যায়, তখন ব্লুহ্যাকিং তাতে অ্যাক্সেস পায়।"

অন্যান্য পদ্ধতিগুলি আরও উন্নত এবং ব্যবহারকারীকে কোনও খারাপ লিঙ্কে ক্লিক করার জন্য কৌশল ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। ব্লুহ্যাকিং আপনার ফোনটি যখন কোনও অরক্ষিত ব্লুটুথ নেটওয়ার্কে প্রদর্শিত হয় তখন তাতে অ্যাক্সেস পায়। এমনকি কোনও বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক বা সেল ফোন টাওয়ারের অনুকরণ করে টেক্সট বার্তা বা লগ-অন সেশনগুলিকে পুনরায় রুট করা সম্ভব। এবং যদি আপনি আপনার আনলক করা ফোনটি কোনও পাবলিক স্পেসে অযৌক্তিকভাবে রেখে যান, তবে কেবল এটি চুরি করার পরিবর্তে, একজন হ্যাকার সিম কার্ডটি অনুলিপি করে এটি ক্লোন করতে পারেI

ম্যাকগুলিতে হ্যাকিং

ম্যাক ব্যবহারকারীরা, হ্যাকিং কেবল উইন্ডোজের সমস্যা বলে মনে না করলে নিশ্চিত থাকুন— আপনিও এর থেকে মুক্ত নন। ২০২১ সালে, অ্যাপল প্রকাশ্যে নিশ্চিত করেছে যে হ্যাঁ, ম্যাকগুলিতে ম্যালওয়্যার পাওয়া যায়।

এই স্বীকারোক্তির আগে, ২০১৭ সালে ম্যাক ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে একটি ফিশিং প্রচারণা চালানো হয়েছিল , বেশিরভাগই ইউরোপে। একটি বৈধ অ্যাপল ডেভেলপার সার্টিফিকেট দিয়ে স্বাক্ষরিত একটি ট্রোজান দ্বারা প্রেরিত , হ্যাকাররা একটি পূর্ণ-স্ক্রিন সতর্কতা প্রকাশ করে শংসাপত্রের জন্য ফিশিং করেছিল যে দাবি করা হয়েছিল যে একটি প্রয়োজনীয় OS X আপডেট ইনস্টল করার জন্য অপেক্ষা করছে। যদি হ্যাকটি সফল হয়, তাহলে আক্রমণকারীরা ভুক্তভোগীর সমস্ত যোগাযোগে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস পেয়ে যায়, যার ফলে তারা সমস্ত ওয়েব ব্রাউজিংয়ে আড়ি পেতে পারে, এমনকি যদি এটি লক আইকনের সাথে একটি HTTPS সংযোগও হয়।

ম্যাকগুলিতে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাক ছাড়াও, মাঝে মাঝে হার্ডওয়্যার ত্রুটিও দুর্বলতা তৈরি করতে পারে, যেমনটি 2018 সালের গোড়ার দিকে দ্য গার্ডিয়ান রিপোর্ট করেছিল তথাকথিত মেল্টডাউন এবং স্পেক্টার ত্রুটিগুলির ক্ষেত্রে হয়েছিল । অ্যাপল ত্রুটির বিরুদ্ধে সুরক্ষা তৈরি করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, তবে গ্রাহকদের কেবল তার iOS এবং Mac অ্যাপ স্টোরের মতো বিশ্বস্ত উৎস থেকে সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করার পরামর্শ দিয়েছে যাতে হ্যাকাররা প্রসেসরের দুর্বলতাগুলি ব্যবহার করতে না পারে।

এবং তারপর ছিল প্রতারণামূলক ক্যালিস্টো , প্রোটন ম্যাক ম্যালওয়্যারের একটি রূপ যা জুলাই ২০১৮ সালে আবিষ্কৃত হওয়ার আগে দুই বছর ধরে জঙ্গলে কাজ করেছিল। এটি একটি নকল ম্যাক সাইবারসিকিউরিটি ইনস্টলারের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এবং অন্যান্য ফাংশনের মধ্যে, ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করেছিল।

ম্যাক এবং ম্যাক ম্যালওয়্যারে হ্যাকিংয়ের সাম্প্রতিক উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে সিলভার স্প্যারো , থিফকোয়েস্ট এবং আইটার্ম২ এর ছদ্মবেশে থাকা ম্যালওয়্যার । ভাইরাস থেকে শুরু করে ম্যালওয়্যার এবং সুরক্ষা ত্রুটি পর্যন্ত, হ্যাকাররা আপনার ম্যাককে হ্যাকারদের ধ্বংস করার জন্য একটি বিস্তৃত টুলকিট তৈরি করেছে। একটি ভাল ম্যাক অ্যান্টিভাইরাস এবং অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার প্রোগ্রাম আপনার ম্যাককে এই ধরণের ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

অ্যান্ড্রয়েড ফোনে হ্যাকিং

যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হ্যাকিং উইন্ডোজ কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কিত, অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম হ্যাকারদের জন্য একটি আমন্ত্রণমূলক লক্ষ্যও তৈরি করে।

প্রাথমিক হ্যাকাররা যারা নিরাপদ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক (এবং তাদের যুগের ব্যয়বহুল দূর-দূরান্তের কল) ঘুরে বেড়ানোর জন্য নিচু প্রযুক্তির পদ্ধতিগুলি আকৃষ্ট করে অন্বেষণ করেছিল, তাদের মূলত ফ্রেক্স বলা হত - ফোন এবং ফ্রিক্স শব্দের সংমিশ্রণ। 1970-এর দশকে তারা একটি সংজ্ঞায়িত উপসংস্কৃতি ছিল এবং তাদের কার্যকলাপকে ফ্রেকিং বলা হত ।

আজকাল, ফ্রেকাররা অ্যানালগ প্রযুক্তির যুগ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং দুই বিলিয়নেরও বেশি মোবাইল ডিভাইসের ডিজিটাল জগতে হ্যাকার হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোন হ্যাকাররা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে একজন ব্যক্তির মোবাইল ফোনে প্রবেশ করে এবং ভয়েসমেইল, ফোন কল, টেক্সট মেসেজ, এমনকি ফোনের মাইক্রোফোন এবং ক্যামেরা আটকে দেয়, সবই ব্যবহারকারীর অনুমতি বা এমনকি অজান্তেই। "সাইবার অপরাধীরা ফোনে আপনার সংরক্ষিত তথ্য দেখতে পারে, যার মধ্যে পরিচয় এবং আর্থিক তথ্যও অন্তর্ভুক্ত।"

হ্যাকিং ব্যবসাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

অপরাধপ্রবণ হ্যাকারদের ব্যবসা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সাল জুড়ে প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে কিছু হাই-প্রোফাইল ছিল, যেমন কলোনিয়াল পাইপলাইন, জেবিএস (বিশ্বের বৃহত্তম মিটপ্যাকার), অথবা বৃহৎ ফেরি পরিষেবা স্টিমশিপ অথরিটিতে আক্রমণ। বেশ কয়েকটি গ্যাং, র‍্যানসমওয়্যার-অ্যাজ-এ-সার্ভিস প্রোভাইডার এবং বিভিন্ন ধরণের র‍্যানসমওয়্যার বাজারে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি হয়তো কন্টি , রিউক বা গ্যান্ডক্র্যাবের মতো নামগুলির সাথে পরিচিত।

ট্রোজান ব্যবসার জন্য হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হল Emotet এবং TrickBot । Emotet, Trickbot এবং GandCrab সকলেই তাদের সংক্রমণের প্রাথমিক বাহক হিসেবে malspam-এর উপর নির্ভর করে । পরিচিত ব্র্যান্ডের ছদ্মবেশে এই ক্ষতিকারক স্প্যাম ইমেলগুলি আপনার শেষ ব্যবহারকারীদের ক্ষতিকারক ডাউনলোড লিঙ্কে ক্লিক করতে বা ম্যালওয়্যার লোড করা একটি সংযুক্তি খুলতে প্ররোচিত করে। একটি আকর্ষণীয় মোড়কে, Emotet নিজেই একটি ব্যাংকিং ট্রোজান থেকে Trickbot-এর মতো অন্যান্য ব্যাংকিং ট্রোজান সহ অন্যান্য ম্যালওয়্যার সরবরাহের জন্য একটি হাতিয়ারে বিকশিত হয়েছে।

তাহলে সাইবার অপরাধীরা যখন আপনার নেটওয়ার্ক হ্যাক করতে সক্ষম হয় তখন কী হয়? উদাহরণস্বরূপ, ইমোটেট, অ্যালেনটাউন, পেনাল্টি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলিকে বিঘ্নিত করেছিল, যার ফলে পরিষ্কার করার জন্য মাইক্রোসফ্টের ঘটনা প্রতিক্রিয়া দলের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। সর্বোপরি, শহরটি প্রতিকারের জন্য $1 মিলিয়ন খরচ করেছে ।

গ্যান্ডক্র্যাবও ঠিক ততটাই ভয়াবহ। অনুমান করা হচ্ছে যে, এই জঘন্য নামের র‍্যানসমওয়্যারটি ইতিমধ্যেই এর লেখকদের কাছ থেকে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের মতো অর্থপ্রদানের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করেছে , যার মধ্যে ব্যক্তিগত মুক্তিপণ ৬০০ ডলার থেকে ৭০০,০০০ ডলার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

হ্যাকিং প্রতিরোধ

যদি আপনার কম্পিউটার, ট্যাবলেট, বা ফোন হ্যাকারের লক্ষ্যবস্তুতে থাকে, তাহলে সতর্কতার ঘনকেন্দ্রিক বলয় দিয়ে এটিকে ঘিরে রাখুন ।

অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সুরক্ষা

প্রথমত, একটি নির্ভরযোগ্য অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার পণ্য (অথবা ফোনের জন্য অ্যাপ) ডাউনলোড করুন, যা ম্যালওয়্যার সনাক্ত এবং নিষ্ক্রিয় করতে পারে এবং ক্ষতিকারক ফিশিং ওয়েবসাইটের সাথে সংযোগ ব্লক করতে পারে। অবশ্যই, আপনি Windows, Android, Mac, iPhone, অথবা কোনও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কে থাকুন না কেন, আমরা Windows এর জন্য Malwarebytes , Mac এর জন্য Malwarebytes , Android এর জন্য Malwarebytes , Chromebook এর জন্য Malwarebytes , iOS এর জন্য Malwarebytes এবং Malwarebytes ব্যবসায়িক পণ্যগুলির স্তরযুক্ত সুরক্ষার সুপারিশ করি।

অ্যাপস ব্যবহারে সতর্ক থাকুন

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র সেইসব বৈধ মার্কেটপ্লেস থেকে ফোন অ্যাপ ডাউনলোড করুন যারা ম্যালওয়্যার বহনকারী অ্যাপের জন্য নিজেদের নজরদারি করে, যেমন গুগল প্লে এবং অ্যামাজন অ্যাপস্টোর। (মনে রাখবেন যে অ্যাপলের নীতি আইফোন ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে বাধা দেয়।) তবুও, প্রতিবার যখনই আপনি কোনও অ্যাপ ডাউনলোড করবেন, প্রথমে রেটিং এবং পর্যালোচনাগুলি পরীক্ষা করে দেখুন। যদি এর রেটিং কম থাকে এবং ডাউনলোডের সংখ্যা কম থাকে, তাহলে সেই অ্যাপটি এড়িয়ে চলাই ভালো।

আপনার তথ্য সুরক্ষিত রাখুন

জেনে রাখুন যে কোনও ব্যাংক বা অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম ইমেলের মাধ্যমে আপনার লগইন শংসাপত্র, সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর , বা ক্রেডিট কার্ড নম্বর জিজ্ঞাসা করবে না ।

আপনার সফ্টওয়্যার আপডেট করুন

আপনি আপনার ফোনে বা কম্পিউটারে, আপনার অপারেটিং সিস্টেম আপডেট আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। এবং আপনার অন্যান্য আবাসিক সফ্টওয়্যারও আপডেট করুন।

সাবধানে ব্রাউজ করুন

অনিরাপদ ওয়েবসাইট পরিদর্শন করা এড়িয়ে চলুন, এবং কখনও যাচাই না করা সংযুক্তি ডাউনলোড করবেন না বা অপরিচিত ইমেলের লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করবেন না। নিরাপদ ব্রাউজিংয়ের জন্য আপনি ম্যালওয়্যারবাইটস ব্রাউজার গার্ডও ব্যবহার করতে পারেন।

পাসওয়ার্ড সুরক্ষা

উপরের সবগুলোই হল মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি, এবং সর্বদা একটি ভালো ধারণা। কিন্তু খারাপ লোকেরা সর্বদা আপনার সিস্টেমে নতুন করে প্রবেশের পথ খুঁজছে। যদি কোনও হ্যাকার আপনার একাধিক পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত পাসওয়ার্ডগুলির মধ্যে একটি আবিষ্কার করে, তবে তাদের কাছে এমন অ্যাপ রয়েছে যা আপনার অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলিকে লঙ্ঘন করতে পারে। তাই আপনার পাসওয়ার্ডগুলিকে দীর্ঘ এবং জটিল করুন, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের জন্য একই ব্যবহার এড়িয়ে চলুন এবং পরিবর্তে একটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করুন । কারণ একটি হ্যাক করা ইমেল অ্যাকাউন্টের মূল্যও আপনার উপর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

"জেনে রাখুন যে কোনও ব্যাংক বা অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম আপনার লগইন , সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, বা ক্রেডিট কার্ড নম্বর ইমেলের মাধ্যমে কখনও জিজ্ঞাসা করবে না।"

অনুমতিমূলক এবং বিকৃত ওয়েবসাইট হ্যাক করা বা ধ্বংস করা - হালাল নাকি হারাম?

আজকাল মানুষ যে সব খারাপ জিনিসের দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি হল, বিগত শতাব্দীর তুলনায় ভিন্ন, তা হল তারা নগ্নতা, অশ্লীলতা এবং অনুমতির বিস্তার এবং সকল ধরণের আকাঙ্ক্ষার বিস্তার দেখতে এবং দেখতে পায় যা নীতি, শালীনতা বা ধর্মীয় অঙ্গীকার দ্বারা দমন করা যায় না। নারীর দেহ এখন সবচেয়ে সস্তা এবং তুচ্ছ পণ্যে পরিণত হয়েছে। খুব কমই কোন মুসলিম পরিবার এই মন্দ এবং বিপদ থেকে মুক্ত। টিভি, ইন্টারনেট, রাস্তাঘাট, বই, ম্যাগাজিন এবং মোবাইল ফোনে এগুলো পাওয়া যায়, শালীনতার অভাবের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং মানুষের হৃদয় ও মন দখল এবং প্রভাবিত করার জন্য দৌড়ে। সম্ভবত তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল অনুমতিমূলক ইন্টারনেট সাইট, কারণ এগুলি সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য এবং কারণ এগুলি অনেক, বিভিন্ন ধরণের, এবং তাদের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একটি গুরুতর বিপদ ডেকে আনে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ, যখন পাপ একটি অভ্যাসে পরিণত হয় এবং অনৈতিকতার ফলে বিনয়, যুক্তি এবং ঈমানের মূল্যবোধ হারিয়ে যায়। তাহলে তাদের ঐশ্বরিক

শাস্তির জন্য অথবা সর্বজনীন ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যা আল্লাহর আইন ফিতরাত (সুন্দর মানব প্রকৃতি) থেকে বিচ্যুত এবং মন্দ কাজে লিপ্ত প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে।
আল্লাহ তাআলা বলেন (অর্থের ব্যাখ্যা):
"মানুষের হাত যা অর্জন করেছে (অত্যাচার ও মন্দ কাজের মাধ্যমে) তার ফলে স্থলে ও সমুদ্রে মন্দ (পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতা) দেখা দিয়েছে, যাতে তিনি (আল্লাহ) তাদের কৃতকর্মের কিছু অংশ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা (আল্লাহর কাছে তওবা করে এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে) ফিরে আসে।" [আল-রুম ৩০:৪১]
ইসলাম সংস্কার ও পবিত্রতার আহ্বান জানায়, তাই যারা এর নীতিমালা মেনে চলে এবং বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন মানুষকে মন্দ থেকে মুক্ত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। এই ধর্মের একটি মহান নীতি হলো, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা, যা সকল মুসলমানের উপর তাদের অবস্থা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী শরীয়ত বাধ্যতামূলক।
ইসলামী শরীয়তে অনৈতিকতার হাতিয়ারের কোন সুরক্ষা নেই, বরং শরীয়ত এগুলোকে সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তাই এগুলো মূল্যহীন জিনিস, যা ধ্বংসের যোগ্য, তাই এগুলো ভেঙে ফেলতে হবে এবং নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমু আল-ফাতাওয়া (২৮/১১৩) এ বলেছেন:
মন্দকে ধ্বংস করা জায়েজ, তা সে দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য, যেমন আল্লাহর পরিবর্তে পূজা করা হয় এমন মূর্তি, কারণ তাদের মূর্তি মন্দ এবং তাদের ধ্বংস করা জায়েজ। যদি পাথর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়, তবে সেগুলি ভেঙে পুড়িয়ে ফেলা জায়েজ। বাদ্যযন্ত্র, যেমন ঢোলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অধিকাংশ ফকীহের মতে, এগুলো ধ্বংস করা জায়েজ, এবং এটি মালিক এবং আহমদ থেকে বর্ণিত দুটি বর্ণনার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত। মদের পাত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; সেগুলো ভেঙে গর্ত করা জায়েজ, এবং যেসব দোকানে মদ বিক্রি হয় সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে। আহমদ বলেন যে, কিছু মালিকী এবং অন্যান্যরা, উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত বর্ণনা অনুসরণ করে, তিনি নির্দেশ দেন যে রুওয়াইশিদ আল-সাকাফীর একটি দোকান যেখানে মদ বিক্রি করা হত তা পুড়িয়ে ফেলা উচিত, এবং তিনি বলেন: "তুমি ফুওয়াইসিক (পাপী), রুওয়াইশিদ (সঠিক পথে চলা ব্যক্তি) নয়।" একইভাবে, খলিফা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) একটি গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিলেন যেখানে মদ বিক্রি হত, যেমনটি আবু উবাইদাহ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, কারণ যেখানে মদ বিক্রি হয় সেই স্থানটি সেই পাত্রের মতো যেখানে মদ বিক্রি করা হয়। এটি আহমদ, মালিক এবং অন্যান্যদেরও সুপরিচিত মত।
দেখুন: আল-মাওসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ (৩৬/৩৪)।

কিন্তু অনুমতিপ্রাপ্ত স্থান সম্পর্কে আমরা যা মনে করি তা হল, এটি রাষ্ট্র, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব, ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্ব নয়। আমরা মনে করি যে, এই স্থানগুলি যে

ব্যক্তিরা তাদের ধ্বংস বা নষ্ট করার চেষ্টা করে - এমনকি যদি তারা উচ্চ স্তরের ঈমান এবং ধার্মিকতা সম্পন্ন হয় - তাদের প্রচেষ্টা এবং তারা যে ফলাফল অর্জন করতে পারে তার চেয়েও বেশি বিপদ ডেকে আনবে। আজকাল কেউই সমস্ত মন্দ স্থানের অবসান ঘটাতে পারে না, এমনকি এক শতাংশও নয়। এর প্রতিকার হবে মানুষকে সতর্ক ও সুরক্ষার উপায় ব্যবহার করে, মুসলিম দেশগুলিতে মন্দ স্থানগুলিকে ব্লক করে, এবং সেগুলি ব্লক করার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করে, এবং সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে এবং মানুষকে সতর্ক করে। এই প্রচেষ্টাগুলি কেবল জাতি এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারাই করা যেতে পারে, এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নয় যারা তাদের আবেগ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার শিকার হতে পারে এবং অসাবধানতাবশত এই দুর্নীতিগ্রস্ত স্থানগুলির শিকার হতে পারে।

ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আল-দাইমাহ (17/121-122) এ বলা হয়েছে:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যের জন্য এবং ফিতনা ও তার স্থানগুলি এড়াতে একজন মুসলিমের উচিত দৃষ্টি অবনত রাখা এবং ঐসব নোংরা পত্রিকার দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা। কেউ নিজেকে নিষ্পাপ দাবি করা উচিত নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বলেছেন যে শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের মতো প্রবাহিত হয় এবং ইমাম আহমদ (রাঃ) বলেছেন: কতবার এক নজর মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

আল্লাহ তাআলা যাকে মুসলিম দেশে কর্তৃত্বের যে কোন পদে নিযুক্ত করেছেন, তাকে অবশ্যই মুসলিমদের প্রতি আন্তরিক হতে হবে এবং মন্দ ও তার লোকদের তাদের থেকে দূরে রাখতে হবে এবং তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে এমন সকল কিছু থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে এই দুর্নীতিগ্রস্ত পত্রিকাগুলি প্রকাশ ও বিতরণ করা থেকে বিরত রাখা এবং তাদের মন্দকে তাদের থেকে দূরে রাখা। এটি আল্লাহর দ্বীনকে সমর্থন করার অংশ এবং পৃথিবীতে সমৃদ্ধি, সাফল্য এবং ক্ষমতা অর্জনের অন্যতম উপায়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অর্থের ব্যাখ্যা):

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর (ধর্ম) সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বশক্তিমান।

ঐসব (মুসলিম শাসক) যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা ইকামাত-আস-নামাজ (মসজিদে পুরুষদের জন্য পাঁচটি ফরজ নামাজ) প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল-মা'রুফ (অর্থাৎ ইসলামী একত্ববাদ এবং ইসলাম যা করতে নির্দেশ

দেয়) আদেশ করবে এবং আল-মুনকার (অর্থাৎ কুফর, শিরক এবং ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে) নিষেধ করবে [অর্থাৎ তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনকে তাদের দেশের আইন হিসেবে গ্রহণ করবে]। এবং (সৃষ্টির) সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।" [আল-হজ্জ ২২:৪০-৪১]

পারমাণবিক যুদ্ধ

মিশরের ডঃ আলী জুমাহ মুহাম্মদ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:
সামরিক পরিভাষায়, 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র' বলতে অপ্রচলিত, মারাত্মক এবং শক্তিশালী অস্ত্র বোঝায়। এই ধরণের অস্ত্র আঘাতপ্রাপ্ত এলাকায়, মানুষ, প্রাণী এমনকি আশেপাশের এলাকার পরিবেশেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।
এই অস্ত্রগুলি তিন ধরণের:
(১) **পারমাণবিক অস্ত্র**, যেমন পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং নিউট্রন বোমা। এই অস্ত্রগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা মানুষ এবং স্থাপনা ধ্বংস করে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ শহরগুলির পরিবেশ দূষিত করে। এদের মধ্যে কিছু কেবল মানুষ ধ্বংস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিছু স্থাপনা ধ্বংস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
(২) দ্বিতীয় ধরণের **রাসায়নিক অস্ত্র** হল গ্যাস, যা বিভিন্ন উপায়ে কাজ করে এবং এতে এমন পদার্থ থাকে যা পুড়ে যায়, যার অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে এবং এর সংস্পর্শে আসা যেকোনো প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। এগুলি উদ্ভিদকেও প্রভাবিত করে। এই বিষাক্ত পদার্থগুলি সাধারণত গ্যাসীয় বা তরল আকারে থাকে এবং দ্রুত বাষ্পীভূত হয়; এগুলি খুব কমই কঠিন আকারে থাকে।
(৩) তৃতীয় ধরণের **জৈবিক অস্ত্র,** যার মধ্যে জীবাণু এবং ভাইরাস থাকে যা শত্রু রেখায় বিপজ্জনক মহামারী রোগ ছড়িয়ে দিতে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি করতে ব্যবহৃত হয়।(Bioterrorism)



আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের জন্য ইসলামী দেশগুলির এই অস্ত্রগুলি রাখা একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। এর প্রমাণ হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ যা বলেছেন,

" এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখো, যার মধ্যে যুদ্ধের ঘোড়া (ট্যাঙ্ক, বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে হুমকি দেবে... " (আল-আনফাল, ৮:৬০)

পূর্ববর্তী আয়াতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমাদের শত্রুদের নিবৃত্ত করা উচিত যাতে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করার কথা না ভাবে। ইসলামের দণ্ডবিধির প্রেক্ষাপটে প্রতিরোধ একটি ধর্মীয় নীতি যা ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি রাজনৈতিক ধারণা হিসাবেও বিবেচিত হয় যা সমস্ত দেশ তাদের রাজনৈতিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি তাদের সামরিক কৌশলেও গ্রহণ করে। এর সুবিধা স্পষ্ট; দেশগুলির মধ্যে কৌশলগত এবং সামরিক ভারসাম্য তৈরি করা।

ইসলামের যুদ্ধ-নীতি এই হাদীস থেকে সুন্দর বোঝা যায়- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, (যার সারমর্ম হলো) তোমরা যথাসম্ভব যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করবে। তবে যুদ্ধ যদি বাধিয়েই দেওয়া হয় তাহলে সত্যের জয় হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে লড়াই করে যাবে।

কুরআনে যেকোনো এবং সকল উপায় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। বিপরীতে, কুরআন যেকোনো আক্রমণ শুরু করার আগে আল্লাহর স্মরণের উপর জোর দেয়। এতে বলা হয়েছে:

"অতএব, যদি কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমরাও তাদের উপর আক্রমণ করো যেমন তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করো..." (২:১৯৪)

যদিও কুরআনে আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, তবুও এটি সেই কাজগুলিকে আনুপাতিকতা এবং নির্বিচার আক্রমণের নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। একইভাবে, যেহেতু জামানত হিসেবে নিরীহ জীবন হত্যা কোনও ন্যায্য কারণ ছাড়া হয় না, তাই এটি কুরআনের আয়াতের বিরোধিতা করে যেখানে বলা হয়েছে "আল্লাহ যাকে পবিত্র করেছেন - ন্যায্য কারণ ছাড়া প্রাণ হত্যা করো না" (১৭:৩৩)। যাইহোক, একই সাথে, কুরআন আরও বলে "যদি তোমরা [তোমার শত্রুকে] শাস্তি দাও, তাহলে তাদের সেই শাস্তি দাও যা তোমাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল" (১৬:১২৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ চেষ্টা ছিল, মক্কার কাফের-মুশরিক ও তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম-পারস্যের সাথে সন্ধি-সমঝোতার মাধ্যমেই বিষয়গুলো সমাধা করা। যেন যুদ্ধের প্রয়োজন না হয়। যুদ্ধটাকে অবলম্বন করা হতো সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে। ইসলামের শিক্ষা যেন শান্তি ও নিরাপত্তারই মূল পাঠ।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ.-ও বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার পর মক্কা নগরী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুই হাত তুলে দুআ করেছিলেন-
হে আল্লাহ! আপনি এই শহরকে পূর্ণ নিরাপদ করে দিন।
ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়ানোর। হুদায়বিয়ার সন্ধি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গোটা মানব ইতিহাসে যত মানুষ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে তার ৭৮ শতাংশই ছিল বিগত সাড়ে পাঁচ শ বছরে।
মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ। দেশের প্রথিতযশা প্রবীণ আলেম সাহিত্যিক, আরবী সাহিত্যের নিবেদিত সাধক এবং তা'লীম-তরবিয়তের অঙ্গনে একজন নীবর সংস্কারক। প্রতিভা, পান্ডিত্য ও আকাবিরের আদর্শ অনুশীলনের অপূর্ব সমন্বয়ে উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা ও সাহিত্যের সুনির্ধারিত কাজের মানচিত্র অতিক্রম করা তাঁর দেশ ও বিশ্বভাবনার জগতটাও ব্যাপক আলোকিত। সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামার আলোচিত কায়রো ভাষণের ওপর তাঁর ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া জানতে মাসিক আলকাউসার গত ২১ জুন সন্ধ্যায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে I

শরীফঃ **মুসলিম বিশ্বের পারমাণবিক শক্তি অর্জন সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা কী?**

মিছবাহঃ কেন, তোমার জানা নেই কোরআনের বাণী, 'যত দূর পুরো তাদের জন্য শক্তি অর্জন করো ... তা দ্বারা সন্ত্রস্ত করার জন্য আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া আরো কিছু লোককে, যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদের জানেন।'
তোমার মনে আছে কি না জানি না; ভারত যখন দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ ঘটালো, তো বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ওদের মন্ত্রী আদভানি বলেছিলো, পাকিস্তানকে এখন থেকে ভারতের কথায় চলতে হবে। বিজ্ঞানী ডক্টর খান তখন বললেন, 'নাউ, অর নেভার', হয় এখন নয়ত কখনোই নয়। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেন, আর ভারতের মুখটা চুপসে গেলো, সুর পাল্টে গেলো। আধুনিক পরিভাষায় এটাকেই বলে শক্তির ভারসাম্য, কোরআন বলেছে 'ইরহাব' বা সন্ত্রস্তকরণ। এখন পারমাণবিক শক্তি অর্জনের যে চেষ্টা চলছে, আমি মনে করি, বিলম্বে হলেও কোরআনের এই ইরহাবওয়ালা আয়াতের উপরই আমল হচ্ছে। আমার তো বিশ্বাস, যেসব মুসলিম বিজ্ঞানী দিন-রাত এক করে শক্তি অর্জনের সাধনায় নিয়োজিত তারা মাদরাসা- ওয়ালাদের চেয়ে কম ইবাদতগুজার নন, যদি তারা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত থাকেন।

যাকারিয়াঃ **মুসলিম মেধাগুলো যাতে উম্মাহর কাজে লাগে সেজন্য আমাদের কী করণীয়?**

মিছবাহঃ অবশ্যই আমাদের করণীয় আছে। ঈমানী চেতনা, দ্বীনী গায়রত, জিহাদি জাযবা, এগুলো তাদের মাঝে যেন সৃষ্টি হয় সেজন্য আমাদের মুখে, কলমে, ছোহবতে, সান্নিধ্যে যার যতটুকু তাওফীক আছে চেষ্টা করতে হবে। হযরত আলী নদবী (রহ) এটাই বলেছেন। হাদীছে

পাকিস্তান পড়ে দেখুন, তিনি বলেছেন, ‘এগিয়ে যাও, আমি মাদরাসায় ভর্তি হতে বলছি না, এগিয়ে যাও বিজ্ঞানের সকল অঙ্গনে।’ আসলে শিক্ষার এই যে বিভাজন, এটা তো শত্রুদের চক্রান্তের ফল। সকল শিক্ষাই ধর্ম শিক্ষা, যদি দ্বীন ও উম্মাহকে সামনে রেখে করা হয়। এটা আমার কথা নয়, বড়দের কথা।

আমাদের করণীয়? তা তো কোরআনই বলে দিয়েছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া, আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। সন্ত্রাস ও সহিংসা পরিহার করা এবং জিহাদের পথে অবিচল থাকা।

অনলাইনে দাওয়াত ও অপ্রশান্ত অন্তর

অন্তর যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেকোনো বিষয়ে মনোযোগী না থাকে সে জন্য পূর্বের নেককার মানুষেরা সাধনা করতেন। কেউ কেউ ইলম অর্জনে একাগ্রচিত্ত থাকার জন্য বাজারের রাস্তা ব্যবহার না করে ঘুরে গ্রামের ভেতরের বিকল্প রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। কারণ, বাজারে প্রচুর জিনিসপত্রের দিকে নজর যায়। এতে চিন্তা ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। এমন নেকদিল মানুষদের

উত্তরসূরি হয়ে আমরা করে থাকি এর বিপরীত কাজ। আমরা আরও অন্তর বিক্ষিপ্ত করার বিভিন্ন আয়োজন করে থাকি। খুঁজে খুঁজে বের করি, নতুন কী করা যায়!

অন্তর বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা মূলত দুটো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি:

০১. অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছি।

০২. অহেতুক কাজে লিপ্ত হচ্ছি।

একে তো পূর্বসূরিগণ মজবুত ঈমানদার ছিলেন, পাশাপাশি ছোট ছোট ব্যাপারেও সতর্ক থাকতেন, যেন বেহুদা কোনো ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি না হয়। অপরদিকে আমরা এমনিতেই দুর্বল ঈমানদার। আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় আমাদের খুবই কম। এর পাশাপাশি আমরা এমন এমন বিষয়ে নিজেদের ব্যস্ত করে রাখছি, যার মাধ্যমে চোখ ও অন্তরে ফাহেশা (অশালীন) জিনিস স্থান পায়, যৌন উদ্দীপনা সতেজ হয়। গুনাহের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

অনলাইনের এ জগৎ শুধু উত্তেজনা তৈরিই করে না; তা প্রশমনের জন্য পর্যাপ্ত গুনাহের বন্দোবস্তও এখানে আছে।

এখানে এসো, গুনাহের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করো। এরপর তা মেটানোর ব্যবস্থাও এখানেই আছে। এর পাশাপাশি আছে প্রচুর লা-ইয়ানী (বেহুদা কথা ও কাজের) উপকরণ। যাতে

আপাতদৃষ্টিতে গুনাহ নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বিভিন্ন গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর একসময় তাতে অভ্যস্ত করে ফেলে।

লা-ইয়ানীর কিছু উদাহরণ এমন:

ক. অলস ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ফেসবুক স্কুল করা, যদি ছবি বন্ধ থাকে।

খ. অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক স্থাপন, যা সময় নষ্ট করার আরেক উপলক্ষ্য।

গ. বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঘুরঘুর করা, যেখানে অনেক বাতিল ফিকির ও আকীদার ছড়াছড়িও থাকে।

ঘ. অনলাইন মার্কেটগুলোতে বিভিন্ন প্রোডাক্ট দেখতে থাকা, যেখানে অপ্রয়োজনীয় পণ্যকেও জরুরি হিসেবে প্রচার করা হয়।

ঙ. এই লিংক থেকে ওই লিংক, ওই লিংক থেকে সেই লিংকে ঘুরে ঘুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করা।

একজন ঈমানদারের কাছে তার ঈমান অত্যন্ত মূল্যবান। সে যেকোনো মূল্যে নিজ ঈমানকে হেফাজত করবে। একজন ঈমানদারের জন্য জরুরি হলো, সে এমন কথা বলবে না, এমন কথা শুনবে না, এমন কিছু পড়বে না, এমন জায়গায় যাবে না-যা তার ঈমান-আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইন্টারনেটে এলোমেলো ঘোরাফেরায় তার আমল তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, এমনকি কখনো কখনো ঈমানও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কত পিচ্ছিল গলিপথ এখানে আছে তার হিসেব নেই। হয়তো কোনো এক নাস্তিকের কোনো ব্যতিক্রম কথার ধরনে আমি ফাঁদে পড়ে যেতে পারি। আমার জ্ঞানের কমতির কারণে কোনো বিদআতী, শিয়া বা কাদিয়ানীর খপ্পড়ে পড়ে গোমরাহ হতে পারি। এমন তো হচ্ছে ও অহরহ। একজন সচেতন মুমিনকে তো তার ঈমানকে হেফাজতের জন্য সতর্ক থাকতেই হবে। ঈমানের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো কিছুকে দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ করতে হবে।

ফেসবুকে দ্বীন প্রচার

ফেসবুকে বিপুল পরিমাণে জনগোষ্ঠী দিনের একটা বড় সময় কাটায়। আবার দ্বীনদার ব্যক্তিদের একটা বড় অংশও ফেসবুকে অ্যাকটিভ।

দ্বীনদারদের তিন শ্রেণি ফেসবুকে থাকেন:

প্রথমত উলামায়ে কেরাম, যারা বাস্তব দ্বীনের প্রসার এবং সময়ের সাথে যুক্ত থাকতে এখানে সময় দেন। পাশাপাশি একটি সহজ ও ভালো যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে এর মাধ্যমে বিভিন্ন দ্বীনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ওই সকল ভাই, যারা আগে জাহেলী জীবন যাপন করতেন। কোনোভাবে দ্বীনের বুঝ পেয়েছেন। দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করছেন। তারা পূর্বের অভ্যাস হিসেবে ফেসবুকে সময় কাটাচ্ছেন, পাশাপাশি দাওয়াতী জজবার কারণে এখানে মাশাআল্লাহ দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে এতে উপকৃতও হচ্ছেন।

তৃতীয় শ্রেণি তারা, যারা আগে ফেসবুক চালাতেন না। ইন্টারনেটেও যুক্ত ছিলেন না। দ্বীন মানতে শুরু করার পর একসময় ভাবলেন, ফেসবুকেও দ্বীনি কাজ করা যায়। সে হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে যুক্ত হয়েছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন।

আমরা প্রত্যেকেই জানি, ফেসবুকের ভেতরকার অবস্থা। এখানে যুক্ত থাকার জন্য শরীয়তের কতটা লঙ্ঘন করতে হয় তাও বুঝমানদের কাছে অজানা নয়। শুধু পর্দার ব্যাপারটাই যদি দেখা হয়, অভিজ্ঞরা জানেন, এখানে এই অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্দার ব্যাপক লঙ্ঘনের প্রবল আশঙ্কা আছে। যারা পর্দার পরিবেশে বড় হননি, বা পর্দার দীক্ষা পাননি, তাদের অনেকের কাছে বোধগম্য না হলেও, যারা বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের সোহবত পেয়েছেন, অথবা তাবলীগ জামাত বা কোনো দ্বীনী মেহনতের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক রাখেন, তারা জানেন, এটা কত বড় দ্বীনী ক্ষতি। এই ক্ষতি স্বীকার করে আমি যে এখানে সময় কাটাব, তা আমাকে কতটা দ্বীনী অর্জন এনে দেবে তা হিসেব করতে হবে। আমরা আগে কিছু উদাহরণ এনেছি, সতর্কতার জন্য ওগুলোর ওপর কিছু চিন্তা করাই যথেষ্ট হবে আশা করি।

আর শুধু কি পর্দার সমস্যা? রিয়া, খ্যাতির অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, গীবত, ঝগড়া, মিথ্যা, প্রতারণা, কুৎসা রটনা, 'দ্বীনী' প্রেম... কী নেই এখানে!

ফেসবুক এক বৈচিত্র্যময় জগৎ। এখানে একেকজন মানুষ নিজের সেরাটা উপস্থাপন করে থাকেন। হয়তো কোনো ব্যক্তি অসাধারণ একটা ছবি তার প্রোফাইল পিকচার বানিয়েছে, অন্য কোথাও থেকে কপি করে জটিল নীতিকথা পোস্ট করেছে... এসব দেখে মানুষটা সম্পর্কে কারও উঁচু ধারণা হয়ে যেতে পারে। তার প্রতি কোনো মেয়ে অথবা মানুষটা মেয়ে হলে তার প্রতি একটা ছেলে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। এভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা তৈরি হয়ে যায়।

দ্বীনদার মানুষ তার সুন্দরী স্ত্রী রেখে ফেসবুকের কার্যক্রমে প্রভাবিত হয়ে অন্য মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনাও তো এক-দুটো না। বেগানা নারীর সাথে 'নির্দোষ' দ্বীনী আলাপ-আলোচনা কত দ্বীনদার পরিবারে অশান্তি, নির্ঘুম রাত, চোখের পানি, ঝগড়া-বিবাদ টেনে এনেছে, সে হিসেব কে রাখে! স্বামী অসহ্য হয়েও সহ্য করে যাচ্ছে স্ত্রীর দ্বীনী নসীহতে বেগানা পুরুষের লাভ রিয়্যাকশন। তবু কিছুতেই মানা করা যাবে না, স্মার্টফোন ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। এ এক বাস্তবতা-ইন্টারনেটে সবার উপস্থিতি। এ থেকে বঞ্চিত করলে খারাপ

দেখায়। জ্বলে-পুড়ে খাক হলেও কিছু করার নেই। এই ইন্টারনেটের ব্যবহার, সে তো দাওয়াতী কাজে। আর আশপাশের এরা দ্বীনী ভাই-বোন। বেগানা হলেও আপন।

ফেসবুকে দাওয়াতী কাজে শুধু রিয়ার আশঙ্কা প্রবল, তা-ই না-মানুষের প্রশংসায় প্রভাবিত হওয়া, লোকের প্রশংসাকে নিজের পক্ষে প্রমাণ ভাবা, নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা তৈরি হওয়া, লাইক-শেয়ারের ফাঁদে পড়া, আরও বেশি লাইক অর্জনের উপযোগী পোস্ট দেয়ার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া, ভক্তকুল দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, একসময় ভক্তকুলের পছন্দ-অপছন্দের মাধ্যমে চালিত হওয়া, নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে উপস্থাপন করার মানসিকতা তৈরি হওয়া, দ্বীনী পথে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রচেষ্টা তৈরি হওয়া, নিজের নামের পেইজ তৈরির মাধ্যমে নিজেকে পাবলিক ফিগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা', দাওয়াহ-পেইজের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ডিং করা, দ্বীনী ট্রলের নামে হাসি-তামাশাকে একটা নিয়মিত ব্যস্ততা বানিয়ে নেয়াসহ এমন জানা-অজানা প্রচুর দ্বীনী ক্ষতি রয়েছে।

ফেসবুকে পরিচিতরা সাক্ষাতে ভিন্ন মতাবলম্বীদের গীবতে ডুবে যাওয়া একটি বাস্তব সত্য। হয়তো ধরে নেয়া হয়, ফেসবুক আইডিগুলো বাস্তব ব্যক্তিসত্তা নয়, তাই এদের গীবত করা পরিচিতজনদের গীবতের মতো হবে না। কিন্তু বেশির ভাগই দেখা যায়, ফেসবুক কমিউনিটি বাস্তব কমিউনিটির কাছাকাছি পৌঁছে যায়। দ্বীনী ভাই-বেরাদারের হাঁড়ির খবর, আসল অবস্থা, ফ্যাক্ট-এসবে মশগুল হওয়া একটা স্বাভাবিক চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বীনী বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সময় আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কও হয়ে থাকে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ। হয়তো একজন মুহাদ্দিস সাহেবের মন্তব্যের বিপরীতে তির্যক মন্তব্য করল এমন একজন নবীন দ্বীনদার, যার পুঁজি হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু মুখস্থ কথা। পুরুষদের আলোচনার মাঝখানে একজন নারী অবলীলায় কমেন্ট করে বসছে। নারীদের কমেন্টের মজলিসেও পুরুষরা ঢুকে পড়ছে। ছেলেপেলে গালাগাল দিচ্ছে বাপের বয়সী মানুষকে। দেশবরেণ্য আলেমকে জাহেল-ফাসেক-কাফের পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে-কেউ। এ যেন টঙ্গীবাজারের রোববারের হাট। ভিড়ের মাঝে কে কার পায়ে পাড়া দেবে বোঝার উপায় নেই। পাড়া দিলে এর কোনো দায়ও নেই। কখনো এ নিয়ে কোনো বিচার বসবে না। তাই মাফ চাওয়াচাওয়ির বালাই নেই। ভয়ও নেই।

শয়তানের নেক সুরতের একটা ধোঁকায় অনেকে পড়ে যান-দাওয়াতী ভিডিও বানানো। আহা, দ্বীনী দাওয়াতের নামে নিজের ওপর এমন অত্যাচার আর হতে পারে! একেকটা ভিডিও বানাতে গিয়ে কী পরিমাণ মুভির (কেউ প্রয়োজনে পেইজ খুললেই তা যশ অর্জনের উদ্দেশ্যে হবে ব্যাপারটা এমন নয়; কী বোঝানো হয়েছে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত আছেন।) ক্লিপ দেখতে হয় আল্লাহ মালুম। একেক বাক্যের উপযোগী ছবি ও ভিডিও ঋজে পেতে নজরের কত শত খেয়ানত করতে হয় তার হিসাব নেই। সার্চ রঞ্জিনের অবাধ স্রোত কত বেপর্দা ও

জঘন্য নারীচিত্র বয়ে আনে, তা ভাবাও যায় না। যদিও মভি ক্লিপ ছাড়াও ভিডিও বানানো যায়, কিন্তু এমনটা করা হয় কম। বুযুর্গদের বয়ানকে আরও হৃদয়স্পর্শীভাবে তুলে ধরতে একেক কথার সাথে মিলিয়ে ছবি যোগ করা হয়। অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও বানানো হয়। অথচ ওই জিনিস থেকে মানুষ কীভাবে ফায়দা পাবে, যা তৈরি করতে গিয়ে তার নির্মাতাই গুনাহে ডুবে গেছে। আর মানুষ এ থেকে ফায়দা পেলেই-বা নির্মাতার কী লাভ, যদি সে নিজেই গুনাহমুক্ত না থাকতে পারে!

গুনাহযুক্ত এসব দাওয়াতী প্রচেষ্টা থেকে যে কিছু ফায়দা হয় না এমন নয়। তবে এ চক্রে ঘুরতে থাকা মানুষেরা ইবাদতের ধ্যান, অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর স্মরণের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের দাঈ ও মাদউ (যাকে দাওয়াত দেয়া হয়) উভয়ই দ্বীনের হাকীকত থেকে দূরেই থেকে যায়; কিছু বাহ্যিকতাকেই দ্বীন ভেবে জীবন কাটিয়ে দেয়।

আমরা সকলেই আসক্ত বা addicted

যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে সেই বিষয়টার সাথে আমরা প্রত্যেকেই জড়িত। তবে পার্থক্য হলো এই–

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

প্রত্যেকে তার নিজ নিজ রীতি অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক ভাল করে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (সূরা ইসরা ৮৪)

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুবিধামত জড়িত। এই বিষয়টার নাম হল আসক্তি বা addiction. কেউ যখন আসক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় addicted. যুবক হলে পর্ণাসক্তি , মাস্টারবেশনে আসক্তি অথবা নেশা বা মাদকাসক্তি । আর যদি বুড়ো টাইপের হয় তবে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার নেশা। শক্তি নেই, দুর্ঘটনা ঘটাবে এরকম সুযোগও সে পাবে না জানে; তবু রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজের মেয়েকে 'মা' বলে ডাক দেয়, মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। স্কুল ছুটি হলে দাঁড়িয়ে থাকে। এটাও এক প্রকার আসক্তি। এই বুড়োও addicted. বাচ্চা মানুষ হলে গেম আসক্তি। এমনও হয় যে, বাচ্চা খানা খায় না অথবা কথা শোনে না, মোবাইলটা হাতে দিয়ে দিলে খানা খাচ্ছে। একবার আমাকে এক ভাই শোনাচ্ছিলেন, তার সন্তানের খবর। বলছিলেন, হুজুর, সন্তানের বয়স চার বছর/সাড়ে চার বছর। আগে বুঝি নাই। এই ৫/৬ মাস থেকে তওবা করছি। এখন বাচ্চার হাতে হিন্দি গান না দিলে খানা খায় না। গেম দিলেও খানা খায় না। কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোন কিছু দিলেও খায় না। ওই হিন্দি গানটাই দিতে হবে। এটাও আসক্তি। এই বাচ্চা মোবাইল addicted. আমরা অনেক দ্বীনদার আছি বিভিন্ন সিরিয়ালে আসক্ত। এখন বিভিন্ন সিরিয়াল আছে। হিন্দি

সিরিয়ালতো আছেই। কত বছর আগে শুরু হয়েছে কে জানে, আবার কত বছর পর গিয়ে শেষ হবে তাও জানা নাই! আবার ইদানিং কালে ইসলামের নামেও কিছু সিরিয়াল আছে। অনেকে ওগুলাতেও আসক্ত। এভাবে প্রত্যেকেই যদি চিন্তা করি তাহলে এই আসক্তির ব্যপারটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে। তবে পার্থক্য হলো كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ বুড়া মিয়া বুড়ার মতো করে আসক্ত, যুবক যুবকের মতো করে আসক্ত। আর আমাদের মতো হুজুর যারা হুজুরের মতো করে আসক্ত। **'মৌলভি কা শায়তান মৌলভি হোতা হেয়' মৌলভি সাহেবের শয়তান মৌলভি সাহেব হয়!** আমরা যারা হুজুর আমাদের শয়তানটাও হুজুর টাইপের। দিন শেষে আমরা প্রত্যেকেই আসক্ত।

এই আসক্তিটা কেন এবং ইসলাম কী চায়?

এই আসক্তিটা কেন? এই আসক্তিটা হল মানুষের স্বভাবজাত, সৃষ্টিগত। সুতরাং আমি আর আপনি যদি চাই যে, এটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে–সম্ভব না। ইসলাম কী চায়? ইসলাম বলে এটাকে নিয়ন্ত্রন কর। এটাকে ঘুরিয়ে দাও। তোমার মধ্যে যে স্বভাবটা আছে এটাকে ভালো দিকে নিয়ে যাও। তোমার এই নফসের চাহিদা, আসক্তি এটা কিন্তু চলমান। তুমি চাইলেও এটাকে বন্ধ করতে পারবে না। তবে এর দৃষ্টান্ত হল, আটা পিশার চাকতির মতো। চাকতির নিচে যদি আমরা গম রাখি আটা বের হবে, বালু রাখলে বালি বের হবে, ইট রাখলে ময়লা বের হবে, ময়লা রাখলে ময়লা বের হবে। অনুরূপভাবে আমরা যদি আসক্তির জায়গায় দ্বীনের আসক্তিগুলো রেখে দিতে পারি, নেক আমলের প্রতি আগ্রহ। আসক্তির জায়গার আগ্রহ এনে দিতে পারি। হালাল জিনিসের প্রতি আগ্রহ। যদি আমরা এনে দিতে পারি তাহলে এই জিনিসটাই আমাদের অনেক সুন্দর কাজে দিবে । এই জিনিসটাই আমাদের মধ্যে অনেক নেক আমালের জন্ম দিবে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মোবাইল আসক্তি মোকাবেলার জন্য ১০টি দিকনির্দেশনা

নিয়ত - :

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আপনার উৎপাদনশীলতা এবং সুস্থতার উন্নতির জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার কমানোর আন্তরিক নিয়ত করুন। নবী ﷺ বলেছেন,

"কর্ম কেবল নিয়তের উপর নির্ভর করে, এবং প্রতিটি মানুষ কেবল তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে।" (সহীহ বুখারী)

সংযম –:

আপনার ফোনটি পরিমিতভাবে ব্যবহার করুন এবং অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উৎসাহিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"এইভাবে, আমি তোমাদেরকে একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি।" (কুরআন ২:১৪৩)

সময় ব্যবস্থাপনা - :

ফোন ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন এবং প্রার্থনা, পারিবারিক সময় এবং কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের সময় এটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।

অলস কথা বলা এড়িয়ে চলুন -:

আপনার ফোনে অলস কথা বলা এবং অপ্রয়োজনীয় কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন, যেমন অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং এবং গেমিং।

আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তাদের নামাজ আদায় করে এবং যারা (নোংরা, মিথ্যা, মন্দ কথাবার্তা, মিথ্যা এবং আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (কুরআন ২৩:১-৩)

মননশীলতা (তাকওয়া) - :

আপনি কীভাবে আপনার ফোন ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি ইসলামী মূল্যবোধ এবং শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আপনার ব্যবহারের পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান এবং আপনার কোন ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করা প্রয়োজন তা কীভাবে তুলে ধরবেন তাও উল্লেখ করুন। এটি দৈনিক বা সাপ্তাহিক পর্যালোচনার মাধ্যমে হতে পারে এবং তারপর ভুলত্রুটি মোকাবেলা করার পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।

কৃতজ্ঞতা - :

প্রযুক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন এবং বিজ্ঞতার সাথে এটি ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত ব্যবহার আরও গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদগুলিকে অবহেলা করতে পারে। আল্লাহর দানকে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করলে মানুষ সন্তুষ্টি ও সন্তুষ্টি লাভ করে। এটি এই দানগুলিকে প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যবহারের অভ্যাসগত পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে।

উপকারী জ্ঞান অর্জন করুন - প্রযুক্তিকে ভালোর জন্য ব্যবহার করুন :

কুরআন পড়া, ইসলামিক বক্তৃতা শোনা এবং নতুন দক্ষতা শেখার মতো উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনার ফোন ব্যবহার করুন।

এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তির উচিত ক্রমাগত উপকারী অ্যাপগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যা তার ভুল ব্যবহার রোধ করতে সাহায্য করবে এবং প্রযুক্তির সাথে তার মিথস্ক্রিয়ার ফলপ্রসূ ফলাফল অর্জন অব্যাহত রাখবে।

সীমানা নির্ধারণ করুন - :

ফোন ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করুন, যেমন খাবারের সময় বা শোবার ঘরে ফোন ব্যবহার না করা, যাতে ঘুম ভালো হয় এবং পারিবারিক মিথস্ক্রিয়া ভালো হয়।

কারও স্ক্রিন টাইম কমানোর জন্য; কারও দুর্বল অভ্যাসগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য, অথবা মোবাইল ফোনের কিছু কার্যকলাপ সীমিত করার জন্য আপনাকে আরও নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার জন্য অ্যাপ রয়েছে।

প্রতিফলন এবং আত্ম-মূল্যায়ন - নিয়মিত প্রতিফলন করুন :

তোমার ফোন ব্যবহারের উপর চিন্তা করো এবং মূল্যায়ন করো যে এটা তোমার আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত বিকাশের উপর প্রভাব ফেলছে কিনা। প্রয়োজনে সমন্বয় করো।

কখনও কখনও কোনও কিছুর প্রভাব বুঝতে হলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয়। যদিও কেউ নিজের সময়ের উপর ফোন আসক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে সক্ষম নাও হতে পারে, তবুও এর কারণে তার আধ্যাত্মিক বিকাশের অবনতি অনুভূত হতে পারে।

শারীরিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করুন - সক্রিয় থাকুন :

আপনার ফোনের উপর নির্ভরতা কমাতে এবং সামগ্রিক সুস্থতার উন্নতি করতে স্ক্রিন ছাড়া শারীরিক কার্যকলাপ এবং শখগুলিতে জড়িত থাকুন।

মোবাইল ফোন আসক্তি মোকাবেলার কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ

ফোন-মুক্ত অঞ্চল তৈরি করুন

আপনার বাড়ির নির্দিষ্ট স্থানগুলি চিহ্নিত করুন, যেমন ডাইনিং রুম এবং শোবার ঘর, যেখানে ফোন ব্যবহার অনুমোদিত নয়। এটি নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করে এবং মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে।

অ্যাপের সীমা নির্ধারণ করুন

এমন বিল্ট-ইন বৈশিষ্ট্য বা অ্যাপ ব্যবহার করুন যা আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলিতে দৈনিক সময়সীমা নির্ধারণ করতে দেয়। এটি আপনাকে কার্যকরভাবে আপনার স্ক্রিন টাইম নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

বিজ্ঞপ্তি বন্ধ করুন।

অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি বন্ধ করুন যাতে বিক্ষেপ কম হয়। এটি আপনাকে আপনার কাজে আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে সাহায্য করে এবং আপনার ফোন ক্রমাগত চেক করার বাধ্যবাধকতা কমায়।

নিয়মিত বিরতির সময়সূচী করুন

আপনার ফোন থেকে নিয়মিত বিরতি নিন এবং পরিকল্পনা করুন। সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং রিচার্জ করার জন্য পড়া, হাঁটা বা প্রার্থনা করার মতো কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকুন।

জবাবদিহিতা অংশীদার

আপনার ফোন ব্যবহার কমানোর লক্ষ্য আপনার বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করুন যারা আপনাকে জবাবদিহি করতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত তাদের সাথে আপনার অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নিন।

অল্প সময়ের জন্য মোবাইল ফোন থেকে সম্পূর্ণ বিরতি নিন।

একদিন ছুটির দিন আপনার ফোন বন্ধ রাখুন, অথবা সারাদিনের জন্য একটি সেকেন্ডারি মিনিমালিস্ট ফোন রাখুন, সেই সাথে কিছু বন্ধু বা পরিবারের সাহায্য নিন, যেখানে কভারেজ নাও থাকতে পারে এমন কোনও বাইরে বেড়াতে যান।

পাহাড়ে একটি সাধারণ ড্রাইভ, অথবা ক্যাম্পিং, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট সংযোগ থেকে ডোপামিনের ক্রমাগত চাহিদার সাথে আপনার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করতে পারে।

অন্য যেকোনো আসক্তির মতোই, মোবাইল ফোনের আসক্তিও বাস্তব এবং এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এটিকে চিনুন, উপলব্ধি করুন এবং মোকাবেলা করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন। যদি পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্য একটি পরিকল্পনা খুঁজে বের করুন। মনে রাখবেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সবসময় ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, বরং ফলাফল অর্জনের জন্য করা প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে।

আল্লাহ আপনাকে আপনার আসক্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আপনার জীবনকে আল্লাহর দাসত্ব ও সন্তুষ্টির পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুন। আমিন।

কোন গুনাহগুলো আমাদের জীবনের জন্য সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ?

তাহলে আমাদের জীবনের জন্য সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ কোন গুনাহগুলো? আমাদের জীবনের জন্য সবচাইতে ভয়াবহ কোন গুনাহগুলো?

ওই গুনাহগুলো যেই গুনাহগুলো আসক্তির পর্যায়ে। আসক্তির পর্যায়ে যে গুনাহগুলো সেগুলোই আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ। বিচার দিবসে এমনটা খুব কম হবে যে, একজন ব্যক্তি হাজার হাজার আইটেমের গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বরং একই রকমের গুনাহ বারবার বারবার এবং বারবার করার কারণে জাহান্নামে গেছে এমনটা বেশি ঘটবে। আল্লাহ তাআলা একথাই বলেন যে,

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গুনাহ করে। অর্থাৎ গুনাহ করে হয়ত একটা। ব্যাস! তারপর মজা পেয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে

وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ

ওই গুনাহটা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। একটা বাউন্ডারি তৈরি দেয়। সে ওই গুনাহটিতে আসক্ত হয়ে যায়। কার কথা? আল্লাহর কথা। আল্লাহ বলেন,

وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ

গুনাহটা তার চারিদিকে ঘিরে ফেলে। এখন সে এখান থেকে আর বের হতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

সুতরাং এরাই জাহান্নামী। এই টাইপের গুনাহর কারণে এরা জাহান্নামে যাবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। (সূরা বাকারা ৮১)

মানুষের গুনাহ হবেই

সুতরাং হঠাৎ যে গুনাহটা হয়ে যাচ্ছে, এগুনাহটাও ভয়ের তবে এতটা ভয়ের না। এর জন্যে তওবা করে নিব। আচমকা এক/দু'টি গুনাহ হয়ে যাওয়াটা জীবনের একটা স্বাভাবিক অংশ। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, কেউ যদি বলে যে, তার গুনাহ হয় না তাহলে সে হয় ইবলিস আর না হয় ফেরেশতা। ইবলিস মানে সে ইবলিসের মত মিথ্যাবাদী। ফেরেশতা মানে গুনাহ করার সক্ষমতা তার নেই। কারণ, মানুষের গুনাহ হবেই। তিনি আরো বলতেন, মুমিন গুনাহ করে না; তার গুনাহ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শয়তানের গুনাহ হয় না; বরং সে ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করে।

এজন্যই হাদিসে এসেছে, নবীজি ﷺ বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لهمْ

যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তার কসম করে বলছি, তোমরা যদি গুনাহ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন আরেকটি জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইতো, তাওবা করত, ইস্তেগফার করত আর বিনিময়ে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন। (সহিহ মুসলিম ২৭৪৯)

মানুষ মানেই ভুল করবে

তো যেটা বলতে চেয়েছিলাম, এই যে আমাদের যে গুনাহগুলো হঠাৎ হঠাৎ হয়ে যায়। এই গুনাহগুলো নিয়ে খুব একটা টেনশনের কারণ নেই। এটা আমাদের জীবনের একটা পার্ট। জীবনের একটা অংশ। অনিচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ হয়ে যাবে। الناس

من النسيان أول الناس أول ناس

নাস মানে মানুষ । এটি النسيان থেকে এসেছে। যার অর্থ ভুল করা। সুতরাং মানুষ মানেই ভুল করবে। মানুষ মানেই তার গুনাহ হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন,

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

ওগো আল্লাহ! হে আমাদের রব! যদি ভুলে যাই অথবা ভুলে করে ফেলি তাহলে মাফ করে দিন। সুতরাং মানুষ বলতেই এরকম হবে। এটা এত টেনশনের কিছু না!

কিন্তু যুবক! তুমি যে রাতের পর রাত জেগে মুভি দেখ; এটা তোমার জন্য টেনশনের বিষয়। এই গুনাহটাই তোমাকে ধ্বংস অতল খাদে নিয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমি আপনাদের নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছি এবং পুরোপুরি নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছি যে, আল্লাহ মাফ করুন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, যদি কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যায় তাহলে কোন গুনাহের কারণে যাবে। রাস্তায় হেঁটেছেন আর হঠাৎ একটা গুনাহ হয়ে গেছে ওই গুনাহটির কারণে নয়। ৬ মাস পর ৯ মাস পর একটা গুনাহ হয়ে গেছে ওই গুনাহটির কারণেও নয়; বরং ওই গুনাহটির কারণে যে গুনাহয় আপনি আসক্ত।

কোন গুনাহটিতে আপনি আসক্ত তা find out করুন

সুতরাং আপনি নিজে নিজে চিন্তা করে দেখুন, আপনি কোন গুনাহে আসক্ত–সুদের কারবারে, ঘুষের কারবারে, মিথ্যা কথায়, গীবতে, চোগলখুরিতে, কুদৃষ্টিতে, পর্ণ দেখাতে নাকি সিরিয়াল দেখাতে? আপনি কোন গুনাহটিতে আসক্ত তা find out করুন। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে খুঁজে বের করুন। তারপর ওটাকেই টার্গেট করুন যে, ওটাকে আমার মিটাতেই হবে। ওটাকেই জীবনের খাতা থেকে একেবারে মুছে দিতে হবে। ওটারই চিকিৎসা করতে হবে। কারণ যদি জাহান্নামে যেতে হয় তাহলে এই গুনাহটার কারণেই যেতে হবে। বাকিগুলো হল এই গুনাহের প্রতিক্রিয়া।

নামাজে কেন মনোযোগ আসে না? ওই যে রাত ২ টার যে গুনাহয় আপনি আসক্ত তার কারণেই আসে না। জিকির কেন ভালো লাগে না? ওই যে রিমোট কন্ট্রলটার কারণে–যেটা এখনও ছাড়তে পারছেন না। কেন আমার কাছে কান্নাকাটি ভালো লাগে না? কান্নাকাটি আমার কেন আসে না? ওই যে সুদ কিংবা ঘুষ কিংবা গীবত–যেটা এখনও ছাড়তে পারি নাই, ওটার কারণে। বাকিগুলো সবই এটার প্রতিক্রিয়া। একটা বা দুইটা গুনাহ–যে যে কয়টাতে অভ্যস্ত–ওই গুনাহটাই হলো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

আল্লাহ আমাদের ওই গুনাহটা থেকে বের হয়ে আসার তাওফিক দান করুন (আমিন)।

আল্লাহকে sorry বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে sorry বলাটাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। তাই আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহগুলোর কথা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে sorry বলুন। অর্থাৎ ইস্তেগফার করুন। আর এই কারণেই আমাদের গুনাহ হয়।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

আল্লাহ তওবাকারীকে খুব ভালোবাসেন। অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে চোখের পানি দিন। ফেরেশতাদের যেহেতু গুনাহ হয় না, তাই তারা লজ্জিত হয়ে কান্না করতে পারে না; অন্য কারণে হয়ত পারে। কিন্তু গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে যে কান্নাকাটি করা এটা তারা পারে না। এজন্য আল্লাহর কাছে এই কান্নাকাটির ডিমান্ড বেশি। আর নিয়ম হল, যেই জিনিসের ডিমান্ড বেশি কিন্তু সাপ্লাই কম ওই জিনিসের মূল্য বেশি হয়।

চোখের পানির মূল্য অনেক!

তো একদিকে আল্লাহ তাআলার কাছে চোখের পানির ডিমান্ড বেশি, অপরদিকে মাখলুকের পক্ষ থেকে এর সাপ্লাই কম। কারণ, ফেরেস্তারা অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে পারে না, অন্যান্য মাখলুকও লজ্জিত হয়ে কাঁদতে পারে না, মানুষের মধ্যে অধিকাংশই অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি দেয় না–গোটা দুনিয়ার মধ্যে কান্নাকাটি করনেওয়ালা বান্দার খুবই অভাব। তাই এর দামও বহু গুণ বেড়ে যায়। এমনকি নবীজি ﷺ বলেন, এক ফোঁটা দাও, মাত্র এক ফোঁটা,

وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ

মাছির মাথা পরিমাণ হলেও চলবে। কেননা, এর দাম এতই বেশি যে, যে বান্দা নিজের গুনাহর ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে এই সামান্য পরিমাণ চোখের পানি দিতে পারবে

إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

আল্লাহ তাআলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। সুবহানাল্লাহ! (ইবনু মাজাহ ৪১৯৭)

মুসলিমরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে কেন?

মুসলিমরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে। কেন? কারন তারা নাকি শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস দিচ্ছে ভিন্ন তথ্য। আসলে জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণেই মুসলমানরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়েছে।

বর্তমান যেসব প্রযুক্তি আমাদের হাতের নাগালে তার ৯০% ভাগই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্নায়ু যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক মার্কিন আগ্রাসনের প্রাক্কালে।

যুদ্ধকালীন সময়ে উদ্ভাবিত জিনিসপত্র ও প্রযুক্তির তালিকা দেখলে আপনার চোখ কপালে উঠবে। কি নেই সেখানে? ন্যাপকিন থেকে শুরু করে টি-ব্যাগ কিংবা ইন্টার্নেট থেকে শুরু করে এক্স-রে। সবই যুদ্ধকালীন সময়ের চাহিদা মেটাতে আবিষ্কৃত হয়েছে।

'ডে-লাইট সেভিং' সিস্টেম প্রথম কার্যকর হয় ১ম বিশ্বযুদ্ধে। যুদ্ধের সৈনিকদের চা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে জার্মানী প্রথম টি-ব্যাগ ও টিনজাত খাবার আবিষ্কার করে। হাতঘড়ির আবিষ্কার হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধরত সেনাদের সময়ের হিসাব রাখার সুবিধার্থে। সর্বপ্রথম

প্যান্টের জিপার উদ্ভাবিত হয় আমেরিকান সৈন্যদের জন্যে। বন্দুকের জন্য আরো মজবুত কাঠামো তৈরির চেষ্টা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সেনারা 'স্টেইনলেস স্টীল' আবিষ্কার করে ফেলে। ড্রোন। এই মাত্র কদিন হলো আমরা ড্রোনের কথা শুনছি, ১৯১৮ সালের ৬ মার্চ সর্বপ্রথম পাইলটবিহীন বিমান দিয়ে বোমা ফেলার চেষ্টা করা হয়। আমেরিকা কর্তৃক এয়ার-ট্রাফিক সিস্টেম আবিষ্কৃত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। বহনযোগ্য এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হয় ফ্রেঞ্চ আর্মির বদৌলতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে।

রাডার আবিষ্কার করতে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাকতালিয়ভাবে মাইক্রোওয়েভ আবিষ্কৃত হয়। পরে রাডারও আবিষ্কার করা হয়। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নাসা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় ডিজিটাল ক্যামেরা। আর সেই ক্যামেরায় ধারন করা ছবি পাঠানোর জন্যে উদ্ভাবিত হয়ে পড়ে ইন্টারনেট।

খেলনা, চকোলেট, সস, গাম, টেপ, নাইলনের পোশাক সবই যুদ্ধের অবদান। ট্রেন, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, জাহাজ, বিমান এগুলোও যুদ্ধের কারণে অস্তিত্বলাভ করেছে। পেনিসিলিন, কেমিক্যাল, রিমোট, টর্চলাইট ইত্যাদি এসবও যুদ্ধের কল্যাণে পেয়েছে মানবসমাজ।

এটিএম বুথ, ক্রেডিট কার্ড, ট্রান্সিস্টর, স্যাটেলাইট, মহাকাশ অভিযান, ল্যাজার, কম্পিউটার, সেলফোন, এগুলো সব স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল।

২০০২ এর আফগান যুদ্ধের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অনেক মার্কিন সেনা মারা যায়। এই রক্তক্ষরণ দ্রুত বন্ধ করার জন্য আবিষ্কৃত হয় "টার্নিকুয়েট" নামের ঔষধ। তৎক্ষণাৎ এনার্জি পেতে এই আফগান আগ্রাসনের সময়েই "ফিব্রিন ব্যান্ডেজ" আবিষ্কৃত হয় যা একইসাথে ঘা সারায় আবার এনার্জি দেয়। তাৎক্ষণিক কাটা-ছেড়া জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে গিয়েই এই সময়ে মার্কিন চিকিৎসকরা "চিটোসান ব্যান্ডেজ"ও উদ্ভাবন করে ফেলে। ৩৪ থেকে ৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষনের মত পাত্রও আবিষ্কৃত হয় এই আফগানে এই আমেরিকান জঙ্গীদের মাধ্যমে যার নাম "গোল্ডেন ব্লাড কন্টেইনার"।

ইরাক যুদ্ধের সময়ে রবোটিক মেডিক্যালাইজ প্রথমবারের মত ব্যবহিত হয়। গণহারে মার্কিন সেনাদের আহত হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত চিকিতসক দিয়ে সামলানো যাচ্ছিলনা। আবার "ট্রমা" আক্রান্ত সেনার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল, পরে "হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপী" আবিষ্কৃত হয় আক্রান্তদের ট্রিটমেন্ট দিতে।

এটা সবসময়ের জাগতিক নীতি। যুদ্ধই চাহিদা সৃষ্টি করে। আর চাহিদা আবিষ্কারের প্রসূতি। "মেকানিকাল ঘড়ি" আবিষ্কার হয় উসমানী খেলাফতের যুদ্ধগুলোতে। "স্টীম পাওয়ার", অবজারভেটরী (পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র), সেক্সট্যান্ট (তারকাদের দূরত্ব মাপার যন্ত্র), মানচিত্র সহ নানান যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল উসমানী খেলাফতের বিভিন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে।

আহযাবের যুদ্ধ দিয়েছিল “পরিখা খনন” পদ্ধতি। তায়েফ যুদ্ধ দিয়েছিল “মিনজানিক” কৌশল। জিহাদের কারণেই “ব্ল্যাকলাইট” সিস্টেম আবিষ্কার করে মুসলিমরা।
কি বুঝলেন? প্রযুক্তিতে মুসলমানরা ততদিন পিছিয়ে থাকবে যতদিন জিহাদ বিমুখ হয়ে ফেসবুকে ডুবে থাকবে। আর আমেরিকা এগিয়ে যাবে, ওরা কখনোই যুদ্ধ থামাবেনা। ওরা জেনে গেছে যুদ্ধ কত কিছুর পসরা মেলে ধরে।

Is technology demotivated in islam?

বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত আবু হামিদ আল-গাজালি তার সুপরিচিত গ্রন্থখানা দ্য রিভাইভাল অফ রিলিজিয়াস সায়েন্সেস (ইহইয়া উলুম আল-দিন) ইসলামি বিজ্ঞানের উপর লিখেছেন। তিনি তাঁর লেখায় যুক্তি দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা (ওয়াজিব) রয়েছে, তারা যে কাজই করুক না কেন শরীয়াহ মেনে চলার জন্য ধর্মীয় বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় দিকগুলো জানা আবশ্যক। যেমন পশুপালনে কর্মরত সকলেরই যাকাত সংক্রান্ত নিয়মাবলি জানা উচিত; একজন বণিক "সুদখোর পরিবেশে ব্যবসা করছেন", রিবা বা সূদ সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে "কার্যকরভাবে সে সূদমুক্ত থাকতে পারে "। বিজ্ঞানের জ্ঞান জানা ওয়াজিব কিফা'ই (সমাজের কিছু লোক অবশ্যই জানে, যদিও একবার যথেষ্ট লোক বাধ্যবাধকতা পূরণ করে, বাকি জনসংখ্যা এ থেকে মুক্তি পায়)।

আল-গাজালি ওয়াজিব কিফা'ই ধর্মীয় বিজ্ঞানকে চারটি দলে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন:

উসূল (নীতি; অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা ঐকমত্য এবং নবীর সাহাবীদের ঐতিহ্য)
ফুরু' (গৌণ বিষয়; যেমন আইনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং রহস্যময় অভিজ্ঞতার সমস্যা)
পরিচায়ক অধ্যয়ন (আরবি ব্যাকরণ, বাক্য গঠন, ইত্যাদি।)
পরিপূরক অধ্যয়ন (কোরআনের তেলাওয়াত ও ব্যাখ্যা, আইনশাস্ত্রের নীতি অধ্যয়ন, ইলম আল-রিজাল বা ইসলামী ঐতিহ্যের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে জীবনী গবেষণা ইত্যাদি।)
আল-গাজ্জালি দাবি করেছেন যে, সমস্ত ধর্মীয় বিজ্ঞান "প্রশংসনীয়" (মাহমুদ) নয়, কারণ কোন ক্ষেত্রে অনুমানভিত্তিক,যা "শরিয়াহর দিকে অভিমুখী কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত"। এগুলো "অবাঞ্ছিত" (মধ্যম) নামে পরিচিত।

উপসংহার ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বিশ্বব্যাপী 'প্রযুক্তির নীতিশাস্ত্র (Techno-ethics) কী হবে?' প্রশ্নটি তীব্রভাবে উঠে এসেছে। দুই-তিন শতাব্দীর অভিজ্ঞতার পরে বিশ্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে: 'প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞানেও কিছু নৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে'। 'কোন প্রযুক্তি তৈরি করা উচিত বা উচিত নয়?' এই প্রশ্নটিও নৈতিক নীতিমালার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা উচিত। 'যখন কোনও প্রযুক্তি তৈরি হয়, তখন এর ব্যবহার কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য করা উচিত এবং কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য উচিত নয়?' এর উপযুক্ত উত্তরও নৈতিক নিয়মকানুনে থাকতে হবে।

দেরিতে হলেও, এখন 'প্রযুক্তির নীতিশাস্ত্র' বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসিপ্লিন হিসাবে উঠে আসছে। প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্মেলন এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই সমস্যাটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের সরকার এটির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রন করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রযুক্তির প্রতিটি কোর্সের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে উঠছে।

বিরূপ পরিবেশে থাকতে থাকতে একটা সময় মানুষ সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একজন নেককার মানুষও কোনো কারণে কিছুদিন গুনাহের পরিবেশে থাকলে ধীরে ধীরে এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পর্দানশীন মানুষ বেপর্দা পরিবেশে অবস্থান করলে তার পর্দা-অনুভূতি লোপ পেতে থাকে। একসময় সব স্বাভাবিক মনে হয়। ইন্টারনেটের অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও যখন একজন মানুষ সময় কাটাতে থাকে, ধীরে ধীরে অশ্লীলতা, মিউজিক etc সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাজা অনুভূতিও মরে যায়।

প্রযুক্তির সাথে এতদিনের সম্পর্কের পর এখন নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে— এ প্রযুক্তি কি বাস্তবেই আমার জন্য জরুরী? কতটা জরুরি? নিজের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। এ বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চিন্তা করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কারণ, এই আত্মঘাতী অভ্যাস আমাদের ঈমান ও চরিত্রকে শেষ করে ফেলছে। রক্ষণশীলতা আর পবিত্রতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. বলতেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া দ্রুত বিদায় হচ্ছে আর আখিরাত দ্রুত এগিয়ে আসছে। উভয়েরই রয়েছে কিছু সন্তান। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। সাবধান, আজ শুধু কর্ম, হিসাব নেই। আর আগামীকাল শুধু হিসাব, কর্মের সুযোগ নেই।

মানুষ আজ জানছে না। কিন্তু আমলনামায় সব লেখা হচ্ছে। কবরে আমাকে কে বাঁচাবে? হায়, কবর তো বড় দুশ্চিন্তার জায়গা! বিভীষিকাময় স্থান। সেদিন তো বাঁচার আর কোন উপায় থাকবে না।

কবরের দিনগুলো সম্পর্কে ভাবার কারণ নেই যে, বছরগুলো সিনেমার মতো মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। কবরের সময়টা শুধু দাফন- কাফন আর মুনকার নাকিরের সওয়াল জবাবেই সীমাবদ্ধ নয়। এখান থেকে শুরু হওয়া এই জীবনের দিনগুলোতে যদি— আল্লাহ ক্ষমা করুন— আজাবে গ্রেফতার হতে হয়, সময়গুলো কাটানো বড় কঠিন হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, "সময়ের অপচয় মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য। কেননা মৃত্যু তো শুধু দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু সময়ের অপচয় মানুষকে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।"

কুরআনে কারীম বলছে,

আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব আমাদের বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব।' (জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন) 'আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি যে তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আজাব আস্বাদন করো, আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির ৩৫\৩৭)

সামনেই তো হাশরের ময়দান, যেখানে বান্দার পা নাড়ানোর সুযোগও থাকবে না, যতক্ষণ দুনিয়ার জীবনে সে কি করে এসেছে সে হিসেবে না দেবে। এইতো আসছে কবরের প্রথম রাত। মুনকার-নাকীরের সাথে সাক্ষাৎ তো খুব দ্রুতই হতে যাচ্ছে। ঝুরঝুরে মাটি ফেলে আকাশটা ঢেকে দেয়া হবে। পায়ের শব্দগুলো একটু একটু করে দূরে সরে যাবে। থাকবো শুধু আমি। আর আমার দুনিয়াতে করা আমলগুলো। জান্নাতে তারা আমার সঙ্গী হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপত্তা দেবে।

এই সহজ, সুখময়, আনন্দের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবে। অনলাইনের নানারকম মজা শেষ হবে। একইভাবে ফুরাবে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কষ্টও। এরপর তো আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর দিন। সেদিন এক পক্ষ আনন্দিত হবে। বলবে, আমি জানতাম এই দিন এক সময় আসবে। তাই আমি আগেই সাবধান ছিলাম! আর অপরপক্ষ দুঃখ করবে—আহা, আমিও যদি সাবধান হতাম, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

সূরা হাক্কাহতে আল্লাহ তা'আলা এই পুরো চিত্রটা জানিয়ে দিয়েছেন :

১৯. অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে, হে লোকজন, এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখো।

২০. আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

২১. সতরাং সে থাকবে মনঃপূত জীবনে।

২২. সেই সমুন্নত জান্নাতে—

২৩. যার ফল থাকবে ঝুঁকে (নিকটবর্তী)।

২৪. (বলা হবে) তোমরা বিগত দিনগুলোতে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে খাও ও পান করো স্বাচ্ছন্দ্যে।

২৫. আর সেই ব্যক্তি, যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে, সে বলবে, আহা! আমাকে যদি আমলনামা না-ই দেওয়া হতো!

২৬. আর আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী?

২৭. আহা, মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত!

মহান আল্লাহ আমাদের সে ভয়াবহ দিনের আফসোস থেকে হেফাজত করুন। আমীন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আমাদের শেষ বয়সটা যেন জীবনের সেরা সময় হয় এবং জীবনের শেষ কাজগুলো যেন হয় সেরা কাজ। আর তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিনটি যেন হয় জীবনের সর্বোত্তম দিন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا، وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ .سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

রেফারেন্স

https://technologybangladesh.com/what-is-technology/
https://Wikipedia
https://shorturl.at/XLn9Q)
https://kalerkantho.com
https://online.ucpress.edu
https://at-tahreek.com
https://ekushey-tv
https://ittefaq.com.bd
https://ictworldnewsbd24-com
https://মাসিক আলকাউসার
https://muslimbangla.com
https://ahlehaqmedia.com
https://thedailycampus.com
https://islamqa.info
খুতুবাত- শায়েখ উমায়ের কোব্বাদী দা.বা.-এর ঈমান জাগানিয়া বয়ান সংকলন
কল্পিত কারাবাস— মুহাম্মাদ হোসাইন
ফেইসবুক ক্ষতি নয় কল্যাণ বয়ে আনুক— আলী মুহাম্মাদ শাওকী
মডার্ন টেকনোলজি: ড. মুহাম্মদ রশিদ আশরাফ